বেদে সংশয় ও নাস্তিক্য

সুকুমারী ভট্টাচার্য

ভূমিকা – বেদে সংশয় ও নাস্তিক্য

সংশয় ও নাস্তিক্যের মধ্যে প্রকৃতিগত, ব্যাপ্তিগত এবং মাত্রাগত পার্থক্য আছে। সব সংশয় নাস্তিক্য থেকে আসে না। আবার মূল নাস্তিক্যও সংশয়ের চেয়ে গভীর ও ব্যাপক। ছোটখাটো বিষয় নিয়ে আস্তিকেরও সংশয় থাকতে পারে। সংশয় পরিসরে ছোট, গভীরতাতেও তাঁই। নাস্তিকের সংজ্ঞা হল ঈশ্বরাপ্রামাণ্যবাদী' অর্থাৎ যে ঈশ্বরকে প্রামাণ্য বলে স্বীকার করে না, এবং 'বেদাপ্রামাণ্যবাদী' অর্থাৎ বেদকে প্রামাণ্য বলে মানে না। এ ছাড়া উপনিষদে দেখি, যে পরলোকে বিশ্বাস করে না সে-ও নাস্তিক। পরলোক মানে শুধু স্বর্গনরক নয়, পরলোক থাকতে গেলেই মরণোত্তর আত্মা থাকতে হবে। তাই যে পরলোক নয়, শুধু ইহলোককেই স্বীকার করে সে-ও নাস্তিক। পরলোককে স্বীকার করলেও ঈশ্বরকে স্বীকার নাও করা যেতে পারে, এবং এ দুটি স্বীকার করেও বেদের প্রামাণ্যতা যে মানে না সে-ও নাস্তিক। হেমচন্দ্রের অভিধান বলে, নাস্তিকের প্রতিশব্দ হল, বার্হস্পত্য, চার্বক ও লোকায়তিক। যে নাস্তি' শব্দ থেকে নাস্তিক শব্দের বুৎপত্তি, তার তিনটি অর্থ হতে পারে: যে ঈশ্বর মানে না, যে পরলোক মানে না এবং যে বেদের প্রামাণ্য মানে না। দেখা যাচ্ছে

ঈশ্বর, পরলোক ও বেদে বিশ্বাস পরস্পর-নিরপেক্ষ; তা হলে বোঝা যাচ্ছে যে, এ তিনটিই ছিল বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের তিনটি মূল স্তম্ভ। পরবর্তীকালে বুদ্ধের আগে যে সব বেদবিরোধী প্রস্থানের উদ্ভব হয়েছিল, তারা সকলেই বেদের প্রমাণ্যে অবিশ্বাসী, ঈশ্বরের অস্তিত্বেও আস্থাহীন। কিন্তু তারা প্রত্যেকেই পরলোকে বিশ্বাসী; এর সঙ্গে বৌদ্ধ, জৈন ও আজীবিকরাও আছেন। অথচ এই পরলোক নিয়ে ব্রাহ্মণসাহিত্য, আরণ্যক ও উপনিষদে নানা সংশয়। শাস্ত্রমতে এ সংশয়ও নাস্তিক্য, তবে এ নাস্তিক্যের সংজ্ঞা শুরু হয় উপনিষদে।

ধ্রুপদী নাস্তিক

এই কালবিন্দুতে ধুপদী নাস্তিক আবির্ভূত হন। তাঁদের সম্পর্কে সমাজের তীব্র তিক্ততাতেই বোঝা যায় কোনও একটি সুসংহত ছকে এঁরা আর পরস্পর-সাপেক্ষতায় সম্পৃক্ত নন। এর প্রাথমিক সূত্রপাত কিন্তু পৃথিবীর ভোগ্যসামগ্রী নিয়ে পারস্পরিক নির্ভরতা থেকে। নাস্তিক্যের ইংরেজি 'এথিইজম, এ শব্দটির বুৎপত্তি, a-theos থেকে অর্থাৎ অনীশ্বর' বা ঈশ্বর না মানা'। একেশ্বরবাদী খ্রিস্টধর্মে আত্মা ও পরলোক ঈশ্বর-সমর্থিত তত্ত্ব, অতএব ঈশ্বরকে না মানার সঙ্গেই এগুলো সম্পৃক্ত ছিল। কিন্তু ভারতবর্ষে এই তিনটি তত্ত্ব: বেদ, ঈশ্বর ও পরলোক পৃথক ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ কেউ এর মধ্যে দুটিকে বিশ্বাস করে, কেউ একটিকে, কেউ-বা কোনওটিকেই বিশ্বাস করে না; যদিও এখানেও পরবর্তী যুগে এই তিনটি পরস্পর-সম্পৃক্ত হয়ে যায়। এবং বেদ বলতে শুধুমাত্র ব্রাহ্মণ-উপনিষদই বোঝাত না, তার সঙ্গে যজ্ঞও বোঝাত, যেটা বেদের প্রায়োগিক দিক। এই যজ্ঞ সম্বন্ধে সংশয় এবং অনীহাও নাস্তিক্যেরই একটি প্রকাশ বলে মনে করা হত। যজ্ঞের নানা প্রবক্তা ছিল, নানা গোষ্ঠী ও তার নানা রূপভেদ ও বিবর্তন ঘটেছিল; কিন্তু এ সবের বাইরে উত্তর ভারতে নানা বিকল্প বুপের মধ্যেও একটি বিমূর্ত যজ্ঞ' ব্যাপার মানুষের

চেতনায় ও আচরণে ছিল। নাস্তিকের ঔদাস্য ও অনাস্থ্য এই যজ্ঞ ব্যাপারটাকে অবলম্বন করেই।

‘যজ্ঞতত্ত্ব অপরিহার্যরূপে বেদের প্রতীকী, এমনকী বেদের বিবক্ষিতের সারবস্তু বলেই স্বীকৃত ছিল। তাই বেদোক্ত যজ্ঞক্রিয়াকে না মানাও নাস্তিক্য। তখন আস্তিক গার্হস্থ্য আশ্রমে থেকে নানা যজ্ঞক্রিয়া করবে, এইটেই ছিল সামাজিক অনুশাসন; তার বিরুদ্ধাচরণ সমাজ সম্পর্কে একটা প্রতিস্পর্ধা, এবং সে-সমাজ তো শাসিত হত এই বেদ দিয়েই। কাজেই এই বিরুদ্ধাচরণ নাস্তিক্য বলেই অভিহিত হত। ক্রমে পরস্পর সংঘর্ষে উত্তীর্ণ হওয়া। যজ্ঞকারী ও নাস্তিক উভয়েই (যজ্ঞ) কর্ম অর্থে গোষ্ঠীগত আনুষ্ঠানিক আদানপ্রদান-নির্ভর কর্মকে পরিহার করে, উভয়ের পার্থক্য হল, বেদের ব্যক্তিগত কর্মের সত্য মিথ্যা বিষয়ে বেদের সার্বভৌম অনুজ্ঞা . যজ্ঞকারী (ও তার আস্তিক বংশধর) মানুষের লোক্যতীত স্তরে উত্তরণের জন্যে লোকাতীত অনুশাসনের কাছে ব্যক্তিস্বাধীনতা সমর্পণ করে। অপরপক্ষে, নাস্তিক্য লোকতীতকেই বিসর্জন দেয়–ব্যক্তিস্বাধীনতার জন্যে।’(১) কর্মকাণ্ডের শেষ দিকে বৈদিক সাহিত্যে দেহাতীত আত্মা দেখা দেয়; যজ্ঞেও পৃথিবীর ভোগ্যসামগ্রীর অনেকটাই ভাগ হত পুরোহিত ও যজমানের মধ্যে। পরে যখন আত্মার কল্পনা উদিত হল। তখন যজ্ঞকারীরা যজ্ঞতত্ত্বের দ্বারা লোক্যতীত সত্তায়–আত্মায় উত্তরণ করলেন এবং এইখানে ঘটল নাস্তিকের সঙ্গে তার মৌলিক বিচ্ছেদ। বেদের প্রামাণ্যতা স্বীকার করতে গিয়ে সে তার ব্যক্তিসত্তার অর্থাৎ স্বাধীন চিন্তার অধিকার বিসর্জন দিল লোকাতীত তত্ত্বের কাছে। আর নাস্তিক সেই লোক্যতীতত্ত্বকে বিসর্জন দিল ব্যক্তিসত্তার নিজস্ব চিন্তার স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখার জন্যে। ব্যক্তিচিন্তার স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখার দুটি প্রধান অর্থ: বেদের প্রামাণ্য যেহেতু প্রত্যক্ষ নয়, অর্থাৎ দেবতা, যজ্ঞ, ধর্মাচরণ নিয়ে বেদ যত কথা বলছে তা যেহেতু প্রত্যক্ষ নয়। তাই তা বিসর্জিত হল এবং পরে এরই সঙ্গে বিসজিত হল দেহব্যাতিরিক্ত আত্মা। বিনিময়ে তার চিন্তার স্বাধীনতা

অক্ষুন্ন থাকল, অর্থাৎ যে-বিশ্বাসের স্বপক্ষে কোনও গ্রহণযোগ্য যুক্তি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তাকে অনায়াসে পরিহার করা হল। উপনিষদে স্বপ্ন ও জাগ্রাৎ অবস্থার প্রসঙ্গে বারবার বলা হয়েছে স্বপ্নে মানুষ বহু অবাস্তব বিষয় দেখে। পরে জেগে উঠে জানতে পারে যে, সে-দেখাগুলো সম্পূর্ণ অলীক এবং যে-জগতে জেগে ওঠে সেটাই বাস্তব। তা হলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রত্যক্ষ বাস্তব জগতের আপেক্ষিক সত্যতাই স্বীকার করা হল।

আস্তিক, নাস্তিক, সংশয়ী

প্রত্যক্ষ মানে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তাকে স্বীকার করতে গেলে বেদের অতিলৌকিক অনুজ্ঞা স্বীকার করা যায় না। বহু প্রস্থানই বেদের প্রামাণ্যতা মানতে পারেনি। এগুলির মধ্যে প্রধান হল বৌদ্ধমত। আত্মা ও পরলোক মানলেও বৌদ্ধধর্ম বেদকে প্রমাণ বলে স্বীকার করেনি, যজ্ঞকেও অস্বীকার করেছে। যখন ঐতিহ্যের অভ্যন্তরীণ প্রস্থানিক বস্তু বিপর্যস্ত হচ্ছে তখনই বাইরের (বাহ্য) ও বিরুদ্ধ (নাস্তিক) বৌদ্ধমতের প্রতিস্পর্ধার বিরুদ্ধে বেদকে উদ্ধৃত করা হয়ে থাকে।... ঐতিহ্যগত (আস্তিক) ও ঐতিহ্যবহির্ভূত (নাস্তিক) মতের পার্থক্য হল ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে সবচেয়ে মৌলিক ও পরিচিত লক্ষণ। ঐতিহ্যবাহিত ভারতীয় স্তোত্রসাহিত্যে যেমন, তেমনই অধুনাতন ভারতীয় দর্শনের সমীক্ষাতেও স্পষ্ট '।(২) 'প্রাচীন গ্রিক ভাষাতেও নাস্তিকতার সংজ্ঞা আদিতে শুধু ঈশ্বরে (অর্থাৎ দেবদেবীতে) অবিশ্বাসীকেই বোঝাত না, ঈশ্বরে বিশ্বাস করুক বা না করুক, রাষ্ট্রের সর্বস্বীকৃত দেবতাদের (অস্তিত্বে) অবিশ্বাসীকেও বোঝাত।(৩) রোম সাম্রাজ্যে (নাস্তিক) খ্রিস্টান অজ্ঞেয়বাদীদের বোঝাত।' দর্শনের কোশগ্রন্থ বলে: 'সংশয়বাদ একটি সমালোচনা শ্রয়ী দার্শনিক মনোভাব হিসেবে জ্ঞানের নির্ভরযোগ্যতা সম্বন্ধে দার্শনিকদের ও অন্যদের যে দাবি, তাকে প্রশ্ন করে।(৪) গ্রিক 'স্কেপটিকস' শব্দটি অনুসন্ধিৎসু এই অর্থ বহন করে; সংশয় শব্দটির অর্থ অনুসন্ধান।

কোনও নিশ্চিত বিশ্বাসের অভাবই সুচিত করে ‘সংশয়’। ইংরেজি doubt শব্দটি বুৎপত্তির দিক থেকে double শব্দটির সঙ্গে অন্বিত, অর্থাৎ এর মুখ্য অর্থ দ্বিত্ব, ‘এটাও হয়, হয়তো। ওটা-ও হয়’—এই মনোভাব। লাতিন dubits প্রাচীন লাতিন dubo, জার্মান zweifel-এ সবের অর্থ দ্বিত্বতা, অর্থাৎ স্থির সিদ্ধান্তের অভাব, দোলাচলতা। তা হলে প্রাচীন গ্রিক, লাতিন, জার্মান সংশয়ের বুৎপত্তিগত অর্থ হল, দ্বিধা, অর্থাৎ নিশ্চয়তার অভাব। এর এক প্রান্তে আছে বিশ্বাস, যার মধ্যে অন্তর্নিহিত দৃঢ়তা, স্থিরতা, অসংশয়িত প্রত্যয়। অপর প্রান্তে আছে ঠিক তার বিপরীত মনোভাব: অবিশ্বাস ও নাস্তিক্য; এর মধ্যেও আছে দৃঢ়তা ও অসংশয়। আস্তিকের যেমন দ্বিধা নেই যে, ঈশ্বর, পরলোক, আত্মা, বেদ সবই আছে এবং সবই প্রামাণ্যক, অসংশয়িত, ঠিক তেমনই নাস্তিকের চিন্তাতেও কোনও যথার্থ দ্বিধা নেই। আস্তিকের মতোই নাস্তিকেরও কোনও সংশয় নেই; সে সংশয়ী নয়, বরং নিশ্চিতই জানে বেদ, আত্মা, পরলোক, ঈশ্বর বা দেবতারা কেউই, কিছুই বাস্তবিক পক্ষে নেই বা প্রমাণসিদ্ধ নয়। এ কল্পনাগুলি তার জীবনচর্যায় অকিঞ্চিৎকার, নিরর্থক এবং বাস্তবে নিষ্প্রয়োজন। অর্থাৎ আস্তিক ও নাস্তিক দুজনেরই তত্ত্বগত অবস্থান ইতিবাচক, এবং স্পষ্ট; শুধু সংশয়ীর অবস্থান ইতি-নেতিবাচক, অতএব অস্পষ্ট। অজ্ঞেয়বাদীর অবস্থানও ইতি-নৌতির মধ্যবর্তী, কিন্তু স্পষ্ট। সে বলে, কিছু আছে কি না বা কেউ আছে কি না। আমি জানি না, জানা যায়ও না। তার জ্ঞানে দোলাচলতা নেই, থাকা-না-থাকা সম্বন্ধে তার না জানাটা খুবই দ্ব্যর্থহীন: সে নিশ্চিত জানে যে, সে নিশ্চিত ভাবে কিছুই জানে না। থাকা ও না-থাকার উভয়মুখী সম্ভাবনাকে সে স্বীকার করে মাত্র; এবং প্রচ্ছন্ন ভাবে সে নিশ্চিত ভাবে জানে না, কিছু আছে কি না, থাকলেও জানা সম্ভব কি না। ঠিক এই অবস্থান প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রে কোথাও স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। কিন্তু মাঝে মাঝে ‘কে জানে’। এ ধরনের বাক্যাংশ থেকে অজ্ঞেয়বাদের আভাস

পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে স্পষ্ট আস্তিক্য, স্পষ্ট নাস্তিক্য এবং স্পষ্ট সংশয়ের প্রকাশই বেশি পাওয়া যায়।

গ্রিসের মতো প্রাচীন ভারতবর্ষেও যজ্ঞক্রিয়াই ধর্মাচরণ ছিল বলে যজ্ঞে ও তৎসংশ্লিষ্ট দেবদেবীতে অবিশ্বাসই ছিল নাস্তিক্য। নাস্তিক্য খুব ব্যাপক শব্দ, এক দিকে কোনও একজনের মনে বিশ্বাসের জগতের সমগ্র ব্যাপারটা নিয়ে আমূল অবিশ্বাস জন্মায় কদাচিৎই। কিন্তু খণ্ড খণ্ড বিক্ষিপ্ত ব্যাপারে, যজ্ঞপ্রিক্রিয়ায়, বিশেষ বিশেষ দেবতা সম্বন্ধে, তাদের উৎপত্তি, অস্তিত্ব, কার্যক্ষমতা, যজ্ঞক্রিয়ার যথার্থ সম্বন্ধে অবিশ্বাস বহু মানুষের মনেই জগতে পারে। এ ধরনের সংশয় সংহিতা ব্রাহ্মাণে, অর্থাৎ কর্মকাণ্ডের সাহিত্যে বিক্ষিপ্ত ভাবে বহুবার ব্যক্তি হয়েছে; এগুলি সংশয়, যদিও এর মধ্যে কিছু কিছু নাস্তিক্যের ধারঘেষা। নেম ভার্গব যখন তৎকালীন শ্রেষ্ঠ দেবতা ইন্দ্র সম্বন্ধে অসংশয়িত উচ্চারণ করেন, ইন্দ্রকে কে জন্মাতে দেখেছে? বলছেন, ইন্দ্র বলে কেউ নেই— তখন সেই যুগের পরিপ্রেক্ষিতে এটা খণ্ড সংশয় থেকে অখণ্ড নাস্তিক্যে উত্তীর্ণ হয়ে যায়। কারণ তখন ধর্ম হল যজ্ঞ এবং যজ্ঞের মুখ্য দেবতাই ইন্দ্র, কাজেই ইন্দ্র নেই' বলা সংশয়কে ছাড়িয়ে নাস্তিক্যের পর্যায়ে চলে যায়।

এ দেশে বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠানের প্রথম পর্ব থেকেই সাহিত্যে বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি নানা অংশ নিয়ে সংশয়ের প্রকাশ দেখা গেছে। বেদে যা আছে তার বাইরেও অন্যান্য সংশয়ের প্রকাশ গণমানসে নিশ্চয়ই ছিল, কারণ বেদে সমগ্র গোষ্ঠীর বিশ্বাস বা সংশয়ের সমস্ত অনুপুঙ্খ নিশ্চয়ই বিধৃত নেই, মোটের ওপর বেদ জনসাধারণের ধর্মাচরণ ও তার বিশ্বাস-অবিশ্বাসের পটভূমিকার একটি প্রতিনিধিত্বমূলক সাহিত্য। তবু তার মধ্যেও অবিশ্বাসের নানা চিহ্ন আছে– দেবতাদের স্বরূপ, আচরণ, অভিপ্রায়, ক্ষমতা এবং যজ্ঞকর্মের যথাযথ্য সম্পর্কে সন্দেহে। সংহিতা থেকে উপনিষদে পৌছোনোর পথ-পরিক্রমায়

সংশয়গুলি বাড়ছিল–সংখ্যায়, প্রকারে, গভীরতায় এবং ব্যাপকতায়। যদিও বিশ্বাস ও তত্ত্বের বিবর্তনের, নিজস্ব ক্রম থাকে, তবু মোটের ওপরে জীবন ও জীবিকার ভিত্তিউৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার সঙ্গে তার একটি অঙ্গাঙ্গি যোগ থাকে, কারণ উৎপাদন অর্থাৎ সমাজের অবগঠন বহুলাংশে সমাজের মানসিক অধিগঠনকে নিবৃপণ করে। মানুষের অবচেতনে প্রত্যাশা থাকে যে, 'তাঁর জীবনের ভিত্তিগত গঠনে পুরো অথবা সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ অংশগুলি তার বোধগম্য হবে এবং তার কর্মপ্রচেষ্টার নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে।'(৫) এই প্রত্যাশাকে চুর্ণ করে বাস্তব অভিজ্ঞতা। মানুষ আবিষ্কার করে যে, তার জীবনের অবগঠনের অনেকটাই তার বোধের এবং নিয়ন্ত্রণের বাইরে। তখনই দেখা দেয় সংশয়–তার জানা জগতের অংশবিশেষ সম্বন্ধে এবং সৃষ্টি সম্বন্ধে; সে সংশয় সমগ্র জগৎ সম্পর্কে।

খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের গ্রিসে তার্কিক সম্প্রদায়ের বক্তব্য, 'যে পৃথিবীটা সকলের পক্ষেই একই রকমের সেটি কোনও দেবতা বা মানুষ সৃষ্টি করেনি; সেটি বরাবরই ছিল, এখনও আছে এবং চিরকালই থাকবে।'(৬) এমন কথা মনে করলে সৃষ্টিকর্ম ও সৃষ্টিকর্তাঁর প্রশ্নটা চলে যায়, থাকে শুধু সৃষ্টিটাই, এবং সেটা প্রত্যক্ষ অতএব সংশয়াতীত।

বাস্তব অভিজ্ঞতা ও সংশয়

উত্তর-মীমাংসা বা বেদান্ত ছাড়া আর কোনও দর্শনপ্রস্থানই প্রত্যক্ষকে অস্বীকার করেনি। এরাও স্বপ্নকে অলীক ও অবাস্তব এবং জাগ্রাৎ অভিজ্ঞতাকে বাস্তব বলে স্বীকার করে প্রত্যক্ষকে অন্তত একটা আপেক্ষিক স্বীকৃতি দিয়েছে। ভূতাবাদী (যারা প্রত্যক্ষ জীবন ও জীবিতকেই স্বীকার করে, আত্মাকে নয়), পরমাণুবাদী (বৈশেষিক, যারা পরমাণুকে সৃষ্টির সূক্ষ্মতম উপাদান বলে), লোকায়ত, সাংখ্য ও ন্যায়-প্রস্থান সকলেই প্রত্যক্ষকে

অবিসংবাদিত সত্তা বলে স্বীকার করে। বেদের যুগে দৃশ্য বা দৃষ্ট বস্তু নিয়ে কারও কোনও সংশয় ছিল না। যা অতীতে ঘটেছে বলে মনে করা হত, অর্থাৎ প্রত্যক্ষের অগোচরে, সেই সব ব্যাপার নিয়ে সংশয় ছিল, যেমন বিশ্বসৃষ্টি বা দেবতাদের উৎপত্তি।

এ ছাড়া সংশয় ছিল যজ্ঞ নিয়ে; কোন যজ্ঞে কী ফল পাওয়ার কথা তা বলাই ছিল। যজ্ঞ করেও প্রত্যাশিত ফল না পেলে স্বভাবতই সংশয় জাগে যজ্ঞের প্রক্রিয়া, দেবতাদের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতা, দেবতাদের যজ্ঞফল দেওয়ার ক্ষমতা, ইচ্ছা এবং শেষত, তাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও। অবশ্যই, কাকতালীয় হিসেবে কিছু কিছু যজ্ঞের ফল পাওয়া যেত। কাজেই এ নিয়ে সংশয় ব্যাপক, গভীর বা সার্বত্রিক হতে পারত না। তবু যত দিন যাচ্ছিল তত নির্ম্মফল যজ্ঞের সংখ্যা বাড়ছিল এবং সংশয়ও বাড়ছিল। যজ্ঞে ফল দেওয়ার প্রতিশ্রুতির দায়িত্ব দেবতাদেরই, সেই ভরসাতেই অত স্তোত্র হব্য দিয়ে তাদের আরাধনা। 'ফল না হলে জন্মায় একটা আততি (tension); (সৃষ্ট হয়) দিব্য অঙ্গীকার এবং এর প্রকাশ্য ব্যর্থতা, অন্য আততিটি হল ঈশ্বরের ইচ্ছা, তার দিব্য পথনির্দেশ ও মানবিক স্বাধীনতা। মানুষের বিরুদ্ধাচরণ করবার ক্ষমতা... পরিনির্দিষ্ট ছক ও বিশৃঙ্খলা, দিব্য নিয়ন্ত্রণ ও স্বাধীনতা–এ দুটি দ্বান্দ্বিকতা।'(৭) দৈব শৃঙ্খলা, দেবতাদের নিয়ন্ত্রণ এ সব মানতে হলে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় এ সবের ব্যত্যয়, অর্থাৎ বিশৃঙ্খলা, নানা ধরনের বিপর্যয় এ সবের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না; ফলে মানুষ সুপরিনির্দিষ্ট দিব্য আকল্পের পৃথিবীতে দেবতাদের প্রতিশ্রুত যজ্ঞফল না পেলে ধাক্কা খায়, তার জানার জগতে এর ব্যাখ্যা মেলে না, তখনই জাগে সংশয়।

শুধু প্রত্যাশিত যজ্ঞফল না পাওয়া নয়, বাস্তব অভিজ্ঞতায় নানা বিরুদ্ধ, ক্ষতিকর অভিজ্ঞতাও তো আছে: খরা-বন্যা-পঙ্গপাল, ব্যাধি-জরা-মৃত্যু,

প্রিয়বিচ্ছেদ, ইষ্টলাভে বঞ্চনা, ইত্যাদি বিভিন্ন অগ্রীতিকর তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্যে মানুষ বুঝে যায় যে, বিশ্ববিধান তার পক্ষে সততই মঙ্গলময় নয়, প্রায়ই দুঃখজনক। দেবতা-নিয়ন্ত্রিত বিশ্বপ্রকৃতির ওপরে ভরসা রাখা চলে না। 'প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণ যদি সর্বব্যাপী হয়, তা হলে যা কিছু ক্ষতি ও যন্ত্রণ ঘটায় তাকে (এ ভাবে) ব্যাখ্যা করতে হবে যে, সব কিছু জানা থাকলে সেটিকে মানুষের পক্ষে হিতকর

বিধাতৃগোষ্ঠী অথবা সর্বমঙ্গলময় বিশ্ববিধান কোনওটাই নিজের উপলব্ধিতে বা বুদ্ধিতে মানুষ পায় না; তাই জাগে সংশয়, যার একটি পরিণতি নাস্তিক্য। সংশয়মাত্রই নাস্তিক্যের জন্ম দেয় না। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে বহু মানুষের চেতন ও অবচেতন মনে বহু যজ্ঞের নিষ্ফলতা, বহু সামাজিক বঞ্চনা, দারিদ্র্য, অত্যাচারের পুঞ্জিত স্মৃতি কোনও কোনও চিন্তাশীল মানুষের মনে সৃষ্টি করত। সমস্ত বিশ্ববিধান সম্বন্ধে গভীর অবজ্ঞা; বিধাতা বা যজ্ঞে-আরাধ্য দেবদেবীদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে এই ব্যাপক সর্বাত্মক সংশয়ের একটি পরিণতি নাস্তিক্য।

সংশয় ও নাস্তিক্যের অন্তর্বর্তী একটি অবস্থার নাম অজ্ঞেয়বাদী (agnosticism), অর্থাৎ বিধাতা বা দেবদেবীরা আছেন কি না সে-বিষয়ে নিজের জ্ঞানের ও বিশ্বাসের অভাব, এবং জ্ঞানের এই অভাবের প্রকাশ্য স্বীকৃতি: 'কেউ কোথাও আছেন কি না জানি না, অর্থাৎ থাকতেও পারে, না থাকতেও পারে। কিন্তু আমি নিশ্চিত নই।' এ অবস্থা সংশয়ের ভিত্তিতেই গড়ে ওঠে, কিন্তু পূর্ণ নাস্তিক্য এটা নয়। গ্রিক দার্শনিক প্রোটাগোরাসের ভাষায়: 'দেবতাদের বিষয়ে আমি জানতে পারি না, তারা আছেন কী নেই, কিংবা কেমন তাদের আকৃতি; কারণ জ্ঞানকে প্রতিহত করে অনেকগুলি বিষয়: জ্ঞেয় বিষয়টির দুর্বোধ্যতা এবং মনুষ্যজীবনের স্বল্পায়ুতা।'(৯) অজ্ঞেয়বাদের ভিত্তি জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা। এতে দু-ধরনের প্রতিক্রিয়া হতে পারে; প্রথমত, নিশ্চিত

বিশ্বাসের অভাবে মমর্যন্ত্রণা এক ধরনের আত্মিক নিরালম্বতা; দ্বিতীয়ত, সমস্ত ব্যাপারটা সম্পর্কেই অনীহা ঔদাসীন্য। অর্থাৎ আমি যখন খেয়েপরে ভাল ভাবেই বেঁচে আছি তখন ভগবান থাকুন বা না থাকুন আমার কিছু এসে যায় না। এ ঔদাসীন্য সংশয়ের অন্তরালেও প্রচ্ছন্ন থাকতে পারে, নাস্তিক্যেও থাকতে পারে। কিন্তু যে-মানুষ জীবনে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে গভীর ভাবে দ্বিধাগ্রস্ত এবং এ দ্বিধায় যার মমর্যন্ত্রণা আছে তার পক্ষে ঔদাস্য তো সম্ভব নয়, তার পক্ষে এ-সিদ্ধান্ত জীবনমরণের সমস্যা হয়ে উঠতে পারে। তবে সংশয়, অজ্ঞেয়বাদ ও নাস্তিক্য এ তিনটির ভিত্তিভূমি। শুধু জ্ঞান নয়, বিশ্বাসও, যেটি উপলব্ধির স্তরে অনুভূতির প্রাস্তবতীর্ণ। এবং জ্ঞান ও বিশ্বাসের দুইয়েরই সঙ্গে গভীর ভাবে সম্পৃক্ত। এবং ঠিক এই কারণেই এই পুরো ব্যাপারটাই জীবনের গভীরতম অংশ থেকে উদ্ভূত, এবং মর্মের স্পর্শকাতর তন্ত্বগুলিতে প্রবল যন্ত্রণার স্পন্দন তোলে। বেঁচে থাকার মানে কী, এ নিয়ে সেই প্রাচীনকাল থেকে পৃথিবীর সর্বদেশে সর্বকালে মানুষ তীব্র ভাবে অনুসন্ধিৎসু। এ সন্ধান শুধু বুদ্ধিগত হলে তা এমন মর্মন্তুদ হত না, শুধু আবেগনির্ভর হলেও হত না, কিন্তু যেহেতু আবেগ এবং মনন এতে সমান ভাবে সম্পৃক্ত, তাই এ ব্যাপারটা সম্পর্কে মানুষের প্রতিক্রিয়া এত জরুরি। আবেগ (emotion), মনন (intellection) এ দুটিই তো ইচ্ছাশক্তি (volition)-কে প্রণোদিত করে, অর্থাৎ মানুষ তার সত্তার সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়। যে-গভীর স্তর থেকে সেখানে সে হয় বিশ্বাসী, নয়। অজ্ঞেয়বাদী, নয় নাস্তিক। এবং এ তিনটি বিকল্পই নিরূপণ করে তার বেঁচে থাকার অর্থের পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্মপন্থা কী। যজ্ঞের যুগে তার জীবনের সমস্ত সংঘাতের, অভাবের, অভিযোগের প্রতিকার চাইবার জায়গা ছিল দেবতাদের অনুগ্রহ এবং সেখানে পৌঁছোবার পথ ছিল যজ্ঞ।

শাস্ত্রে সংশয়

যজ্ঞের যুগের শাস্ত্র রচনার শেষ পর্যায়ে আর্যাবর্তে কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটে। শাস্ত্রগুলি রচিত হচ্ছিল আর্যাবর্তে, গঙ্গার উত্তরে হস্তিনাপুরে। সেখানে কৌরব রাজা নিচক্ষুর আমলে একটি প্রকাণ্ড প্লাবনে আর্যাবর্তের অনেক অংশই বিধ্বস্ত হয়ে যায় খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতকে। সেই সময়ে যজ্ঞ-সম্পর্কিত শাস্ত্র অর্থাৎ ব্রাহ্মণ এবং সংহিতার শেষাংশ রচিত হচ্ছিল। ওই সময়ে রাজধানী হস্তিনাপুর থেকে যমুনার পারে কৌশাম্বীতে সরিয়ে আনা হয়। এ ঘটনার পরে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রের সৃষ্টিশীল পর্যায়ের যেন অবসান ঘটে; (এর পরেও) আচার্য পরম্পরার নাম পাওয়া যায় এবং নিশ্চয়ই কিছু কিছু বৈদিক শাস্ত্রাংশের পুনরানুশীলন চলছিল... কিছু স্বতন্ত্র রচনা যেন নিবন্ধ রইল গৌণ শাস্ত্রচর্চায়, যজ্ঞকর্ম, অর্থশাস্ত্র, ভাষাতত্ত্ব, জ্যোতিষ ও জ্যামিতিতে।' এর অর্থ খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতকের মধ্যেই যজ্ঞতত্ত্ব পরিনির্ষ্ঠিত হয়ে যায়, খুব বড় রকমের কোনও পরিবর্তন আর ঘটেনি। ছোট ছোট যজ্ঞের আঙ্গে সামান্য আঞ্চলিক পরিবর্তন ঘটে থাকতে পারে। কিছু কিছু ছোট যজ্ঞ উদ্ভাবিতও হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু সমস্ত গোষ্ঠীর পক্ষে অনুষ্ঠিত যে সব বৃহৎ শ্রেণীতযাগ, রাজসূয়, বাজপেয়, অশ্বমেধ, অগ্নিচয়ন, সত্র–এগুলি এর আগেই তাদের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক রূপ ও হোতার আবৃত্তি, উদগীতার গান এবং অধ্বন্ধুর উপাংশু (মৃদু স্তরে) আবৃত্তির সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিল। তার অর্থ, এর পরে যে সব যজ্ঞের অনুষ্ঠান হচ্ছিল সাধারণ মানুষ তার সঙ্গে সুপরিচিত ছিল। এর ফলে মানুষ একটু দূর থেকে মিলিয়ে দেখতে লাগল যজ্ঞ থেকে যে-ফল পাওয়ার কথা তা পাওয়া যায় কি না। যখন হিসেব মিলিছিল না। তখন নানা ভাবে নানা সংশয় মানুষের মনে উদ্রিক্ত হচ্ছিল এবং তৎকালীন ও তার পরবর্তী শাস্ত্রে–সংহিতা ব্রাহ্মণ ও উপনিষদে— উচ্চারিত হয়ে স্থায়ী ভাবে বিধৃত রইল।

পরের যুগে জ্ঞানকাণ্ডে, আরণ্যক উপনিষদে পূর্বতন সংশয়ের উত্তর আর মিলল না, বরং যজ্ঞ তখন ব্যাপক ভাবে অনুষ্ঠিত হলেও ক্রমশ যেন গৌণ একটি ধর্মক্রিয়ায় পর্যবসিত হল এবং আত্মব্রহ্মতত্ত্ব নিয়ে চর্চাই হয়ে উঠল

মুখ্য ও গুরুত্বপূর্ণ। এ পর্যায়ে পরিবর্তিত সমাজজীবনের দ্বারা প্রভাবিত মনন জগতে যে সব নতুন সমস্যার উদয় হল, তার মধ্যে জন্ম নিল নবতর সংশয়। এগুলির সঙ্গে পূর্বতন সংশয়ের অনেক পার্থক্য চোখে পড়ে। বিশেষ কোনও দেবতা, তার উদ্ভব, আচরণ, ক্ষমতা, অভিপ্রায় বা যজ্ঞকর্ম ও তার যথাযথ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন আর তেমন নেই। তার বদলে এবং বিশ্বচরাচর মানুষের শরীর, ইন্দ্রিয়, মন এবং এগুলির সঙ্গে বহির্জগতের সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন অনেক বেশি। তা ছাড়া— নতুন কিছু সংশয় আসে আত্মা ও ব্রহ্মা এবং তাদের সম্পর্ক নিয়ে, মরণোত্তর অবস্থান নিয়ে (অবশ্য এ বিষয়ে কিছু সংশয় আগেও দেখা গেছে)। এখন সমাজপতি, শাস্ত্রকার ও পুরোহিতদের সমবেত চেষ্টায় মানুষের জীবনদর্শন ও ধর্মাচরণের লক্ষ্য একেবারে বদলে যায়; পরলোকের অস্তিত্ব এখন স্বীকৃত, অর্থাৎ সাধারণ মানুষ জানে মৃত্যুতেই সব শেষ হয় না, আত্মা থাকে, অতএব পরলোক আছে, স্বর্গ, নরক ও পুনর্জন্ম আছে। স্বভাবতই এখনকার প্রশ্ন মুখ্যত এইগুলি নিয়েই। এই সব উপাত্ত নিয়ে যে-বিশ্ববিধান লোকের মনে দেখা দিল, এ পর্যায়ের প্রশ্নগুলি সেই নিয়ে এবং সে-বিশ্ববিধানের সঙ্গে বাস্তব অভিজ্ঞতার বস্তুনিচয়—শরীর, মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, পঞ্চভুত ও বহির্বিশ্ব, ইত্যাদির সম্পর্ক নিয়ে।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে একাধিকবার পড়ি, ‘ ‘মৃত্যুর পর চেতনা নেই সে কথা বলছি।’ এমন বলেন যাজ্ঞবল্ক্য। ।(১১) এটি সংশয়ের উক্তি নয়, নাস্তিক্যের; কঠোপনিষদে নাস্তিকের একটি সংজ্ঞা হল, যে পরলোকে বিশ্বাস করে না সে নাস্তিক। এখন উপনিষদের বিশিষ্ট তত্ত্বগুলির এক মুখ্য প্রবক্তা হলেন যাজ্ঞবল্ক্য। তিনি স্বয়ং বলছেন, মৃত্যুর পরে আর জ্ঞান থাকে না। জ্ঞানই যদি না থাকে তো আত্মা থাকলেও তেমন আত্মা সুখ-দুঃখের অনুভবের বাইরে। কাজেই স্বর্গনরকও তেমন আত্মার পক্ষে নির্ম্মফল, পুনর্জন্মও সেই কারণে নিরর্থক। অথচ এই যাজ্ঞবল্ক্যই বৃহদারণ্যক উপনিষদেই একটির পর একটি

উপমা সাজিয়ে আত্মার দেহ থেকে দেহান্তরে পরিক্রমা বর্ণনা করেছেন, নানা ভাবে আত্মব্রহ্মা-তত্ত্ব প্রতিপাদন করতে চেয়েছেন। আবার তিনিই বলছেন, মৃত্যুর পরে চেতনা থাকে না। এই যাজ্ঞবল্ক্যই (এমন মতও অবশ্য আছে যে, একাধিক যাজ্ঞবল্ক্য ছিলেন, তারা ভিন্ন ভিন্ন মতের প্রবক্তা) শতপথব্রাহ্মাণে অনেক কারণ দেখিয়ে গোমাংসভক্ষণ নিষিদ্ধ করতে চেয়েছেন, এবং বলেই প্রায় এক নিশ্বাসেই বলেছেন, 'আমি কিন্তু খাব যদি রান্নাটা ভাল হয়'। ইনি ব্রহ্মোদ্যে ব্রহ্মোদ্যে আত্মব্রহ্মা-তত্ত্ব নিয়ে বহু পণ্ডিত ও জিজ্ঞাসুর সঙ্গে তর্ক করেছেন, দৃশ্যমান জগৎ মায়াস্বরূপ ঘোষণা করেছেন, আবার জনকের সভায় উপস্থিত হলে রাজা যখন র্ত্যকে প্রশ্ন করেছেন, 'কী মনে করে ঠাকুর, ব্রহ্মজ্ঞান না গোধনের জন্যে এসেছেন?' তখন অসংকোচেই বলেছেন, 'দুটোরই জন্যে, মহারাজ।' জনক ব্রহ্মিষ্ঠের (ব্রহ্মজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের) পুরস্কার হিসেবে যে বহুসংখ্যক সোনায়-মোড়া শিং গাভি সাজিয়ে রেখেছিলেন, যাজ্ঞবল্ক্য বিনা ব্রহ্ম-সম্বন্ধীয় পরিতর্কে ওই গাভিগুলি নিয়ে বাড়ি চললেন। সমবেত পণ্ডিতরা প্রশ্ন করলে বললেন, 'যিনি ব্রিষ্ঠি তাকে আমরা নমস্কার করি, কিন্তু আমরা এখন এখানে সকলে গাভীর কামনায় এসেছি।' কথাটা সত্যও ছিল, তাই প্রতিপক্ষ তেমন আপত্তিও করেনি, তবু তর্ক হয়েছিল।

যাজ্ঞবল্ক্য সম্বন্ধে এত কথা বলার কারণ উপনিষদের বিশিষ্ট আত্ম-ব্রহ্মতত্ত্বের তিনিই মুখ্য প্রবক্তা, তা সত্ত্বেও ঐহিক প্রয়োজন–গাভি অর্থাৎ বিত্ত সম্বন্ধে তাঁর কোনও ঔদাসীন্য নেই। জনকের কাছে তিনি ব্রহ্মীজিজ্ঞাসুও বটে। আবার গোধনপ্রার্থীও বটে, গোমাংসভক্ষণ সমাজে নিষেধ করার সঙ্গে সঙ্গেই বলেন, 'আমি কিন্তু খাব'। অর্থাৎ তত্ত্ব ও ব্যবহারিক জীবনে অসংগতি তাঁকে পীড়া দেয় না। তাই উপনিষদের আত্ম-ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিপাদন করেও বলেন, মৃত্যুর পরে চেতনা থাকে না। বলছেন। দ্বিধাহীন প্রত্যয়ের স্বরে, ঘোষণার ভাষায়। এই উক্তিতে আত্মা পরলোক জন্মান্তরের সযত্ন রচিত ইমারত যে বিধবস্ত হয়ে

যায় তা কি তিনি জানেন না? জানেন, কিন্তু তবু যে বলছেন এটা তার তত্ত্ব নয়, উপলব্ধি বা মননজাত তত্ত্ব, একে তিনি অস্বীকার করেন কী করে? মরণোত্তর আত্মার সংজ্ঞা তার যুক্তিবুদ্ধির কাছে গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না, তাই দৃঢ়স্বরে তা অস্বীকার করলেন। সমাজের বহু মনীষীর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই এই রকম ছিল: কোথাও প্রত্যয়, কোথাও সংশয়, কোথাও স্পষ্ট নাস্তিক্য।

শুধু বৃহদারণ্যক উপনিষদেই নয়, সাব-কটি উপনিষদ মিলেও একটি সুসংহত দর্শন একেবারেই পাওয়া যায় না। 'উপনিষদগুলি স্বতন্ত্র ভাবে অথবা সমগ্র ভাবে কোনও সম্পূর্ণ, সংহত কিংবা যুক্তিপূর্ণ ভাবে সংগঠিত বিশ্বতত্ত্ব উপস্থিত করে না।'(১২) একটু ভাবলেই বোঝা যায় উত্তর ভারতের বিস্তৃত অঞ্চলে, প্রায় দু-আড়াইশো বছর ধরে বিভিন্ন স্থানে, কালে, বিভিন্ন মনীষীর চিন্তার সংকলন এই উপনিষৎ সাহিত্য; ফলে এর মধ্যে যুক্তির সংহতি খোঁজা বাতুলতা। যে যার অভিজ্ঞতা অকুণ্ঠ ভাবে ব্যক্ত করে গেছেন। তাঁরা অধিকাংশই আচার্য ও শিক্ষাথী; তারা জানতেনও না যে তাঁরা উপনিষদ রচনা করছেন এবং তামাতুলসী গঙ্গাজল ছুয়ে প্রতিজ্ঞাও করেননি যে, নতুন একটি দর্শনপ্রস্থান তারা সৃষ্টি করতে বসেছেন। ফলে বহু পরস্পরবিরোধী উক্তির সমাহার এর মধ্যে রয়ে গেছে। দেশে চিন্তার জগতে আত্মা, পরলোক ও জন্মান্তরকে অবলম্বন করে যে নতুন হাওয়া বইছিল তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এরা প্রত্যেকে নিজের উপলব্ধি ও মনন গ্রন্থনা করে রেখে গেছেন। তাতে সৌষম্য ও সংহতি বজায় রইল। কি না সেটা লক্ষ্য করার দায়ও তাদের ছিল না, কারণ খুব সম্ভব তাদের সকলে পরস্পরকে চিনতেনও না। যজ্ঞ থেকে মানুষের মন সরে গেছে, এমনই একটা পরিবেশে মনীষীরা সমাজে সংহতি রক্ষার জন্যে যজ্ঞের একটা বিকল্প নির্মাণ করছিলেন।

যুক্তির কাঠামো গড়ে উঠেছিল প্রায় দেড় হাজার বছর পরে শংকরাচার্যের হাতে। উপনিষদে যা পাই তা তত্ত্বের দিকে শিথিল, পরস্পর-অসংলগ্ন, কখনও-বা পরস্পরবিরোধীও। তাই তখন যাঁরা জীবন সম্বন্ধে প্রশ্ন করছেন তখন সে-প্রশ্নগুলিও কোনও স্পষ্ট বিষয়কে অবলম্বন করে উদিত হয়নি, ফলে সমগ্র উপনিষদে তত্ত্বের দিকে নানা অসংগতি রয়ে গেছে এবং এইটেই স্বাভাবিক। নানা বিষয়ে নানা অঞ্চলে ও সময়ে বিভিন্ন লোকের মনে নানা সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে। এগুলি পরস্পর-অসম্পৃক্ত, একই ধরনের প্রশ্ন বারে বারে উচ্চারিত হয়েছে। এই প্রশ্নের মধ্যে যেগুলি যজ্ঞ বা যজ্ঞীয় দেবতা সম্পর্কে নয়, সেগুলি এই বিশেষ যুগের চিন্তাধারা থেকে উদ্ভূত, জ্ঞানকাণ্ডের নিজস্ব চরিত্র সেগুলির মধ্যে প্রতিফলিত হচ্ছে। এ সবের মধ্যে যা বিশেষ ভাবে লক্ষ্যণীয় তা হল, প্রশ্নের বৈচিত্র্য, সংখ্যা ও কৌতূহলের ব্যাপক বিস্তার। সংশয় শুধু একটি স্বাভাবিক মননপ্রক্রিয়াই নয়; সংশয়, অবিশ্বাস ও নাস্তিক্য মানুষের জীবনে একটি যন্ত্রণার অভিজ্ঞতাও বটে। যখন কোনও সংশয় থাকে না, নিজের দেহ,মন ও বহির্জগৎ সম্পর্কে একটি নির্দিষ্ট সর্বজনস্বীকৃত ছক মানুষ মেনে নিতে পারে তখন সে-অবস্থাটা মানুষের মানসিক শান্তি ও স্থৈর্যের অনুকুল, জীবন সম্বন্ধে একটা আশ্বাস ও স্বস্তি খুবই আরামের অবস্থা। অথচ পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাওই সম্ভবত সামগ্রিক ভাবে এ-অবস্থা সত্য ছিল না; কিছু সজাগ মনের মানুষের মনে প্রশ্ন উঠেছে, সে সব প্রশ্নের কোনও সদুত্তর মেলেনি, ফলে অনুত্তরিত প্রশ্ন যন্ত্রণা দিয়েছে সংশয়ে, বিশ্বাসহানিতে, নাস্তিক্যে।

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতকে ইহুদি ধর্মের সৃষ্টিশীল পর্বের অবসান ঘটে। এই সময়ে নানা সংশয়, প্রশ্ন উচ্চারণ করেন মনীষীরা। এজরা ও নেহেমায়াহ এদের অন্যতম। এজরা ভগবানকে অনুযোগ জানিয়েছেন, 'তুমি কাউকেই দেখিয়ে দাওনি তোমার আচরণ কেমন করে বুঝতে হয়।'(১৩) যাঁর আচরণই

দুর্বোধ্য, হীনবল ক্ষীণবুদ্ধি মানুষ যদি তা অবধারণ না করতে পারে তবে তা নিয়ে মানুষকে দোষ দেওয়া যায় না। যে-ঈশ্বর মানুষের সৃষ্টিকর্তা বিশ্ববিধানের নিয়ন্তা, তিনি মানুষকে এনে ফেলে রেখেছেন এমন এক পৃথিবীতে যেখানে কেন কখন কী ঘটে তা মানুষের বোধের অতীত। অথচ মানুষ বুঝতে চায় ও বারে বারে অন্ধগলিতে মাথা ঠুকে মরে। তাই এই অনুযোগ, কেন মানুষকে বুঝিয়ে দিলে না কোনও দিন, এই ভুবন যে-নিয়মে চলে তার প্রকৃতি কী? মানুষ বুঝতে চাইছে, পারছে না; কারণ তুমি দুর্বোধ্য আচরণও করবে। আর সে-নিয়ে মানুষের মনে বহুবিধ প্রশ্ন যখন উদিত হবে তখন তুমি তাকে কিছুই বুঝিয়ে দেবে না–কী হয়, কেমন করে হয়, তা কেন তেমন ভাবে ঘটে? চারিদিকে তাকিয়ে মানুষ কোথাও তার সংশয়ের সমাধান খুঁজে পায় না!! এমন বোধ্যাতীত ভুবন-ব্যবস্থায় মানুষ কী রকম অসহায় এবং মনের জগতে কী পরিমাণ পীড়িত ও বিধ্বস্ত তা কি তুমি জান না? এ যেন 'আঁধার রাতে একলা পাগল যায়। কেঁদে/আমায় বুঝিয়ে দে, বুঝিয়ে দে, বুঝিয়ে দে'। এজরার অনুযোগ আরও গভীর, এমনই দুর্বোধ্য বিশ্ববিধানের মধ্যে যদি আমাকে ফেলে রেখে দেবে, তা হলে, স্রষ্টা, আমাকে এমন করে সৃষ্টি করনি কেন যেন আমার মধ্যে কোনও প্রশ্ন না জাগে? 'প্রভু আমার, আমি তোমাকে মিনতি করছি (জানবার জন্যে), কেন তুমি আমার মধ্যে বোধশক্তি দিয়েছিলে?'(১৪) এই মর্মর্যন্ত্রণা থেকে বেদের মনীষীরাও প্রশ্ন করছেন এবং অনুরূপ নিবুক্তর স্তব্ধতার সম্মুখীন হয়েছেন।

সর্বত্রই প্রশ্ন, সংশয়, নিরীশ্বরবাদ, অজ্ঞেয়বাদ ও নাস্তিক্য সমাজবিধায়কদের উন্মার উদ্রেক করেছে। কেন? কারণ তাঁরা ভেবেচিন্তে যে-ব্যাখ্যা দিয়েছেন জীবনের, বিশ্ববিধানের, প্রকৃতির, মানবেদেহের এবং যে বিধান দিয়েছেন মানুষের সম্ভাব্য বিপদ-আপদের থেকে মুক্তির জন্যে, যে-পস্থার নির্দেশ দিয়েছেন প্রকৃতিকে নিজের অনুকূলে এনে সুস্থ, সুখী, দীর্ঘজীবন লাভ করবার

জন্য, মানুষের সংশয় স্পষ্ট উচ্চারিত হলে সে-বিধানের ভিত টলে যায়। পরবর্তীকালে, যখন সমাজে যজ্ঞানুষ্ঠান চললেও বহু মানুষের মনে যজ্ঞ সম্বন্ধে অনীহা দেখা দিয়েছে তখন সমাজে তৎকালীন শাস্ত্রকাররা অন্য কিছু তত্ত্ব উদ্ভাবন করেছেন। সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষের পক্ষে এই নতুন তত্ত্বগুলি গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠেনি। দেখতে পাচ্ছি। রাজা, রাজন্য, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, জিজ্ঞাসু ব্রহ্মচারী ও অন্যান্য কিছু ব্রহ্মাসন্ধানী ব্যক্তিই এই নতুন তত্ত্বগুলি সম্বন্ধে আগ্রহী। এই কালপর্বে সংশয় উচ্চারণ করেছেন এরাই, সমাধান দেওয়ার চেষ্টাও করেছেন। এঁরাই, তবে প্রায়ই প্রশ্নের সঙ্গে সমাধানের কোনও সংগতি থাকেনি। প্রশ্নকর্তারা কখনও-বা ব্যক্তিগত প্রশ্ন ছাড়াও জনমানসে সঞ্চারমাণ অন্য প্রশ্নও উচ্চারণ করেছেন। এঁদের মধ্যে সমাজের বঞ্চিত শ্রমিকরাও আছেন, তারা নিজের যে-প্রশ্ন করলে ওপরমহলে উত্তর দেওয়ার কোনও তাগিদ থাকত না, সেই প্রশ্নই কখনও কখনও অন্যান্য মনীষীরা করেছেন। যেমন নচিকেতা। উত্তর বা সমাধান বহু ক্ষেত্রেই সমাজের সুবিধাভোগী, বিত্তবান শ্রেণির স্বার্থের অনুকূলে; যেমন জন্মান্তরবাদ। যে-মানুষ দুঃখে, অভাবে, অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে ইহজীবন যাপন করে গেল, তার পক্ষে জন্মান্তর তো অভিশাপ। যতই তাকে বোঝানো হোক, এ জন্মে শাস্ত্র-অনুমোদিত ধর্মাচরণ করলে পরজন্মে সুখী জীবন পাওয়া যাবেই। তবু তার এ সংশয় ঘোচে না যে, পরজন্ম এ জন্মেরই পুনরাবৃত্তি হতে পারে, এবং সে-সম্ভাবনা তার পক্ষে ভয়াবহ আতঙ্কের। তা ছাড়া পরজন্মের অস্তিত্বটা তো সংশয়িত। এদের হয়ে কেউ কেউ বলেছেন, 'এ জন্ম থেকে পরজন্মে যাওয়ার কোনও পথ নেই, কিংবা মৃত্যুর পরে কোনও চেতনা থাকে না'। এ সব সংশয় সমাজের বিধায়কদের পক্ষে অত্যন্ত অস্বস্তিকর এবং অপমানকরী: তারা যে-বিধান ও যে-সমাধান দিয়েছেন, সংশয়ী তা মেনে নিচ্ছে না, অতএব সে পাপী। সমাজের প্রত্যন্ত দেশে তখন বহু নামে যজ্ঞবিরোধী, বেদবিরোধী নানা

প্রস্থানের উদয় হয়েছে, তারা বেদ ও যজ্ঞ বাদ দিয়েও দিব্যি আছে। যেহেতু যজ্ঞকারীদের তারা উপেক্ষা করেছে, তাই সমাজও তাদের নিন্দা করেছে।

লোকায়াত সংশয়

তখনকার সমাজের বোধহয় সবচেয়ে বড় নিন্দাসূচক শব্দই ছিল নাস্তিক'। নাস্তিক বেদ স্বীকার করে না, পরলোক ও পুনর্জন্ম স্বীকার করে না এবং কেউ কেউ আত্মাও স্বীকার করে না। এই শেষোক্তারা চার্বাকপন্থী, এরা বলত, 'ন স্বর্গো নাপবর্গে বা নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ'। অর্থাৎ স্বর্গ নেই, মোক্ষ নেই এবং পরলোকে কোনও আত্মা নেই। উপনিষদে ক্ষীণ ভাবে মোক্ষের কথা আছে, কিন্তু স্বর্গ আত্মা এবং পরলোকের কথা সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদে আছে; অতএব বেদের কিছু মৌলিক তত্ত্বকে এরা অস্বীকার করল। যারা এ সব বিশ্বাস করে, তাদের সম্বন্ধে এরা বলল, তারা 'বুদ্ধিপৌরুষহীন', অর্থাৎ তারা নিবুদ্ধি এবং নিষ্পৌরুষ অর্থাৎ কাপুরুষ। কাপুরুষ বা নিবুদ্ধি কেন? কারণ তারা স্বাধীন ভাবে চিন্তা করতে পারে না। বলেই শাস্ত্রকাররা জীবন সম্বন্ধে যা তাদের বুঝিয়েছেন তাই তাঁরা মেনে নিয়েছে। শুধু চার্যাক নয়, বার্হস্পত্য, জৈন, বৌদ্ধ এবং আজীবিকরাও বেদের বহু মৌলিক তত্ত্বকে সম্পূর্ণভাবে পরিহার করে নিজস্ব মতামত উপস্থাপিত করেছেন। যজ্ঞের উপযোগিতা এরা কেউই মানেননি, এবং বেদ মূলত যজ্ঞনির্ভর। মুণ্ডক উপনিষদেই একবার মাত্র স্পষ্ট ভাবে উচ্চারণ করা হয়েছে যে যজ্ঞগুলি অদৃঢ় নৌকো, পারে নিয়ে যাওয়ার শক্তি তাদের নেই। এ ছাড়া পুরো জ্ঞানকাণ্ডে কিন্তু ধরেই নেওয়া হচ্ছে যে, সমাজে যজ্ঞ চলছে এবং চলবে। তারই মধ্যে এক বিরুদ্ধশক্তি নানা নামে, নানা প্রস্থানে চিহ্নিত হয়ে সমাজে বিদ্যমান। কৌতুকের বিষয় হল, অবৈদিক প্রস্থানগুলিকে পরবর্তী সাহিত্যে সাধারণ ভাবে লোকায়ত বলা হয়েছে। লোকায়ত শব্দের অভিধানগত অর্থ, 'লোকে আয়ত' অর্থাৎ যা

সাধারণ মানুষের মধ্যে পরিব্যাপ্ত। যজ্ঞের পরে ফলের অপ্রাপ্তি যজ্ঞযুগে সংশয়ের সবচেয়ে বড় ভিত্তি রচনা করেছিল। তারই সঙ্গে সঙ্গে চক্ষুষ্মান মানুষের অভিজ্ঞতা যখন তার অন্তর্নিহিত ন্যায়ের বোধের বিপরীত হয়, যখন সে দেখে দুর্জনের প্রতিপত্তি বাড়ছে, সজ্জন দু'। বেলা অন্নসংস্থান করতে পারছে না, যে-মানুষ বিবেকবান, সৎ-কর্মচারী, সে নিরন্তর দুঃখই পাচ্ছে, তখন তার জীবন ও ন্যায়বিচার সম্বন্ধে এবং পূর্বতন 'ঋত'র বোধের সম্বন্ধে অন্তর্নিহিত প্রত্যাশা গুরুতর ধাক্কা খায়; দেখা দেয় সংশয়। লোকায়াত চার্বাক্যমত যজ্ঞ, আত্মা, দেবদেবী, স্বর্গনারক, পরলোক ও জন্মান্তর স্বীকার করে না, বেদের প্রামাণ্যতা স্বীকার করে না। এই মত ও বিশ্বাস লোকে আয়ত বা সমাজে গণমানসে বিস্তৃত ছিল?

এটা স্বীকার করলে বোঝা যায়, শাস্ত্র লোকায়ত মত সম্বন্ধে কেন এত অসহিষ্ণু, কেন চার্যাককে মহাভারত-এ (ও পরে বেণীসংহার নাটকেও) রাক্ষস বলা হয়েছে! দুর্যোধনের বন্ধু বলা হয়েছে। কেন 'ধামিক' ব্রাহ্মাণেরা তাকে তাড়া করে বধ করে। লোকায়তিক চার্বক তা হলে সেই সব কথাই বলেছেন যা জনসাধারণের মনে সন্দেহের আকারে ছিল; তার ভাষায় তা প্রত্যয়ের বুপে প্রকাশিত হল। বোঝা যায় কেন পরস্পরবিরোধী দর্শনপ্রস্থানও (যেমন মীমাংসা, যার অপর নাম পূর্বমীমাংসা এবং বেদান্ত, যার প্রতিশব্দ উত্তরমীমাংসা) এবং সাব-কটি দর্শনগ্রন্থই চার্বক মত আগে খণ্ডন করে পরে নিজ মত প্রতিষ্ঠা করেছেন। এর থেকে সূচিত হয় যে, চার্বক মত আসলে শুধু জনপ্রিয়ই ছিল না; সমাজে এ মতের বহু অনুগামী ছিল, তাই প্রয়োজন হয়েছিল সে-মতকে খণ্ডন করার–যাতে তার প্রসার রোধ করা যায়। মানুষ যখন তার অভিজ্ঞতায় ও মননে স্বর্গনরক, দেবদেবী, আত্মা, পরলোকের অস্তিত্বের কোনও নির্ভরযোগ্যতা প্রমাণ না পেয়ে সন্দিগ্ধ হয়, তখন বেদে নির্দেশিত তত্ত্বগুলিতে সে আর বিশ্বাস রাখতে পারে না। তখনই তার ওপরে নেমে আসে

শাস্ত্রকারদের অজস্র কটুবাক্য এবং অভিসম্পাত। জনসাধারণ্যে যখন এ সব সন্দেহ–যার অন্তিম রূপটি হল নাস্তিক্য–প্রসার লাভ করছিল তখন তাকে ‘লোকায়াত’ বলে গাল দেওয়া ছাড়া শাস্ত্রকারদের গত্যন্তর ছিল না। লোকে, লোকমানসে এর বিস্তাঁর ছিল বলেই লোকায়তের সম্বন্ধে আতঙ্কটি এত বাস্তব, এবং তাই এত অসহিষ্ণুতা।

মহাভারত-এর শান্তিপর্বে একটি উপাখ্যানে পড়ি:

‘এক ধনী বণিক রথে চড়ে যাচ্ছিলেন, পথে এক ব্রাহ্মণ চাপা পড়েন; ব্রাহ্মণটি আত্মহত্যা করতে উদ্যত হলে এক শৃগাল তাকে নিবৃত্ত করে বলে যে, ‘আত্মহত্যা নাস্তিকোচিত কাজ, এটা করা ঠিক নয়। গতজন্মে সে নিজে নিরর্থক আন্বীক্ষিকী ও তর্কবিদ্যায় অনুরক্ত ছিল, হৈতুক অর্থাৎ যুক্তি দিয়ে সব কিছুর হেতু নির্ণয় করতে চেষ্টা করত, বেদনিন্দক ও নাস্তিক ছিল, তাই এজন্মে শৃগাল হয়েছে।’

এখানে লক্ষ্যণীয় তর্ক, আন্বীক্ষিকী (যুক্তিবিদ্যা) ও নাস্তিকতা এক নিশ্বাসে উচ্চারিত; এগুলি গহিত পাপ, যার ফলে বক্তার শৃগালজন্ম হয়েছে। এখানে পুরোহিততন্ত্রের ও শাস্ত্রকারদের উন্মা যুক্তিবাদের ওপরে–বেদের নিন্দা, নাস্তিকতা, হেতুবাদিত্বের ওপরে। অর্থাৎ পরিষ্কার দুটি বিকল্প: এক দিকে বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করে শাস্ত্রকার পুরোহিতদের নির্দেশ মতো যজ্ঞ করা, দেবদেবী, আত্মা, পরলোক, স্বর্গনরক, জন্মান্তরে চোখ বুজে বিশ্বাস করা; অন্য দিকে এ সব সম্বন্ধে মনে সন্দেহের উদয় হলে যুক্তিতর্ক দিয়ে ব্যাপারটা যুক্তিগ্রাহ্য কি না, অর্থাৎ বিশ্বসনীয় কি না বুঝে দেখার চেষ্টা করা এবং যদি যুক্তিতর্কে তার যথার্থ সম্বন্ধে নিশ্চয়তা না মেলে, তবে খোলাখুলি তাকে স্বীকার করা এবং বিশ্বাসের বদলে সংশয় পোষণ করা। শৃগালের উপাখ্যানে উল্লিখিত পাপগুলি একই গোত্রের অর্থাৎ চোখ বুজে আপ্তবাক্যে বিশ্বাস না করে

সাধারণ বুদ্ধি, যুক্তি, তর্ক, হেতুবিদ্যা (অর্থাৎ কোনও ব্যাপারে কার্যকারণ সম্বন্ধের খোজ করা) এ সবের ওপরে ভরসা রাখা। এতে সমাজপতিদের এত উষ্মা কেন? বেদনিন্দক, হৈতুক, তর্কাশ্রয়ী মানুষ বেদের প্রামাণ্যতা স্বীকার না করে তার নিজস্ব চিন্তা যুক্তিতর্কের ওপরে ভরসা করে চললে শাস্ত্রকাররা সমাজের সংহতির জন্যে যে-ছকটা তৈরি করেছেন সেটা ঝরে পড়বে। এই অবাধ্যতা তো আধ্যাত্মিক স্তরে একটা প্রতিস্পর্ধা এবং জাগতিক স্তরে অসহযোগ, সমাজের ওপরতলার লোকের আধিপত্য ও কর্তৃত্ব অস্বীকার করা। পৃথিবীতে কোনও সময়ে কোনও সমাজের অধিকর্তারা সাধারণ লোকের আনুগত্যের এই অভাবকে স্বীকার করেননি, উপেক্ষাও করেননি। এখানেও তাই নানা হুমকি, অভিশাপ, পরজন্মে হীন অস্তিত্বের ভয় দেখানো।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র-তে তাই সাংখ্য, যোগ ও আধীক্ষিকীকে একই পর্যায়ের বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মনুতে আন্ধীক্ষিকীকে পরিহার করা হয়েছে; দণ্ডনীতি, অর্থনীতি, ত্রয়ী (বেদচর্চা) ও বার্তাকে (কৃষি, ইত্যাদি) স্বীকার করা হয়েছে। শংকরাচার্য মনুকে বারবার উদ্ধৃত করেন এবং সবচেয়ে প্রামাণ্য ধর্মশাস্ত্র বলে প্রয়োজনীয় শাস্ত্র হিসেবে স্বীকার করেন। মনুই প্রাচীন ভারতের সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের নিরিখ নির্মাণ করেছেন। এবং মনুতে যুক্তিতর্ক দিয়ে বুঝবার শাস্ত্রগুলিকে পরিহার করা হয়েছে। যুক্তির চর্চা না থাকলে সমাজে আপ্তবাক্য, বেদ ও ধর্মশাস্ত্রের অনুজ্ঞাই চূড়ান্ত ভাবে প্রামাণ্য বলে স্বীকৃত হবে, অপর পক্ষে যুক্তিতর্ক ও তৎসংশ্লিষ্ট কোনও বিদ্যা বা শাস্ত্রকে স্বীকার করলেই সমূহ বিপদ। তখন মানুষ নিজের দেহমন, বহিঃপ্রকৃতি, বিশ্বচরাচর, যজ্ঞ, এসবের সমর্থন যখন যুক্তির মধ্যে পায় না। এবং সন্দিহান হয়ে ওঠে, এবং প্রকাশ্যে সে সংশয় যখন ঘোষণা করে, তখন সে বৈপ্লবিক সন্দেহ সংক্রামক হয়ে যায়। অন্য লোকের মনে যদি বীজাকারেও কোনও সংশয় চাপা থাকে তখন প্রকাশ্যে অপরের ঘোষিত সংশয়ে সে আপনি সন্দেহের সমর্থন পায়; এমনই করে বিস্তার লাভ করে অবিশ্বাস, ফলে

সমাজপতিদের সযত্ননির্মিত সংহতি বিপন্ন হয়। ‘বেদের বক্তব্য সম্বন্ধে শাস্ত্রকারদের যথার্থ আগ্রহ নেই। তার পরিবর্তে তাদের উৎসাহ বেদকে একটি রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখায়–যে প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরলোক ও দেবতার ভয় দেখিয়ে জনসাধারণকে সার্থক ভাবে বশীভূত রাখা যায়; অতএব তারা সদর্পে ঘোষণা করতে পারেন যে, বেদেই সর্বোত্তম প্রজা বিধৃত আছে।’(১৫) কাজেই ব্যাপক সংশয়ে রাষ্ট্রব্যবস্থা বিপন্ন হতে পারে বলেই বেদের প্রামাণ্যতা প্রতিষ্ঠা করা এত জরুরি, এবং পৃথিবীর সমস্ত ধর্মগ্রন্থ সম্বন্ধেই এ কথা প্রযোজ্য। সন্দেহ প্রতিষ্ঠিত সামাজিক সংহতিকে বিপর্যস্ত করতে পারে। বলেই সন্দেহ সম্পর্কে সমাজপতিদের সন্দাজাগ্রত আশঙ্কা এবং উদগ্র রোষ।

গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজব্যবস্থা ও তার ধর্মাচরণ ভেঙে গেলে নতুন একটি সমাজের গঠনের সূচনাকালে রচয়িতারা বেদের ব্রাহ্মণসাহিত্যে যজ্ঞের সংখ্যা, অনুপুঙ্খ, ব্যাপ্তি, ইত্যাদি নিয়ে ব্যাপৃত হয়ে পড়লেন; আশঙ্কা ওই একই, সামাজিক সংহতি পাছে নষ্ট হয়। যুক্তির বেশি প্রয়োগ ঘটলে আপ্তবাক্য প্রামাণ্যতা হারায়, সংশয়ের সংখ্যা, গভীরতা ও ব্যাপ্তি বাড়ে। তা বলে সমাজপতিরা কি যুক্তির কোনও ভূমিকাই স্বীকার করেননি? করেছিলেন বই-কি, শাস্ত্রবাক্য যে অভ্রান্ত, মান্য এবং চূড়ান্ত ভাবে প্রামাণ্য, এইটে প্রমাণ করার জন্যে সুদীর্ঘকাল ধরে ব্রাহ্মণসাহিত্য, দর্শনপ্রস্থানগুলি, টীকা, ভাষ্য, ধর্মশাস্ত্র ও নিবন্ধ রচনা হয়েছে। এবং শুধু ভারতবর্ষে নয়, খ্রিস্টান, ইসলাম ও অন্যান্য সমস্ত ধর্মের ক্ষেত্রেই এ ব্যাপারটা একই ঌলাgদ শ[pgঙ্ক।

এত আয়োজন সত্ত্বেও যদি সংশয়ী বলে, ‘তোমরা যা বলছি তা আমার বিশ্বাস হয় না, কে দেখেছে দেবতাদের উৎপত্তি, কে বলেছে যজ্ঞে ফল হয়, কেন মানতে যার যা দেখতে পাইনে, বুদ্ধিতে যুক্তিতে যার কোনও হদিস মেলে না।

তাকে?' এ তো সর্বনাশ সমাজের পক্ষে। কাজেই নাস্তিক, বেদনিন্দক, ইহলোকবাদী, লোকায়তিক ভূতাবাদ, সাংখ্য, প্রধানবাদ, পরমাণুবাদ ও ন্যায়–এদের যারা স্বীকার করে তারা এবং এদের ভিনদেশি বিকল্পরা সর্বদেশের শাস্ত্রে ধিকৃত। কিন্তু মুশকিল হল, 'যদি ভারতীয় দর্শনে কোনও কিছু সার্থক ভাবে প্রাগ্রসর বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে থাকে। তবে তা হল লোকায়ত মত, অর্থাৎ (সেই মত যা বলে) চেতনা, যাকে সাধারণত আত্মা বা মনের বিশিষ্ট লক্ষণ বলা হয়, তা কেবলমাত্র বস্তু থেকেই উদ্ভূত।'(১৬) এই মত ছিল লোকায়ত। লোকে তো জানত যে আত্মা বলে কোনও কিছুকে দেখা যায় না, অতএব সেটা আছে কি না, মৃত্যুর পর থাকবে কি না। এ বিষয়ে তা স্বাভাবিক ভাবেই লোকের সন্দেহ হবে। চার্বক যেমন বলেন, শাক থেকে সুরা হয়, অথচ শাকে সুরার কোনও গুণই নেই; রাসায়নিক প্রক্রিয়াতেই বস্তুর এমন গুণগত, আকৃতিগত, প্রকৃতিগত পরিবর্তন হয়; কাজেই শরীরে বিশিষ্ট ধরনের অবয়বসংস্থান ঘটলে আপনিই তার থেকে চেতনার উদ্ভব হয়। যেমন চুন সাদা, হলুদ হলদে রঙের, অথচ এ দুটি মেশালে লাল রং হয়, অথচ লাল রং হলুদেও ছিল না, চুনেও ছিল না। রাসায়নিক প্রক্রিয়াতেই উপাদানে অবিদ্যমান গুণ বা লক্ষণ পরিণত পদার্থে উদ্ভূত হয়। তেমনই করে মানুষের শরীরের ইন্দ্রিয়ের বিশেষ ধরনের সমাবেশ ঘটলে, ইন্দ্রিয়গুলিতে অনুপস্থিত নতুন ব্যাপার, চেতনার উদয় হয়, এই চেতনাতে আছে মনন, ইচ্ছা ও অনুভব। এর বাইরে চেতনার কোনও প্রকাশ লোকায়ত দর্শন মানেনি। এই দিয়েই মানুষের জীবনের অভিজ্ঞতাগুলির ব্যাখ্যা হয়; হয় না। শুধু মরণোত্তর আত্মার। সাধারণ মানুষের সে আত্মায় কোনও প্রয়োজনই নেই, এবং যেহেতু ইন্দ্রিয়গুলির কাছে তার কোনও প্রমাণ মেলে না, চিন্তায় কল্পনায় কেউ কেউ তাকে শাস্ত্রকারদের নির্দেশিত রূপে অবধারণ হয়তো করতে পারেন, কিন্তু অধিকাংশ সাধারণ মানুষের এমন আত্মার কোনও প্রয়োজনও নেই এবং দেহবিনিমুক্ত এই অবস্তুকে তারা

সম্যকবুপে ধারণাও করতে পারে না, চায়ও না। অতএব একটি লোকায়ত অনাস্থা বৈদিক সমাজে ব্যাপক ভাবেই ছিল।

বিশ্বাসের পরম্পরা

অনাস্থা কীসে? আগেই দেখেছি, বেদের প্রামাণ্যতায়, দেবদেবী, স্বর্গনরক, পরলোক, আত্মা ও জন্মান্তরে। অনাস্থা নেতিবাচক; কিন্তু আস্থা বা বিশ্বাস যে সাধারণ মানুষের এ সব তত্ত্বে কোনও দিন ছিল, তারও তো কোনও প্রমাণ নেই! সেই ঋগ্বেদের আদিপর্বের ঋষিমণ্ডলগুলি (২-৭) থেকেই তো বহু অনাস্থার প্রকাশ রয়েছে। তা হলে সর্বজনীন বা ব্যাপক ভাবে বিশ্বাস কোনও দিন ছিল তা প্রমাণ করা যাবে না, বরং যেটা স্বতঃসিদ্ধ সেটা হল, কিছু মানুষ সর্বদেশে সর্বকালে বিশ্বাস না করে বাঁচতে পারে না; তাদেরকে সমাজপতি ও শাস্ত্রকাররা যা বিশ্বাস করতে বলত তারা তাই বিশ্বাস করত। সম্ভবত এরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল, তাই সমাজে সংহতি রক্ষিত হত, যজ্ঞক্রিয়া সম্পাদিত হত, বিশেষ কোনও বৈপ্লবিক চিন্তা প্রশ্রয় পেত না। এরা সমাজে সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও আপনিই প্রমাণিত হয় যে, সমাজে সংখ্যালঘু মানুষ অন্য রকম ছিল, তাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো বিশ্বাস করার দরকারই বোধ করত না; তাদের মননে ও আচরণে এ সব সম্বন্ধে একটা সহজাত ঔদাসীন্য ও অনীহাই ছিল। চিরকালই পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের সম্বন্ধেই এ কথা প্রযোজ্য। এদের মধ্যে অধিকাংশই হয়তো সক্রিয় ভাবে যজ্ঞক্রিয়ায় যোগ দিত। কিন্তু সে-ব্যাপারে বিশ্বাসের বদলে যা তাদের প্রণোদিত করত, তা দীর্ঘকালের ঐতিহ্য থেকে সঞ্জাত একটা জড়, অসচেতন অভ্যাস, যেমনটি আজও অধিকাংশ পুজোআচ্চার অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে সত্য। আর সর্বদেশে সর্বকালে যা সত্য তা হল সমাজে স্বল্পসংখ্যক কিছু মানুষ ছিল যারা বিশ্বাস করতে চাইত, কিন্তু পারত না। এদের চিত্তবৃত্তি অতিশয় জাগ্রত ছিল, তাই যুক্তিতে মননে যাকে সিদ্ধ করতে পারত না তা বিশ্বাসও করতে পারত না। এদের সাধ্য ছিল না মননের

সাক্ষ্যের বিরুদ্ধে শুধু চিরাচরিত, ঐতিহ্যগত আপ্তবাক্য বলেই কোনও কিছুর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ ও সেই অনুসারে আচরণ, অর্থাৎ সচেতন ভাবে, স্বেচ্ছায়, সক্রিয় ভাবে যজ্ঞকর্মে অংশগ্রহণ করার।

আর্যদের যজ্ঞনির্ভর সমাজের বাইরে তখনই ছিল বৃহৎ প্রাগার্য গোষ্ঠী, যাদের ধর্মবিশ্বাস এবং আচরণ ও অনুষ্ঠান অবশ্যই ভিন্ন ছিল। বেদ এদের মধ্যে কাউকে তুচ্ছ করে যতি' বলেছে এবং খবর দিয়েছে যে দেবশ্রেষ্ঠ ইন্দ্র যতিদের সালাবৃকদের (wolf-hounds?) কাছে সমর্পণ করেছেন। আবার কোনও কোনও অবৈদিক, সম্ভবত প্রাগার্য গোষ্ঠীর সম্বন্ধে তাচ্ছিল্য ভরে বলা হয়েছে যে, তারা শিশ্নদেব, অর্থাৎ হয়তো একান্ত ভাবে যৌনতাপরায়ণ অথবা লিঙ্গপূজক। এ ছাড়াও নানা রকমের মতবাদ অবশ্যই ছিল কারণ যজুর্বেদের 'শিবসংকল্পসূত্র' এবং অথর্ববেদের বহু সূক্তে উল্লেখ পাই যাদের বিশ্বাস ও আচরণ ভিন্ন'। তাই নানা মত ও পথ। তখনই সমাজে সহাবস্থান করত, যদিও সম্ভবত, অধিকাংশের না হলেও মুখ্য অংশের ধর্মাচরণ ছিল যজ্ঞকেন্দ্রিক। কিন্তু সমাজের মানুষ যারা কৌতুহলী, স্বাধীনচেতা, নিজের গোষ্ঠীর বিশ্বাস ও আচরণে অতৃপ্ত তারা সেই অনুসন্ধিৎসা বা নানা ধরনের মত, পথ ও আচরণের যাচাই করত। সমাজে প্রচলিত আপ্তবাক্যনির্ভর ধর্মাচরণে এরা অসহিষ্ণু। এরা সন্দেহ প্রকাশ করত। কথায় এবং সম্ভবত আচরণেও। প্রথা সিদ্ধ ধর্মাচরণকে নিয়ে এরা কখনও ব্যঙ্গকৌতুক করেছে, কখনও-বা জিজ্ঞাসু ব্রহ্মচারীর মতো অধিক বিদ্বান বা মনস্বীর কাছে আপন সংশয় ব্যক্ত করে সমাধানের সন্ধান চেয়েছে। তৎকালীন ইতিহাস ও সাহিত্য থেকে যেটা প্রতিপন্ন হয় তা হল, একটি প্রধান মত ও বহুজন-আচরিত একটি ধর্মপন্থা থাকা সত্ত্বেও তখনই সমাজে বহু বিশ্বাসের আকল্প চালু ছিল, এবং কালের গতিতে এ সব আকল্প বহু ধর্ম ও দর্শনপ্রস্থানের আকারে নানা বিকল্পের রূপে প্রতিভাত হচ্ছিল। ফলে চোখ বুজে বেদ রচয়িতাদের বিশ্বাস

মেনে নেওয়ার মতো মানসিকতা অনেকেরই ছিল না। প্রতিবাদী বা অবিশ্বাসীকে সব দেশেই চিরকাল সমাজের শক্তিমান গোষ্ঠী অবজ্ঞা করেছে। বাইবেল-এ বারবার বলা হয়েছে, মূঢ় মনে মনে বলেছে ঈশ্বর নেই।'(১৭) ইসলামি ধর্মতত্ত্বে নাস্তিকের পরিণাম খুব যন্ত্রণাময় একটি নরক 'হাবিয়া দোজখ'-এ। ভারতবর্ষেও বারবারই বলা হয়েছে নাস্তিক, চার্বাকপন্থী, লোকায়ত, বার্হস্পত্যপহী, ইত্যাদি মানুষের পরিণতি শোচনীয়। সমাজের শৃঙ্খলা, যজ্ঞনিষ্ঠ ধর্মবোধে যাদের অন্তরাত্মা শান্তি পায়নি, যারা সৃষ্টিতে, বিশ্বচরাচরে এবং সমাজে কার্যকারণ সম্পর্ক খুঁজেছে কিন্তু পায়নি–শাস্ত্রে তাদের প্রতি অতি পরুষ অভিশাপবাণী উচ্চারিত হয়েছে। তারা প্রকাশ্যে প্রতিরোধী; অন্তরে প্রচ্ছন্ন বিপ্লবী। শাস্ত্রকর্তারা যে-শৃঙ্খলা রচনা করেছেন, তাদের কাছে সেটা শৃঙ্খল বলে প্রতিভাত হয়েছে, কারণ তার মধ্যে কার্যকারণ পরম্পরার শৃঙ্খলা নেই। এই কার্যকারণের সন্ধান করে যে-যুক্তিপ্রস্থান, তা-ই পরবর্তীকালে আন্বীক্ষিকী–তর্কশাস্ত্র বলে অভিহিত হয়েছে এবং এগুলির চর্চাকে শাপশাপান্ত করা হয়েছে।

ধর্মবিশ্বাসের উদ্ভব নিয়ে পণ্ডিতেরা মোটামুটি একমত যে, এর উৎসে আছে ভয় ও বিস্ময়। বিশ্বচরাচরে পূর্বাভাস ছাড়াই বহু বিপদ আসে–ঝড়, বজ্রপাত, খরা, বন্যা, মহামারি, অভাব, অনাহার, ঈতি (শস্যের ক্ষতিকারী ঘটনা), শোক, মৃত্যু এবং বিচ্ছেদ। এ ছাড়াও ছিল হিংস্র শ্বাপদ ও শক্তিমান অত্যাচারী গোষ্ঠী এবং বহু আকস্মিক দুর্বিপাক। এগুলির ওপরে মানুষের হাত ছিল না, তাই ভয় জগত প্রাণে। সে-ভয় থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যই মুখ্যত সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান দেবতার কল্পনা। এ ছাড়া ছিল বিস্ময়: সৌন্দর্য, আকাশের ব্যাপ্তি, মানবদেহের শোভা–কে এ সব সৃষ্টি করল? যে-ই করে থাকুক। সে মহান, শক্তিমান, মঙ্গলময়, শ্রীময়–অতএব নমস্য। এখানে কার্যকরণবোধের কোনও ব্যাপারই নেই; আছে শুধু পৃথিবী ও মানুষের

শোভায়, মহিমায় মানুষের মুগ্ধতা। ভয় জাগে মানুষের নিয়ন্ত্রণক্ষমতার বাইরের ঘটনা থেকে–যে-অশুভ ভয়ংকর, ক্ষতিকর শক্তি বিশ্বে, জীবনে ও সমাজে বিদ্যমান, যার কাছে প্রতিনিয়ত পরাজিত হচ্ছে মানুষের সীমিত ক্ষমতা। স্বভাবতই সে-সম্বন্ধে মানুষের মনে একটা প্রবল ত্রাসের সৃষ্টি হয়। এখানেও কার্যকারণ সম্পর্ক মানুষের বোধের সম্পূর্ণ বাইরে থাকে। কেন কী হয়, মানুষ ভেবে পায় না। শাস্ত্রকার সমাধান জুগিয়ে দেন দেবমণ্ডলী নির্মাণ করে; জীবনের সমস্ত বিপদ-বিপর্যয় থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যে তাঁদের শরণাপন্ন হওয়ার যথাবিহিত উপায় নির্দেশ করে। সে-উপায় যজ্ঞ। কেমন করে করতে হবে সে বিষয়েও তারা বিস্তারিত নির্দেশ দেন। কিন্তু সমস্ত বোধের ও বিশ্বাসের জগৎটি নির্মিত হয়। কার্যকরণ পরম্পরাকে পরিহার করে। যতক্ষণ এই সব নিয়ে জীবনের অবাঞ্ছিত অভিজ্ঞতা থেকে মানুষ বাস্তবে এবং/বা কল্পনায় নিস্তার পায়, ততক্ষণ সবই ঠিকঠাক চলে। কিন্তু যখন কারও মনে প্রশ্ন আসে, দেবতারা যে আছেন তার প্রমাণ কী? যজ্ঞে যে ইষ্টফল পাওয়া যায় তা যখন অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলছে না। তখন তারই বা প্রমাণ কী? যজ্ঞ যে প্রণালীতে অনুষ্ঠিত হয় সেটা যে যথার্থ, অর্থাৎ দেবতাদের প্রীতিজনক, তার প্রমাণ কোথায়? এই অবস্থায় মানুষ না জেনে খোঁজ করে কার্যকরণ সম্পর্কের, এবং এইটিকেই পৃথিবীর সর্বত্রই চিরদিনই অত্যন্ত আপত্তিজনক এবং সমাজের পক্ষে নাশকতামূলক আচরণ বলে মনে করা হয়েছে।

যজ্ঞ এবং বিশ্বাসের আকল্পের অনুপুঙ্খ নিয়ে সন্দেহ থেকে আরম্ভ করে সমস্ত বিশ্বাসের মূল তত্ত্বটি সম্পর্কে সংশয় জাগলে তা নাস্তিক্য বলেই অভিহিত হয়। সংশয়, অজ্ঞেয়বাদ ও নাস্তিক্য একই অভিজ্ঞতার বিভিন্ন মাত্রা ও স্তরে বিন্যস্ত; চূড়ান্ত অবস্থানটি নাস্তিক্য, অর্থাৎ বিশ্বাসের সাবিক অভাব। কিন্তু যথার্থ ধর্মবিশ্বাসে. সর্বদাই একটি সন্দেহ সংশ্লিষ্ট থাকে।(১৮) বিশ্বাসে যেমন সন্দেহ অন্তলীন থাকে, তেমনই সন্দেহের অন্তরেও একটি বিশ্বাস থাকে। কবি টেনিসন

বলেন, ‘খাটি সন্দেহের মধ্যে অনেক বেশি বিশ্বাস থাকে। (১৯) কী সেই বিশ্বাস? কার্যকরণ-পরম্পরা; আজ এখনও আমরা না বুঝতে পারলেও সেটা যে আছে এমন বিশ্বাস। সন্দেহ ও নাস্তিক্যের ভিত্তিভূমি মানুষের অবচেতনে এই প্রত্যয় যে, সংসারে নিষ্কারণ কিছুই ঘটে না, সব কিছুই কার্যকরণ পরম্পরায় গ্রথিত, তার কতক আমাদের জানা। কিছু-বা অজানা, কিন্তু সত্যকার আকস্মিক বলে কিছুই নেই। কোনও না কোনও দিন সেই সব কারণ জানা যাবে, যা এখনও মানুষের অজানা।

প্রশ্ন ও প্রগতি

এই প্রত্যয় সন্দেহের ভিত্তি বলেই সন্দেহ পৃথিবীর জ্ঞানবিজ্ঞানের অগ্রগতির কারণ। আপেল মাটিতে পড়ে কেন, এ প্রশ্ন নিউটনকে যদি বিচলিত না করত তা হলে মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব

আবিষ্কারই হতে পারত না। তেমনই, কে দেখেছে ইন্দ্রকে জন্মাতে? এ প্রশ্ন মানুষকে ভাবিয়েছে যে, যেহেতু সব মানুষই একদিন জন্মায় এবং অধিকাংশ দেবতাই যাস্কের মতে মনুষ্যকৃতি, তাই ইন্দ্রেরও নিশ্চয়ই একদিন জন্ম হয়েছিল, কিন্তু কেউ তো তা দেখেনি। অতএব ইন্দ্রের জন্ম ব্যাপারটাই সংশয়াচ্ছন্ন এবং তার ফলে ইন্দ্রের অস্তিত্বও সংশয়াতীত নয়। নেম ভার্গব বলে: ইন্দ্র নেই। এই উক্তি খণ্ডন করতে একটি সূক্ত জুড়ে ধ্রুবপদ সৃষ্টি করতে হল, ‘স জনাস ইন্দ্রঃ’। কিন্তু জনমানসে প্রশ্ন এবং নেম ভাগবের ইন্দ্রকে অস্বীকার করা ঘোষণাটি রয়ে গেল। পুরোনো বহু দেবতা, ভগ, পর্জন্য, ইলা, ভারতী, মার্তণ্ড, অর্যমা, দক্ষ, অংশ–এরা ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে গেল, নতুন অনেক দেবতা স্থান পেল দেবমণ্ডলীতে, দেবমণ্ডলীর বিবর্তন ঘটল, তা আর স্থাণু রইল না। তেমনই পূর্বতন বহু যজ্ঞে ফল হচ্ছিল না। দেখে মানুষ সন্দেহ প্রকাশ করেছে, সরে এসেছে, কখনও-বা কোনও সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ে যোগ

দিয়েছে কারণ সমাজের মূল ধর্মধারা তাদের চিহ্নিত করেছে নাস্তিক, বেদবিরোধী বলে। এই বিরোধ প্রকাশিত হয়েছে সন্দেহের বুপে, কখনও-বা আরও গভীর, ব্যাপক বা মৌলিক হলে, নাস্তিক্যের বুপে। এর ফলে চিন্তাশীল মানুষ নতুন করে চিন্তা করেছে, কখনও উত্তর পেয়েছে, তখন সমাজে জ্ঞানের জগতের পরিসর বেড়েছে। রাহুকেতুর গ্রাসে সূর্য-চন্দ্র-গ্রহণ মানুষ ততদিনই বিশ্বাস করেছে। যতদিন তার চেয়ে সংগততর কোনও ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। পাওয়া গেলেই জ্ঞান বেড়েছে, মানুষ পুরাতন কুসংস্কার ত্যাগ করে কার্যকরণ-পরম্পরার সন্ধান পেয়ে জ্ঞানের জগতের দিকচক্রবালকে প্রসারিত করেছে।

দেখা যাচ্ছে, জ্ঞানের বৃদ্ধির জন্যে, ঐতিহ্যবাহিত কুসংস্কারের পরিবর্তে কার্যকরণ-সংবলিত যথার্থ তথ্য জানিবার জন্যে প্রাথমিক প্রয়োজনই হল সন্দেহ, অস্বীকার করা, প্রচলিত ধারণার বিরোধিতা করা, শাস্ত্র-পুরোহিতের দেওয়া ব্যাখ্যাকে পরিহার করা, তাকে ভুল, অযথার্থ বলে ঘোষণা করা। এর পরে যদি কেউ সংগততর, বেশি যুক্তিপূর্ণ কার্যকরণ-পরম্পরায় গ্রথিত কোনও সমাধান পেশ করেন যা সমাজপতিরা তাদের স্বার্থহানি না হলে স্বীকার করে; আর তাদের স্বার্থহানি হলে সরাসরি নাস্তিক, পাষণ্ড, পাপী বলে ব্যাখ্যাত ও প্রশ্নকর্তা দুজনকেই শাপশাপ্ত করে। কিন্তু যখন সমাধান পাওয়া যায়, তখন সমাজ জ্ঞানের জগতে এক ধাপ এগিয়ে যায়। এটা সম্ভবতই হত না যদি না প্রাথমিক স্তরে প্রশ্ন, সন্দেহ বা নাস্তিক্য ঘোষিত হত। যজ্ঞ ও বেদ সম্বন্ধে সংশয় ঘোষিত হতে হতে জৈন, বৌদ্ধ, আজীবিক ও আরও বহু বেদবিরোধী প্রস্থান রচিত হয়েছে, ফলে জীবনজিজ্ঞাসা গভীরতর হয়েছে, দর্শন ও নীতি সমৃদ্ধ হয়েছে। যজ্ঞকে অস্বীকার করে জন্ম নিয়েছে জন্মান্তরবাদ, মোক্ষ ও নির্বাণের কল্পনা, এতে সমাজের অগ্রগতি নিশ্চয়ই হয়নি। বরং ক্ষতিই হয়েছে; কিন্তু পরম্পরাক্রমে লব্ধ বিশ্বাসের ছকটিকে

মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করার এই চেষ্টার (justifying the ways of God to men) মধ্যে নতুন করে চিন্তা করতে হয়েছে মানুষকে, এবং বানপ্রস্থ ও যতি দুটি আশ্রমকে আশ্রমবগের অন্তর্গত করতে হয়েছে, এতে কিছুকালের জন্য অন্তত সামাজিক সংহতি রক্ষিত হয়েছে।

যাস্কের বহু বুৎপত্তি ভুল। কিন্তু শব্দমাত্রেরই যে বুৎপত্তি আছে এই বিশ্বাসই বুৎপত্তিশাস্ত্রের সৃষ্টির মূলে এবং এরই বিশ্বাস এসেছে প্রশ্ন ও সন্দেহের মধ্যে দিয়ে, 'তৎ কাবিশ্বিনৌ?' 'তা হলে অশ্বিনরা কারা?' উত্তরে যা বলা হল, তার সাব-কটি বিকল্পই বুৎপত্তি হিসেবে অগ্রাহ্য। কিন্তু দেবতাদের একটি বাস্তব পটভূমিকা আছে, এ বিশ্বাসের ওপরেই সাব-কটি বিকল্প প্রতিষ্ঠিত, এবং এ উত্তর মিলত না যদি মূলে প্রশ্নটি না থাকত। সমস্ত বেদাঙ্গের সৃষ্টি ওই প্রশ্ন থেকে। (অথর্ববেদে যত উদ্ভিজ্জ ও খনিজ দিয়ে রোগ সারার কথা আছে তার সবই বিজ্ঞানসিদ্ধ নয়, কিন্তু অভিজ্ঞতায় পাওয়া কিছু জ্ঞানের সঙ্গে প্রশ্ন ও সন্দেহ থেকে উৎপন্ন অনুসন্ধিৎসা ওই সব আবিষ্কারের মূলে।) রোগই একটা প্রশ্ন, স্বাস্থ্য স্বাভাবিক, তার থেকে বিচ্যুতিই রোগ; তা কেন হবে এই প্রশ্নই ভেষজশাস্ত্র আবিষ্কারের মূলে। পৃথিবীতে এখনও অনেক জাতি আছে যারা মোটামুটি এক ধরনের চলনসই জীবনযাত্রার উপায় নির্ধারণ করে সেই অনুসারে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে, তার বাইরে তাদের উন্নতি হয়নি, কারণ তার বাইরে তারা প্রশ্নই করেনি।

যে-জাত যত বেশি তীব্র, দুরূহ, গভীর ও ব্যাপক প্রশ্ন করেছে, নিতান্ত হতদরিদ্র না হলে সে-জাত প্রশ্নোত্তরের কার্যকারণ পরম্পরা অবলম্বন করে তত বেশি এগোতে পেরেছে। আপ্তবাক্য মেনে নিয়ে স্তব্ধ নিস্তরঙ্গ সুখের বদ্ধ জলাশয়ে বাস করা যায়। অনেকে তা করেওছে। কিন্তু অন্য বিকল্পটি মানুষের মনুষ্যত্বের মর্যাদার পক্ষে বেশি গৌরবজনক।

পরিশেষে, মনে রাখা প্রয়োজন যে, ভারতীয় আর্যদের প্রথমতম রচনা ঋগ্বেদের প্রথম পর্যায় থেকেই এত সংশয়। একটি সজীব জনগোষ্ঠীই পারে, পদে পদে সংশয় বোধ করতে। এ কথা অনায়াসেই ধরে নেওয়া যায় যে, তদানীন্তন মানুষের মনে যত সন্দেহ এসেছিল তার সবই রক্ষিত হয়নি। হয়তো বহু প্রশ্ন সমাজপতিদের কাছে অত্যন্ত অস্বস্তিজনক ছিল বলে সেগুলিকে লুপ্ত করে দেওয়া হয়েছিল, যে-কারণে চার্যাকের মতবাদ পূর্ণাঙ্গ ভাবে রক্ষিত হয়নি। চার্বাকের প্রভাব যে জনমানসে খুবই বিস্তৃত ছিল তার প্রমাণ, এ মতকে খণ্ডন না করে কোনও দর্শনপ্রস্থান-রচয়িতাই জলগ্রহণ করেননি। তা-ও চার্বকিমতের যেটুকু রক্ষিত হয়েছে তার মধ্যে শাস্ত্রীসুলভ সংহতি নেই, শুধু সেইটুকুই চার্বাকের কৃতি হলে চার্বাকের জনপ্রিয়তা এত বাড়িত না এবং চিন্তাশীল মানুষ তাঁর অনুগামী হতেন না। তেমন মানুষ যে চার্বাকপন্থী হয়েছিলেন তার প্রমাণ হল, এ মতের খণ্ডনে এত গরজ, ঔৎসুক্য ও চিন্তাশ্রম। শুধু নির্বোধিরা চার্বাকপন্থী হলে শাস্ত্রকাররা এত ভয় পেত না। বহু বুদ্ধিমান মানুষ তার মতের অনুসরণ করেছিলেন বলেই তার সম্বন্ধে এত আতঙ্ক। এবং চার্বাকের মত ধর্মের মূল ধরে টান দিয়েছিল, আত্মা পরলোক ঈশ্বর অস্বীকার করে। নাস্তিক্য সন্দেহের চূড়ান্ত অবস্থান। আনুষঙ্গিক বহু সন্দেহ ধীরে ধীরে এসে ঠেকে নাস্তিক্যে। নেম ভার্গবের 'ইন্দ্র নেই' বলা সেকালে নাস্তিক্য। নচিকেতা যখন বলে, 'কেউ কেউ বলে মৃত্যুর পরে কিছুই থাকে না।' তখন সে সমাজে সঞ্চরমাণ নাস্তিক্যকেই প্রকাশ করে।

অত প্রাচীনকালে আত মৌলিক সংশয় ও নাস্তিক্য যো-জাতির মধ্যে উদগত হতে পেরেছিল, সে-জাতি নিঃসংশয়ে একটি অত্যন্ত সজীব, নিয়ত মননশীল জাতি, যারা প্রশ্নসমস্যা-সংকুল চিন্তাজগতে আপস করতে অস্বীকার করেছিল। প্রচলিত মত ও পথে তাদের চিত্ত তৃপ্তি পায়নি, তাদের চাই ভূমা, কারণ তাদের 'নাল্পে সুখমস্তি'। ঐতিহ্যধারায় প্রাপ্ত বিশ্বাস, শাস্ত্র ও আপ্তবাক্যকে আজ থেকে

সওয়া তিন হাজার বছর আগে যে-ভারতীয়রা সন্দেহ করে জীবন সম্বন্ধে নানা মাত্রার, নানা যন্ত্রণাদীর্ণ জিজ্ঞাসাকে এত তীব্র ভাবে উচ্চারণ করতে পেরেছেন, তারা অবশ্যই নমস্য; কারণ তাঁরাই যুক্তিতর্কের সূত্রে নবতর সত্যের পথে এ জাতিকে রওনা করে দিতে পেরেছেন। তাদের সংশয় ও নাস্তিক্য আমাদের গর্বের বস্তু— এক সমৃদ্ধ উত্তরাধিকার। তাই নিয়েই এই লেখা।

_____

(১) 'it is no longer a question of denying a particular person's (or group's) sacrifice, but of

denying the abstract Institution of sacrifice he doctrine of sacrifice is either true or false It is at this point that the classical nastika makes his appearance The utter acerbity of their relations signifies the fact that they are no longer bound together in a complementary pattern. The initial point is, however, the breakthrough out of mutual dependence in the contest for the goods of life Both ritualist and nastika reject karman in the sense of the (sacrificial) 'work of agonistic exchange between two parties. What divides them is the truth or falsehood of the doctrine of individual karman regulated by transcendent Veda injunction… . The ritualist (and his astika progeny) in order to safeguard man's transcendence subjects his freedom to transcendent injunction The nastika, on the other hand, surrenders his transcendence in favour of man's freedom.-J. C. Heesterman, p. 84

(২) 'it (Veda) is invoked against the Internal sectarian disintegration of the tradition, as well as against the 'external' (bahya) and heterodox (nastika) challenges of Buddhism The distinction between 'orthodox' (astika) and 'heterodox' (nastika) systems is among the most basic and familiar traditional Indian doxographies as it is in modern surveys of indian philosophy.'–Halbfass: p 6 and p. 237

(৩) (Greek (ABEOS) atheos originally used in Greece of all those who whether they believed in god or not, disbelieved in the official gods of the state. In Roman empire (the word) was used by pagans to denote Christian agnosticism.'–The Oxford Dictionary of the Christian Church, p. 100)

(8) Macmilian Encyclopaedia af Philosophy Skepticism, Vol Vil, p 499

(৫) The assumption that all or the most significant features of these structures are knowable

and controllable by human effort,... –Guy E Swanson, p 188

(৬) The World which is the same for all, has not been made by any god or man: it has ever been, is now, and ever shall be... 'Orphic Fragments, 334 EBc30, quoted in George Thomson. Vol. II, p. 227

(৭) ‘(the tension) between the divine promise and its ostensible failure to be fulfilled; the other is a tension between God’s will, His providential guidance and human freedom, the refractory nature of man… the double dialectic between design and disorder, providence and freedom.’–Robert Alter, p 141

(৮) If Nature’s providence is all inclusive, then any event which causes injury or suffering has to be integrated as something which, if all the facts were known, would be recognized as beneficial by man, ‘–A.A Long, p 70

(৯) ‘About the gods, I am not able to know whether they exist or do not exist, nor what they like in form, for the factors preventing knowledge are many: the obscurity of the object, at the shortness of human life.’–Protagonus for 4 The Sophist

(১০) After this event the creative period of Brahmanism appears to have come to and end. lines of tcachers are recorded and there was clearly some revision of Vedic texts… but original composition seems to have been confined to the subsidiary studies, actual law, linguistics, astronomy and geometry.–A K. Warder. p 28

(১১) ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তি ইতি আরো ব্রবীমীিতি হোবাচ। যাজ্ঞবল্ক্য। বৃহদ, (২:৪:১২; ৪:৫:১৩)

(১২)'The Upanisads either individually or as a whole do not offer a complete, consistent and logically systematized conception of the world.'–Hajime Nakamura, p. 79

(১৩) '(Thou) has not shown anyone how thy way is to be comprehended. –Ezra (১৪) 'I beseech you, my lord, why have been endowed with the power of understanding.'–Ezra 4:22.

(১৫) 'the lawgivers are not really interested in the actual contents of the Veda What they are interested instead in is the Veda as a political instrument which can be effectively used to keep the people under control with the fear of the other world and gods etc which, because they boldly proclaim as supreme wisdom supposed to be contained in the Veda'—Chatterjee, p. 180

(১৬) ' ... if there is anything in traditional Indian philosophy that has successfully stood the test of advanced scientific knowledge, it is the proposition of the Loka-yatas viz. that consciousness-ordinarily understood as the differential of the spirit or the soul–is only a product of mater.'–Chatterjee, op cit, p 610

(১৭) The fool hath said in his heart, there is no god Psalms' 14.1, 531, etal

(১৮) ‘Authentic religious faith … must always entail doubt…— Macmillan Encyclopaedia of Religion Doubt, p. 425

(১৯) There lives more faith in honest doubt.’–In Memoriam, (Sud rt W)

বেদ রচনার গোড়ার দিক

সাধারণ ভাবে অর্ধশিক্ষিত ও শিক্ষিত ভারতবাসীর মনে একটা বিশ্বাস ব্যাপক ভাবে দীর্ঘকাল ধরেই আছে যে বেদের যুগের মানুষ বেদে বিশ্বাসী ছিল। পরিসংখ্যানগত ভাবে হয়তো কথাটা ঠিকই, অর্থাৎ বেশির ভাগ মানুষ হয়তো বেদে বিশ্বাসী ছিল। এ কথা বললেই যে-দুটি প্রশ্ন আসে তা হল: ১) বেদের যুগ কোনটা? এবং, ২) বিশ্বাস কীসে ছিল? ঐতিহাসিকরা মোটের ওপর খ্রিস্টপূর্ব দ্বাদশ শতক থেকে খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতক পর্যন্ত বৈদিক সাহিত্যের রচনাকালের ব্যাপ্তি ধরেন। এর মধ্যে খ্রিস্টপূর্ব দ্বাদশ শতক থেকে খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতকের মধ্যেই ঋকুসংহিতা/ও যজুঃসংহিতা রচনা সমাপ্ত হয়েছিল। এটা কিছুটা আগেও হয়ে থাকতে পারে, কারণ, বৈদিক আর্যরা এ দেশে আসার সময়ই কিছু পূর্বপরিচিত সূক্ত–কবিতা ও গান সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। সামবেদ কোনও স্বতন্ত্র রচনা নয়, ঋগ্বেদের সূক্তগুলির নানা বিন্যাসে এটি রচিত। অর্থাৎ, যজ্ঞে গান গাইবার জন্যে ঋগ্বেদের কবিতাগুলিকে সুবিধে মতো সাজিয়ে এ বেদটি নির্মিত যাতে, সামবেদের গায়ক উদগীতারা যজ্ঞে গান করতে পারেন। ঋগ্বেদের হোতারা এগুলো যজ্ঞে আবৃত্তিকরতেন। অথর্ববেদের কিছু অংশ ঋগ্বেদেরও পূর্বে রচিত, কিন্তু ধর্মাচরণের সম্ভ্রান্ত ধারার মধ্যে সেগুলির স্থান হয়নি। এর কিছু অংশ ঋগ্বেদ থেকে সরাসরি ধার নেওয়া, সামান্য অদলবদল করে সাজানো।

অন্য কিছু ঋগ্বেদ সামবেদ সংকলিত হওয়ার পরে রচিত। এবং ওই দুটি বেদের সংকলন সমাপ্ত হয়ে যাওয়ায় ওগুলিতে স্থান না হওয়াতে কিছু কিছু রচনা অথর্ববেদে সন্নিবেশিত হয়। যজুর্বেদের মন্ত্রগুলি ঋগ্বেদ রচনার সামান্য কিছু পরে (কিছু-বা অনেকটাই সমকালে) রচিত হতে শুরু করে এবং ঋগ্বেদ সংকলিত হওয়ার অনেক পরে শেষ হয়; এই কারণে ঋগ্বেদ রচনা খ্রিস্টপূর্ব দশম শতক নাগাদ শেষ হলেও যজুর্বেদের রচনা ও অথর্ববেদের রচনা ও সংকলন আরও কিছুকাল ধরে চলতে থাকে। যজুর্বেদ রচনা খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতক নাগাদ শেষ হয়, অথর্ববেদ আরও দু-তিনশো বছর ধরে চলে। যজুর্বেদের মূল ধারা ধরেই ব্রাহ্মণসাহিত্যের সূচনা। ঋগ্বেদে গদ্য একেবারেই নেই, যজুর্বোেদ কোথাও কোথাও গদ্য আছে এবং সেই ধারাতেই। অথর্ববেদেও কিছু গদ্য আছে। আর ব্রাহ্মণসাহিত্য পুরোপুরি গদ্যেই রচিত। তবে এ পর্যন্ত সবই–এবং এর পরেও শ-তিনেক বছর পর্যন্ত–বেদের যে-সাহিত্য রচনা হয় তা সম্পূর্ণ আস্য, অর্থাৎ বৈদিক আর্যরা নিরক্ষার ছিল তাই তারা মুখে মুখে রচনা করত, এবং পুত্র-শিষ্য-পরম্পরা সে-সাহিত্য কণ্ঠস্থ করত। খ্রিস্টপূর্ব দ্বাদশ শতক থেকে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত এই ছশো বছর মুখ্যত বেদ রচনাকাল–বৈদিক যুগ। এর পরে, উপনিষদ। অন্তত মুখ্য উপনিষদগুলি রচনা হওয়ার পরেও বেদের সম্পর্কে অন্য সাহিত্য রচিত হতে থাকে; তার নাম সূত্র বা বেদাঙ্গসাহিত্য: সে-রচনা চলে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ থেকে খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতক পর্যন্ত। এর সঙ্গে পূর্বের বৈদিক সাহিত্যের প্রভেদ হল, আগেরটিকে বলা হয় অপৌরুষের অর্থাৎ এটি কোনও মানুষের রচনা নয়, এ সাহিত্য দৈবশক্তির দ্বারা ঋষিদের কাছে প্রতিভাত। যদিও বেদাঙ্গসাহিত্য রচনার কালে দেশে লিপি ও লেখা এসে গেছে, কিন্তু রচনা দেখে বোঝা যায় যে, বেদাঙ্গও আস্য রচনা। কারণ, এটি নিরতিশয় সংক্ষিপ্ত, সূত্রের আকারেই সমস্তটা রচিত হয়েছিল। অর্থাৎ লেখা তখন মানুষের ঐহিক সাংসারিক নানা প্রয়োজনে ব্যবহৃত হচ্ছে, শাস্ত্র রচনায় বা ধামাচরণে নয়।

বেদের কাল আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চদশ থেকে খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতক হলেও এর তিনটি ভাগ করা যায়: (ক) ঋক, সাম, যজুঃ ও অথর্ব বেদের অধিকাংশ সংহিতার রচনাকাল— খ্রিস্টপূর্ব দ্বাদশ থেকে অষ্টম শতকের শেষ বা সপ্তম শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত; (খ) অথর্ব সংহিতার শেষার্ধ ও ব্রাহ্মণসাহিত্য রচনাকাল (যদিও প্রথমদিকের ব্রাহ্মণগুলির রচনা এর আগেই শুরু হয়ে গেছে), অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম থেকে ষষ্ঠের শেষ ও পঞ্চমের পূর্বার্ধ পর্যন্ত; এবং (গ) বেদাঙ্গী-সাহিত্য রচনাকাল অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ থেকে খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ বা পঞ্চম শতককাল।

বৈদিক আর্যরা যখন ভারতবর্ষে আসে তখন তারা সঙ্গে নিয়ে আসে যাযাবর সময়ের পশুচারিতা, এবং পথে যেখানে যেখানে দু-এক বছর থেমেছিল সেখানে পেয়েছিল কৃষিকাজের অভিজ্ঞতা। এ দেশে এসে তারা সম্মুখীন হল কৃষিজীবী এক সুস্থিত নাগরিক সভ্যতার। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চদশ থেকে দশম শতক পর্যন্ত মুখ্যত কৃষি ও পশুপালনই ছিল তাদের জীবিকা; এর সঙ্গে সঙ্গে ছিল যুদ্ধ, মৃগয়া ও লুণ্ঠন। এখানে আসবার পরে পায়ের তলায় মাটি পেতে কিছু সময় লেগেছিল, কিন্তু তার পর থেকেই মোটামুটি সাব-কটি বৃত্তি অব্যাহত রেখেই বেদের পরবর্তী অংশ অর্থাৎ ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের প্রথমার্ধ এবং দশম মণ্ডল, যজুর্বেদসংহিতা, অথর্ববেদের প্রথম দিকের রচনা এবং একেবারে গোড়ার দিকের ব্রাহ্মণগুলি রচনা চলছিল। এই অধ্যায়টি এইগুলির রচনাকালকে অবলম্বন করেই।

এই সময়ে উৎপাদনব্যবস্থা যা ছিল তা প্রয়োজনের পক্ষে পর্যাপ্ত ছিল না। প্রাগার্যদের কাছ থেকে হরণ করা এবং নিজেরা দখল করে পাওয়া জমি, ফসল গোধন, লুণ্ঠন, মৃগয়া এ সব মিলেও প্রয়োজনের অনুপাতে যথেষ্ট খাদ্যসম্পদ

জুটিত না। নিরন্তর খাদ্যাভাব, অনাহার, ও দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনায় উৎপীড়িত ছিল জনসমাজ। এর ওপরে শীতের দেশ থেকে অপেক্ষাকৃত গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে আসায় নতুন কিছু রোগব্যাধির আক্রমণও ছিল; আর ছিল প্রাগার্যদের দ্বেষহিংসা এবং তাদের সঙ্গে সংঘর্ষ, এবং নিজেদের মধ্যে গোষ্ঠীকলহ। দুর্ভিক্ষ, মহামারি, প্রাগার্যদের কাছে পরাজিত হওয়ার আশঙ্কা ও অভিজ্ঞতা দুটিই বাস্তব ব্যাপার ছিল। অকালমৃত্যু, জরা এগুলোও জীবনযাত্রার অঙ্গ ছিল। খরা বা অজন্মা, প্লাবনের মতো পশুপালে মড়কের ফলে পশুনাশ–এ-ও মাঝে মাঝে ঘটত। বহু দূরদেশে থেকে দু-তিন শতাব্দী ধরে ধাপে ধাপে এখানে-ওখানে থেমে থেমে এ নতুন দেশে এসে, সচ্ছলতা, স্বাচ্ছন্দ্য, নিরাপত্তা, দীর্ঘপরমায়ু–এ সব সুনিশ্চিত করার কোনও উপায় তাদের জানা ছিল না। তাই যজ্ঞ। এবং পৃথিবীর সব প্রাচীন সমাজে কোনও না কোনও না আকারে যজ্ঞ ছিল। আর ছিল জাদুবিদ্যা, প্রাচীন পৃথিবীর সব সমাজেই যা চালু ছিল— যজ্ঞের সঙ্গে এর উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন। প্রভেদ হল, যজ্ঞে দেবতাদের অনুরোধ করা হয় প্রাথীর মনস্কামনা পূরণ করার জন্যে, আর জাদুবিদ্যায় কোনও দেবতাকে না ডেকে সরাসরি কোনও অতিলৌকিক শক্তির দ্বারস্থ হয়ে ওই প্রার্থনাগুলোই পেশ করা হয়। কোনওটাতেই নিশ্চিত ফল মেলে না, তবু মানুষ যেখানে অন্যথা সম্পূর্ণ নিরুপায়, সেখানে ইষ্টসাধনের জন্যে কোনও না কোনও চেষ্টা সে করবেই। বেদের যুগে যজ্ঞ এবং যাদু যুগপৎ চলিত ছিল। জাদুর কোনও সুসংহত শাস্ত্র আমরা পাই না, কেবল ঋগ্বেদে কিছু কিছু সূক্ত এবং অথর্ববেদে বেশ-কিছু সুক্তে এর অস্তিত্বের প্রমাণ মেলে–যদিও অনুষ্ঠানের কোনও নির্দেশিকা পাওয়া যায় না। কিন্তু যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রক্রিয়া মোটামুটি স্পষ্ট ও ব্রাহ্মণ ও সূত্র সাহিত্যে সম্পূর্ণ ভাবে পাওয়া যায়। এ কথাও মনে রাখা দরকার যে, যজ্ঞের মধ্যে বহুলাংশে জাদুবিদ্যা অনুপ্রবিষ্ট ছিল, কারণ যজ্ঞানুষ্ঠান

কেমন করে উদ্দিষ্ট ফল দেবে তা জানা ছিল না বলেই হিংটিংছট' ধরনের কিছু কিছু অংশ যজ্ঞে ইতস্তত চোখে পড়ে।

তা হলে যে-ছবিটা চোখে আসে, তা হল ব্যাপক নিরাপত্তার অভাব–জীবনের সকল ক্ষেত্রেই–এবং এর প্রতিবিধানের জন্যে নানা বিচিত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান। মনে রাখতে হবে পশুচারী জীবনে যজ্ঞ ছিল নেহাতই সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান: দেবতার উদ্দেশে স্তবগান ও আবৃত্তির সঙ্গে পশুহত্যা এবং পরে সেটি রোধে খাওয়া। কৃষিজীবী সুস্থিত জীবনে বীজ বোনা ও ফসল তোলার মধ্যে সময়ের ব্যবধান অনেক বেশি এবং এমন স্থিতিশীল সমাজে সমস্যাও অনেক বেশি। ফলে, একটি ছোট গোষ্ঠীর উদ্ভব হয় যারা সমাজের নানা সমস্যা, অভাব-অভিযোগের প্রতিকারের জন্যে ক্রমাগতই নতুন নতুন যজ্ঞ উদ্ভাবন করবে, নবতর প্রক্রিয়া বানিয়ে তুলবে এবং সমাজের অসহায় মানুষ অনন্যোপায় অবস্থাতে সে সবই মেনে নিয়ে নতুন নতুন অনুষ্ঠান করবে। কাকতালীয়বৎ ফল আসবে কোনও কোনও অনুষ্ঠানে। আবার, সম্ভাব্যতার বিজ্ঞান অনুসারে কোনও কোনওটা নির্ম্মফলও হবে। তবু মানুষ ফিরে ফিরে সেই সব যজ্ঞের অনুষ্ঠানই করবে, কারণ ইষ্টসিদ্ধির জন্যে আর কোনও পথই তার জানা নেই।

এই ছিল বেদের প্রথম পর্যায়ে মানুষের সামাজিক অবস্থান এবং তার মানসিক পরিমণ্ডল। সে চোখ মেলে দেখে সমস্যা-পরিকীর্ণ জীবনযাত্রা; তার থেকে সে সর্বান্তঃকরণে মুক্তি কামনা করে এবং সমাজের বিজ্ঞ বয়স্ক মনস্বীরা যজ্ঞক্রিয়ার মাধ্যমে যে প্রতিবিধান প্রবর্তন করেছেন তা-ই অনুষ্ঠান করে চলে–ফল হোক বা না হোক। ফল না হলে সে নিজেকে, নিজের যজ্ঞক্রিয়াকে দোষ দেবে এবং আবার যজ্ঞ করবে, যেহেতু আর কোনও প্রতিবিধান তার জানা নেই, জাদু ছাড়া। এমন মনে করার যথেষ্ট সংগত কারণ আছে যে যজ্ঞ আর জাদু সমাজের বিভিন্ন স্তরে একই সময়ে অনুষ্ঠিত হত। (যেমন এখনও হয়। শিক্ষিত বাড়িতে বিপদে পুরোহিত ইষ্টদেবতার অথবা নৈমিত্তিক

অনুষ্ঠানের দেবতার পুজো করে, এবং ফল না হলে বা দেরি হলে পরিবারের অন্য স্তরে ওঝা, গুণিন ডেকে ঝাড়ফুক করা হয়। দেবতা মারফত পূজার ইস্ট্রসিদ্ধির প্রয়াস, আর দেবতাকে বাদ দিয়ে অতিলৌকিকের সাহায্যে ওই উদ্দেশ্যই সিদ্ধ করার চেষ্টা–এ দুটিই যুগপৎ আচরিত হয়)। অথর্ববেদের যে সব জাদু-অংশ ঋগ্বেদের পূর্ববর্তী তা সেই সময় অনুষ্ঠিত হচ্ছিল যখন সমাজের বেশি শক্তিমান অংশ যজ্ঞ করছিল; কাজেই কালগত ভাবে এ দুটি সমকালীন ছিল।

এই মানসিক বাতাবরণের মধ্যে সৃষ্ট খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চদশ শতক থেকে খ্রিস্টপূর্ব দশম শতক পর্যন্ত কালে রচিত ঋগ্বেদ সংহিতা। এ সাহিত্যের অধিকাংশটাই যজ্ঞকেন্দ্রিক, যদিও অনুষ্ঠানের কথা এতে সরাসরি তেমন নেই। যেমন আছে দেবতাদের উদ্দেশে স্তব ও গান, যার নাম সূক্ত। এর অধিকাংশেই দেবতাকে বলা হচ্ছে: 'তোমাকে এই দিলাম, তুমি আমাদের এই দাও।' এক কথায়, ঐহিক সুখস্বচ্ছন্দ্য, যেটা প্রকৃতিকে মানুষের স্বার্থের অনুকূলে জয় করার দ্বারা পাওয়া যায়, সেই জয় করার কাজটা দেবতার হাতে দেওয়া হচ্ছে, হব্যের বিনিময়ে। এ সব প্রার্থনাই তখনকার সমাজে জীবনমরণের সমস্যা; প্রাগার্য ঈর্ষার পরিমণ্ডলে টিকে থাকার সমস্যা, প্রকৃতির নানা দুর্যোগ ও বিপর্যয়ের মধ্যে বেঁচে থাকার সমস্যা। এটা মনে রাখলে প্রার্থনাগুলির আকুতি আমাদের কাছে অর্থবহ হয়। নিশ্চয়ই সে-সমাজের অধিকাংশ মানুষ বিশ্বাস করত যে, যজ্ঞে হব্য ও স্তব দিয়ে দেবতাদের যথাবিহিত ভাবে আহ্বান ও মিনতি করলে তারা ইপ্সিত ফল দেবেন। আগন্তুক উৎপাত না ঘটলে যথাকলে ফসল ফলত, অকস্মাৎ রোগব্যাধি না হলে মানুষ দীর্ঘজীবীই হত, শক্তিতে ও অস্ত্রে উৎকর্ষ থাকলে শত্রুজয়ও অবশ্যম্ভাবী ছিল; সেটা যজ্ঞ করলেও হত, না করলেও হত।

যেহেতু প্রতিবার যজ্ঞে প্রার্থিত ফল মেলে না, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও শত্রুর জিঘাংসার বিরুদ্ধে মানুষ স্বভাবতই অসহায়, তাই ফলাফলুক বা না ফলুক দেবতাদের দ্বারস্থ হলে মনে একটা আশ্বাস জন্মায় যে, তার প্রার্থনা পূর্ণ হবে। মানুষের সার্বিক অসহায়তা এমনই ছিল যে, এ ধরনের আশ্বাস মনে মনে নির্মাণ না করলে সে বেঁচে থাকতেই পারত না। তবু মানুষ যে দিন চোখ খুলে বহির্জগৎকে দেখতে শুরু করেছে সে দিন থেকেই সে হিসেব মেলাতে চেষ্টা করেছে: দেবতাকে যথোচিত স্তব ও নৈবেদ্য দিয়েই প্রার্থনা করা সত্ত্বেও কেন সর্বদা ফল পাওয়া যায় না? এ চিন্তা অন্য জীবের নেই, সে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে বিশেষ প্রক্রিয়ায় বিশেষ দেবতার আরাধনা করে না, কাজেই বঞ্চিত বোধ করার কোনও কারণই তার নেই। মানুষের আছে। ফলে ঋগ্বেদের আদিপর্ব থেকে তার হিসেবে গরমিল দেখা দিয়েছে। যখনই দুই আর দুয়ে চার হয়নি, তখনই সে প্রশ্ন করেছে; এ প্রশ্নের উদ্ভব এক ধরনের যন্ত্রণায়, হিসেব না মেলার অর্থ বিশ্বাসের ভিত টলে যাওয়া। হিসটারম্যান যেমন বলেছেন, 'তখন ব্যাপারটা আর একটি বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর যজ্ঞকে অস্বীকার করা নয়, বরং যজ্ঞ নামক নিরবয়ব প্রতিষ্ঠানটিকেই অস্বীকার করা। যজ্ঞতত্ত্ব হয় সত্য নয় মিথ্যা।'১ যত দিন যাচ্ছিল ততই হিসেব না মেলার অভিজ্ঞতা বাড়ছিল, অতএব বাড়ছিল প্রাণপণ শক্তিতে বিশ্বাসের সঙ্গে অভিজ্ঞতাকে মিলিয়ে নেওয়ার চেষ্টা; এবং এখানে যে অবশ্যম্ভাবী ব্যর্থতা তারই অনুপাতে বাড়ছিল সন্দেহ। মানুষ বাকনির্ভর জীব, তাই সে যুগের বহুতর সন্দেহ বেদেই বিধৃত আছে। যজ্ঞের যুগে মানুষ কী বিশ্বাস করত? এর উত্তর কোথাও স্পষ্ট উচ্চারণে পাওয়া যাবে না। কিন্তু ঋগ্বেদ থেকে যা বোঝা যায় তা হল, জনসাধারণ মোটের ওপরে বিশ্বাস করত: ১) দেবতারা আছেন; ২) তারা মানুষের হিতৈষী অর্থাৎ মানুষের কষ্টের প্রতিকার করতে চান; ৩) তাঁরা শক্তিমান অর্থাৎ মানুষের অভীষ্ট পূরণের ক্ষমতা তাঁদের আছে; এবং ৪) যজ্ঞে স্তোত্র ও হাব্য পেলে তাঁরা প্রীত হন ও ভক্তের প্রার্থনা পূরণ করেন। ধীরে ধীরে

আরও একটা বিমূর্ত ব্যাপারে তাদের বিশ্বাস জন্মেছিল: এ বিশ্বচরাচর নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে একটা অমোঘ শুভশক্তির দ্বারা, যাকে তারা পরে 'ধাত' নাম দিয়েছিল। দিনরাত্রির পর্যায়ক্রমে বা ঋতুগুলির নিয়মিত আবর্তন এই ঋতেরই প্রকাশ। চরাচরের অন্তর্নিহিত সত্য হল এই ঋত, যা দেবতাদের দ্বারা লঙ্ঘিত হয় না, যার বিপরীতে অবস্থান অনৃত' বা মিথ্যার। এ সব বিশ্বাস ছিল তাদের পায়ের তলায় মাটি, মাথার ওপরের আকাশ। এগুলো টলে গেলে তাদের ভুবনে দেখা দেয় চূড়ান্ত বিপর্যায়। ধর্ম তাই সংহতি আনে; বাজারের কথায়, '...মানুষের ইতিহাসে ধর্ম হল নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় ও শক্তিশালী প্রাচীরগুলির অন্যতম।'২। এই 'ঋত' বা বিশ্বের অন্তর্গত এক নৈতিক ভিত্তি যার প্রকাশ প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতায় এবং মানুষ সেই ভাবে প্রকৃতির অনুসরণ করে যাতে তার সমাজ চলতে পারে নিয়ম মেনে। ঋতের মতোই এক অদৃশ্য নীতিনিষ্ঠ আবর্তন ও আচরণের অনুসরণে মানবসমাজ নিয়ন্ত্রিত হলেই মানুষের মঙ্গল, এ-ই ছিল উপপাদ্য।

মুশকিল বাধে দু-জায়গায়: প্রথমত, প্রকৃতি বারবার নিজেই নিজের নিয়মকে ভাঙেকখনও কখনও বর্ষাকালে দেখা দেয় খরা, অথবা অতিবৃষ্টি আসে, হঠাৎ ঘটে ভূমিকম্প, পশুপালে মড়ক লাগে, তৃণভূমি শুকিয়ে ওঠে, অথবা ছুটে আসে পঙ্গপাল, দেখতে দেখতে যত্নে লালিত ফসল ধ্বংস হয়ে যায়, বিদেশি শত্রু আক্রমণ করে, মানুষের সমাজে দেখা যায় মহামারি, ঘটে ব্যাপক অকালমৃত্যু। এ সব সময়ে মানুষের বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি টলে যায়। সহসা সে আবিষ্কার করে যে, প্রকৃতি, জীবন, সমাজ যেমন ভাবে চলার কথা, তেমন ভাবে চলছে না। হঠাৎ সে দেখে সংসারে অশুভ, অমঙ্গল, পাপ, অনুত আছে; তার সহজ বোধ বুদ্ধিতে জীবনের ছক যা হওয়া উচিত তেমন হয় না, ধাক্কা লাগে যখন তার সাধারণ বুদ্ধিতে জীবনের জটিলতার কোনও ব্যাখ্যা মেলে না। ক্লিফোর্ড গির্জ তাই বলেন, 'ধর্মকে দেখতে হবে অন্তত সাধারণ বুদ্ধির

ক্ষেত্রে অনুভূত একটা নুযনতার পরিপ্রেক্ষিতে; জীবন সম্পর্কে সামগ্রিক একটা মনোভঙ্গির প্রেক্ষাপটে। সাধারণ বুদ্ধির ওপরে একটা প্রতিঘাতের রূপেও (ধর্মকে) দেখতে হবে।'(৩) বৈদিক আর্যরা জীবন বা সমাজ সম্বন্ধে যে একটি ছক বা নকশা তৈরি করেছিল, তার মধ্যে নিয়মের ভূমিকা ছিল সর্বব্যাপী। সেখানে ব্যত্যয় দেখা গেলে সমস্ত সংহতি টলে যায়। মানুষ সর্বদাই কামনা করে তার ব্যক্তি ও সমাজজীবন চলবে একটা স্বীকৃত, পরিচিত নিয়ম ধরে, যেমন চলে চন্দ্রসূর্য, শীত,গ্রীষ্ম। সাধারণ ভাবে চলেও তাই, কিন্তু মাঝে মাঝে শৃঙ্খলা ভেঙে দেখা দেয় বিশৃঙ্খলা। এই বিশৃঙ্খলা বা সুসংহত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে সব শক্তি দেখা দিত, তার নানা রূপ: ভিন্ন গোষ্ঠীর বা আগন্তুক গোষ্ঠীর শত্রু, যার হাতে পরাজয় এমনই এক অবাঞ্ছিত অপ্রত্যাশিত অভিজ্ঞতা; আর ছিল প্রাকৃতিক বিপর্যয় বন্যা, খরা, ভূমিকম্প, অজন্ম এবং মহামারি–মানুষ ও পশুর। এ সবের মধ্যে মানুষ দেখতে পেত। তার জীবনে ও সমাজে হিসেবের বাইরে এক অশুভ শক্তির অনুপ্রবেশ। আকাঙ্ক্ষিত শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবার জন্যে সে মনে মনে কল্পনা করল দেবতার। নিজেরই শক্তিমত্তার এক প্রতিরূপ হিসেবে। যাযাবর অবুস্থ থেকে আর্যরা প্রাগার্য রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে এসে দেবতাদের দেখল রাষ্ট্রশক্তি, বিশেষত সে-শক্তির নিয়ন্তার প্রতিভূ রূপে। আর্থার উলফের কথায়, 'দেবতারা রাষ্ট্রের শক্তির রূপক, এ রূপক হল, রাষ্ট্র পরিচালক ও ন্যায়াধীশের।(৪)

মানুষ কোন নিরিখে তার দেবতাকে নির্মাণ করেছিল? বুদ্ধিমান, শক্তিধর, সক্রিয়, সাহায্যপরায়ণ। এমন একটিই জীব তার জানা ছিল: মানুষ। কাজেই মানুষ নিজের রূপেই অধিকাংশ, দেবতাকে কল্পনা করেছিল; অবশ্য কিছু কিছু উপকারী এবং/বা ক্ষমতাশালী নিসর্গবস্তুকেও সম্ভ্রমে বা আতঙ্কে সে দেবায়িত করেছিল। যেমন সূর্য, চন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, পর্জন্য, ইত্যাদি। কিন্তু অধিকাংশ দেবতাতেই সে নিজের আকৃতি ও প্রকৃতি আরোপ করে নির্মাণ করল। প্রতীচ্যে এ নিয়ে পরিহাসবিজঙ্গনা আছে, ঈশ্বর মানুষকে নির্মাণ করলেন নিজের

প্রতিরূপ হিসেবে। কিন্তু মানুষও তো ভদ্রলোক, তাই সে ঈশ্বরকে নির্মাণ করল। নিজের প্রতিরূপে।' এর মধ্যে একটি সত্যও নিহিত আছে।

খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দেই এই দেবনির্মাণকার্য অনেকটাই সম্পূর্ণ হয়েছিল; তবে খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চদশ শতকে আনাতোলিয়ার বোঘাজ-কে-ঈ শিলালিপিতে ইন্দ্র, বরুণ, নামত্য, ইত্যাদি কয়েকজন বৈদিক দেবতার নাম পাওয়া যায়। বৈদিক যজ্ঞে দেবতাদের বিগ্রহ থাকত না, তবু খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে যাস্ক তাঁর নিরুক্ত গ্রন্থে প্রশ্নটা তুলেছেন। দৈবতকাণ্ডে আগে বললেন, দেবমণ্ডলীর অবস্থান নররাষ্ট্রের মতো।–তত্রৈত স্নররাষ্ট্রমিব।' (৭:৫:১৯) অর্থাৎ দেবতারাও একটি সংহত সমাজে বাস করেন যার গঠন মানুষের রাষ্ট্রেরই মতো। পরে প্রশ্ন তুললেন, দেবতাদের আকার বিষয়ে–'অথাকার চিন্তানং দেবতানাম।' (৭:৬:১)। এর উত্তর দিতে গিয়ে প্রথমে বললেন, 'কেউ কেউ বলে পুরুষের মতোই হবে–পুরুষবিধাঃ সুরিত্যেকম ''(৭:৬:১) কিন্তু বায়ু, চন্দ্র, সূর্য, অগ্নি এগুলি স্পষ্টতই পুরুষাকৃতি নয়। তা হলে? তা হলে স্বীকার করে নেওয়া ভাল যে, কেউ কেউ বলে 'পুরুষবৎ নয়–অপুরুষবিধাঃ সুরিত্যেকম।' (৭:৭:১) দুরকম মতের সমাহারে সিদ্ধান্ত করলেন, অথবা উভয়বিষয়ই হবে–অপি বোভয়বিধাঃ সুঃ।।' (৭:৭:৭) অর্থাৎ অগ্নি, সূর্য, চন্দ্র তো প্রত্যক্ষ ভাবেই মনুষ্যরূপী নয়, এদের আকৃতি মানুষ নির্মাণ করতে পারেনি, এরা যে-রূপে দৃশ্যমান সেই রূপেই পূজ্য। কিন্তু বিভিন্ন প্রয়োজনে যে সব শক্তিধর সহায়ক ও আশ্রয়ারূপী দেবতা মানুষ নির্মাণ করেছে, তাদের তো স্বাভাবিক ভাবেই মনুষ্যরূপে কল্পনা করেছে। তাদের কান থাকা চাই ভক্তের প্রার্থনা শোনার জন্যে; মন, সহানুভূতি, দয়া, হিতৈষী থাকা চাই মানুষের মতো; ক্ষমতা থাকা চাই মানুষের প্রার্থনা পূরণ করার। আর চাই বস্ত্রীলংকার, মানুষের মতো সজা এবং বাহুতে বল, অস্ত্রশস্ত্র, রথীবাহন, যাতে দ্রুত এসে মানুষের সংকট মোচন করতে পারেন। মানুষের বিপদে দুর্যোগে যাতে দেবতারা অনুকুল হয়ে তাদের

পরিত্রাণ করেন ও প্রার্থিত বস্তু জোগান সেই জন্যে মানুষও দেবতাকে তার প্রতি সদয় করে তোলবার জন্যে নিজের সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য নৈবেদ্য হিসেবে দিত এবং দেবতার শক্তি, মানবহিতৈষার নানা স্তব আবৃত্তি করে ও গান গেয়ে শোনোত, যাতে দেবতারা তাদের প্রতি অনুকুল হয়ে তাদের ইষ্টসিদ্ধি করেন। এই ভাবে নানা বিপদসংকুল পরিবেশে দেবতাদের সঙ্গে একটা পারস্পরিক আদানপ্রদানের সম্পর্ক কল্পনা করে নিয়ে মনে মনে বিপদ থেকে ত্রাণের বন্দোবস্ত করে নিয়েছিল। এর জন্যে বিগ্রহধারী দেবতা অত্যাবশ্যক ছিল না, কল্পনায় দেবশক্তিকে সহায়ারূপে পাওয়াই ছিল প্রয়োজন–'লোকায়ত ধর্মে চূড়ান্ত ভাবে প্রয়োজনীয় ছিল কোনও দেব বা দেবীকে অব্যবহিতরূপে কাছে পাওয়া. সে বিগ্রহধারীই হোক অথবা বিমূর্তই হোক। '(৫)

দেবতাকে কাছে পাওয়া বা তার কাছে নিজেদের বিপদের সংবাদ ও ত্রাণের আকাঙ্ক্ষার প্রতিবেদন পৌঁছে দেওয়ার আকুতি থেকেই ধীরে ধীরে বিধিবদ্ধ ধর্ম গড়ে উঠেছিল। এর অবশ্যই নানা স্তর ছিল: অত্যন্ত সরল সংক্ষিপ্ত প্রাথমিক স্তর থেকে প্রার্থনার চরিত্র পবিবর্তিত হতে হতে ধর্মানুষ্ঠান ক্রমে বিচিত্রতর হয়ে উঠছিল, দেবতারাও সংখ্যায় বাড়ছিলেন চক্রবৃদ্ধিহারে, বাড়ছিল পুরোহিতের সংখ্যা, যজ্ঞের সংখ্যা এবং সার্বিক জটিলতা। বহু প্রাচীন দেবতা পরিত্যক্ত হচ্ছিলেন, কারও বা চরিত্র পরিবর্তন ঘটছিল, এবং ধীরে ধীরে বহু নতুন দেবতা দেবমণ্ডলীতে স্থান পাচ্ছিলেন। শেষ দিকে দেবতারা সংখ্যায় এত বেশি হলেন যে, মাঝে মাঝেই তাদের নাম ধরে না ডেকে এক সঙ্গে বিশ্বে দেবাঃ' বলে সম্বোধন করা হচ্ছিল। জীবনে হার মানতে হচ্ছিল। আগন্তুক নানা প্রাকৃতিক বিপদ-আপদের কাছে, রোগব্যাধি ক্ষয়ক্ষতির দ্বারা বিপর্যস্ত হতে হচ্ছিল, ফলে নতুন নতুন বিপদে পরিত্রাণের জন্যে নতুন নতুন দেবতা উদ্ভাবন করা হচ্ছিল।

দেবমণ্ডলীর অনেকেই আর্যদের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিলেন, অনেকেই সপ্তসিন্ধু অঞ্চলে এবং পরে ব্রহ্মাবর্তে।(৬) আরও কিছু এসেছিল প্রথমে মধ্যপ্রাচ্যে ভ্রমণকালে এবং পরে এখানকার প্রাগার্য নানা নৃগোষ্ঠীর সংস্রবে এসে; তাদের দেবমণ্ডলী থেকে আত্মসাৎ-করা নতুন কিছু দেবদেবীর অনুপ্রবেশ ঘটে আর্য দেবমণ্ডলীতে। মনে রাখতে হবে, এ দেশে আসবার সময়ে আর্যরা একটি সংহত গোষ্ঠী ছিল না, এবং এখানেও কোনও সংহত প্রাগার্য প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীর সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ ঘটেনি। 'পশ্চিম এশিয়ার মতো আগন্তুক আর্যরা পরাক্রান্ত শত্রু অথবা বৃহৎ সাম্রাজ্যের সম্মুখীন হয়নি, হলে তারা সংহত হয়ে উঠে অনেক শক্তিশালী একটি নিজস্ব সুসংহত রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তুলতে বাধ্য হত।' তা যখন হয়নি তখন ছোট ছোট গোষ্ঠীর আর্যদের সংঘর্ষ ঘটতে লাগল অনুরূপ প্রাগার্য গোষ্ঠীর সঙ্গে। জয়-পরাজয়ের পরে অধিকাংশ প্রাগার্য গোষ্ঠী সন্ধি করল আর্য গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে এবং তাদের সঙ্গে মিশে গেল। এই সন্ধির অনিবার্য শর্ত এবং ফল ছিল দু-পক্ষের ধনসম্পত্তি, জমি, ফসল, পশুপাল ও অন্যান্য স্থাবর জঙ্গম সম্পত্তির আদানপ্রদান এবং অন্তর্বিবাহ; এর ফলে একটি মিশ্র নৃগোষ্ঠী গড়ে উঠল, আর্য-প্রাগার্যদের সমাহারে। এরই সূত্র ধরে আদানপ্রদান ঘটে উপাস্য দেবতা ও উপাসনা-পদ্ধতির। এই ভাবেই আর্য দেবমণ্ডলীতে ক্রমে ক্রমে বহু প্রাগার্য দেবদেবীর অনুপ্রবেশ ঘটল। সমান্তরাল প্রক্রিয়ায় পূর্বতন দেবমণ্ডলীর বেশ-কিছু আর্য দেবতা ধীরে ধীরে পরিত্যক্ত হচ্ছিল। এর মধ্যে, বিশেষত ছিলেন সেই দেবতারা যাদের বিশিষ্ট সংজ্ঞা, ভূমিকা বা তাৎপর্যের স্মৃতি তত দিনে ধূসর হয়ে এসেছে–যেমন ভগ, অংশ, দক্ষ, তার্যমন, এবং আগ্রীসূক্তগুলিতে উল্লিখিত অগ্নিবাচক এবং বিস্মৃত তাৎপর্যের অন্য দেবতারা, দ্বারো দেব্যঃ ঊষাসনাক্তা', ইত্যাদি। দেবমণ্ডলীতে দীর্ঘকাল ধরে অব্যাহত একটি প্রক্রিয়ায় এদের বিবর্তন ঘটছিল: পূর্বের কিছু দেবতাকে বর্জন, কিছু দেবতার তাৎপর্যে

পরিবর্তন এবং নতুন কিছু দেবতার আবির্ভাব। এই শেষোক্তরা বেশির ভাগই আসছিল প্রাগার্য গোষ্ঠীর উপাসিত দেবমণ্ডলী থেকে।

মানুষের সমাজে ও দেবতাদের সমাজে যখন এই সংমিশ্রণ ঘটে তখন সে সময়ের মানুষের প্রত্যয়ের জগতে যা কিছু ধ্রুব অবলম্বন ছিল, সেগুলি হল দেবতাদের অস্তিত্ব, তাদের সর্বশক্তিমত্তা ও মানবহিতৈষা। আর বিশ্বাস ছিল, বিজেতা গোষ্ঠীর বাহুবল ও অস্ত্রবলের উৎকর্ষে; অতএব বিজিতের ন্যূনতায়। এরই ফলে একটি নৈতিক মানদণ্ড তৈরি হল: প্রাগার্যের সম্পত্তিতে আর্যের ন্যায়সংগত অধিকার। লুণ্ঠন অব্যাহত ভাবে চলেছিলবহু সুক্তে দেবতাদের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে, প্রাগার্য সম্পত্তি লুঠ করে এনে আর্যদের দেওয়ার জন্যে। অবশ্যই লুঠ একতরফা ছিল না, প্রাগার্যরাও আর্যদের সম্পত্তি লুঠ করত। ফলে আর্যরা তাদের 'রাক্ষস' (কথাটার আদি অর্থ ছিল, যাদের থেকে রক্ষা করতে হয়–যেভ্যো রক্ষ্যতে') বলত। এ ছাড়া আর্যদের কোনও কোনও গোষ্ঠীর মধ্যে শত্রুতা ছিল, সেখানেও পরস্পরের সম্পত্তি লুঠতরাজ করা চলত। অনুপ্রবেশকারী আর্যদের অধিকার বাহুবল ও অস্ত্রবলের জোরে, প্রাগার্যদের জোর ছিল আদিম স্বত্ববোধে; কাজেই সংঘর্ষ কতকটা অনিবার্যই ছিল।

এ সব ও অন্যান্য নানা জাতের অশুভ, ক্ষতিকর অভিজ্ঞতা মাঝে মাঝে তাদের বিশ্বাসের ভূমিতে আলোড়নজাগাত: দেবতারা মানবহিতৈষী, সর্বশক্তিমান তবু এত অমঙ্গল, প্রাকৃতিক বিপর্যায়, শত্রুর হানা, রোগব্যাধি, লুঠতরাজ কেন হয়? অশুভ বা মন্দকে তারা বলত পাপ, কিল্বিষ, কলুষ, পাম্মন, ইত্যাদি। মঙ্গলময় দেবতাদের সঙ্গে একই বিশ্বে এত অমঙ্গল কেমন করে থাকতে পারে? অথর্ববেদের একটি প্রার্থনা, সারা পৃথিবীর সর্বকালের একটি প্রার্থনা হল: যদিহ ঘোরং যদিহ ক্রুরং যদিহ পাপং তচ্ছন্তিং তাচ্ছিবম।

সর্বমেব শমস্তেনঃ।–এখানে (পৃথিবীতে) যা কিছু ঘোর, যা কিছু নিষ্ঠুর, যা কিছু পাপ, তা শান্ত হোক, মঙ্গলে পরিণত হোক, এখানে সব কিছু শান্তিপূর্ণ হোক।' (১৯:৯:১৪) এই প্রার্থনা কখনও কোথাও পূর্ণ হয়নি, তবু সর্বত্রই উপলব্ধ ও উচ্চারিত হয়েছে। ম্যাকক্লাস্কি দেখাচ্ছেন, 'সহজতম আকারে সমস্যাটি হল এই: ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। ঈশ্বর সর্বমঙ্গলময়, তবুও মন্দ আছে... এগুলির যে-কোনও দুটো যদি সত্যি হত, তা হলে তৃতীয়টি মিথ্যা হত।'(৮) এই মতের স্বাভাবিক যুক্তিগত সিদ্ধান্তটি উমা গুপ্ত-র কথা থেকে নেওয়া যেতে পারে: মন্দের উপস্থিতি থেকে আমাদের সিদ্ধান্ত করতেই হয় যে, কোনও সর্বশক্তিমান মঙ্গলময় ঈশ্বর থাকা অসম্ভব।(৯)

ফলে নানা সংশয় দেখা দিল, অভ্যস্ত প্রত্যয়ের পুনর্বিবেচনা শুরু হল, কারণ সেন্ট অগাস্টিন যেমন বলেছেন, মানুষ তা-ই বিশ্বাস করে যা বিশ্বসনীয়' (Nulus quippe credit, nisi prius cogitaverit esse credemdum)। স্পষ্টতই বিশ্বসনীয়তার সংজ্ঞার মধ্যে এসে গেছে যুক্তি, তাই সর্বশক্তিমান, সর্বমঙ্গলময়ের বিধানে মন্দের, অশুভের অবস্থান যুক্তি দিয়েই অবিশ্বনীয়। অতএব মানুষ অবিশ্বসনীয়কে বিশ্বাস করতে দ্বিধাবোধ করল। যদি কোনও সর্বশক্তিমান মঙ্গলময় ঈশ্বর বা দেবকুল না থাকেন তো মানুষের নিজের আচরণ নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারেও দোলাচলত আসে; কোন নীতিতে চলা উচিত, সে নিয়েও মনে প্রশ্ন আসে। আর্যদের দীর্ঘ যাত্রাপথে এ ধরনের মন্দের অভিঘাত বেশ দীর্ঘকাল ধরেই তাদের বিশ্বাসকে ধাক্কা দিচ্ছিল। ক্লিফোর্ড গির্জের ভাষায়, বিপর্যস্ত হওয়া, দুঃখ এবং নৈতিক দ্বিধার অজ্ঞেয়তার বোধ... যদি সেগুলি যথেষ্ট তীব্র হয় অথবা দীর্ঘকাল ধরে সেগুলিকে বহন করতে হয় তা হলে জীবন যে বোধগম্য বা আমরা চিন্তা করে জীবনের ছকে নিজেদের সার্থক ভাবে মানিয়ে নিতে পারি। এই ধারণার মূলই প্রত্যাহত হয়।'(১০) অর্থাৎ মঙ্গলময়, সর্বশক্তিমান দেবতাদের কর্তৃত্বের

অধীনে বাস করার ভরসাটা টলে গেলেই আসে সংশয়। মানুষ সর্বদাই চেয়েছে নির্ভরযোগ্য একটি বিশ্বপরিকল্পের মধ্যে বাস করতে, কারণ সেখানেই তার ধ্রুব আশ্রয়, নির্ভয়, নিশ্চিন্ত অবস্থান।

অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, প্রথম যুগে দেবতাদের মধ্যে ক্ষমতার কোনও আনুপাতিক স্তরবিন্যাস ছিল না, এমনকী বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও কোনও ধ্রুব অপরিবর্তনীয় ভিত্তি ছিল না। প্রথমত, আর্যরা দীর্ঘকাল ধরে ধাপে ধাপে নানা দেশ পেরিয়ে এসেছে, এসেছে অন্যান্য বহু ধর্মবিশ্বাসীর দেশ পেরিয়ে, সেখানে অনিবার্য ভাবেই তাদের নিজেদের বিশ্বাসও বিবর্তিত এবং পরিবর্তিত হয়েছে। কাজেই প্রাচীন গ্রিসের মতো এখানেও কোনও অনড় অবশ্যস্বীকার্য বা সর্বস্বীকৃত বিশ্বাসের ভিত্তি তাদের থাকা সম্ভব ছিল না। প্যাট্রিক দেখাচ্ছেন, 'কোনও ধ্রুব বিশ্বাসের কাঠামো ছিল না, যাতে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হতে পারে; আর তার চেয়েও যা বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় তা হল (দেবতাদের) কোনও উচ্চ-নীচ ক্রম ছিল না। ধর্মছিল উপাসনানির্ভর। এবং পুরোহিতদের ভূমিকা তাঁদের ক্ষমতার চেয়ে সম্মানই বেশি দিয়েছিল।'(১১) উপাসনানির্ভর ধর্মের ভিত্তি হল উপাস্যদের সম্বন্ধে আস্থা। কী সেই আস্থা? যেমন আগেও বলেছি, তারা আছেন, তারা সর্বশক্তিমান, মঙ্গলময়, মানবহিতৈষী এবং উপাসনা যদি যথাযথ রীতিতে নিষ্পন্ন হয় তা হলে তারা প্রার্থীর অভিষ্ট সিদ্ধ করেন।

---

(১) 'it is no longer a question of denying a particular person's (or group's) sacrifice, but of denying the abstract institution of sacrifice. The doctrine of sactifice is either true of false –J C Heesterman. On th origin etc. S.

(২) '...religion has been one of the most effective bulwarks against anomy throughout human history.'–Peter Berger, p. 87

(৩) Religion must be viewed against the background of the Insufficiency, or anyway the felt insufficiency, of common sense, as a total orientation toward life and it mut also be viewed in terms of formative impact upon common sense – Clifford Geertz, p. 96

(৪) '...gods are a metaphor for the system of authority, the state. The metaphor in one of rulers and Judges...'–Arthur Wolf, p 19

(৫) '... a crucial ingradient in folk religion is the immediate presence of and access to a god or a goddess...which may be iconic or aniconic –(i.D. Sontheimar & Herman Kulke (ed), p. 4

(৬) সরস্বতী দৃষদ্বত্যোর্দেবিনদ্যোর্যর্দস্তরম। তং দেবনির্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্তং প্রচক্ষতে। মনুসংহিতা; (২:১৭)

(৭) Unlike in Western Asia the immigrating Aryans did not encounter nighty enemies and big empires which would have forced them to unite and to establish a more effective political organization of their own.' –Herman Kulke & Dietmar Rothermund, p. 45

(৮) In its simplest form the problem in this God is omnipotent, God is wholly good; and yet evil exists… if any two of them were true, the third would be false.'–H J M McClosky, p. 46, God and Evil, ed. Nelson

(৯) 'We must conclude from the existence of evil that there cannot be an omnipotent, benevolent

God.'–Uma Gupta, p. 84

(১০) 'Baflement, suffering and a sense of Intractable ethical paradox are… if they are intense enough or are sustained long enough radical challenge to the proposition that life is comprehensible and that we can by taking thought orient oursclves effectively within it.'–Clifford Geertz p 00

(১১) There were no dogmas to confuse the mind, and what was still more remarkable, there was no hierarchy. The religion was one of worship and the position of the press conferred more honour than power. –M M Patrick, p. 4

সংশয়ের বীজ

খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চদশ থেকে একাদশ-দশম শতক পর্যন্ত যে-কালপর্যায়ের মধ্যে ঋগ্বেদের রচনাকাল সম্পূর্ণ হয়েছিল বলে মনে করা হয় সে সময় বৈদিক

আর্যদের বিশ্বাসের ছকটা আসলে কী ছিল, ঋগ্বেদের পাঠ ছাড়া তা জানিবার আর কোনও উপায় নেই। আর কোনও প্রমাণ বা দলিল তো পাওয়াই যায় না। অতএব ঋগ্বেদে যা পাওয়া যাচ্ছে তাই আমাদের বৈদিক আর্যদের ওই কালপর্বের বিশ্বাসের তথ্য বলে মেনে নিতে হবে। এই ঋগ্বেদ সংহিতার অধিকাংশই, অর্থাৎ প্রায় শতকরা পচাত্তর ভাগ সূক্তেই দেবতার সঙ্গে মানুষের আদানপ্রদানের কথা আছে, অর্থাৎ 'হে দেব, তোমাকে আমরা এই স্তোত্র, এই হাব্য নিবেদন করছি, এটা গ্রহণ করে প্রীত হয়ে তুমি আমাদের প্রার্থিত বস্তু দান করো।' এই ধরনের প্রার্থনার অন্তরালে কিন্তু ওই সব বিশ্বাসই বর্তমান, অর্থাৎ দেবতা আছেন, প্রার্থনা শুনতে পান, স্তোত্র, নৈবেদ্য ও যথাযথ যজ্ঞানুষ্ঠানে তিনি প্রীত হন, প্রার্থী যা চাইছে তা দেওয়ার ক্ষমতা তাঁর আছে এবং ইচ্ছাও আছে। সর্বশক্তিমান, মানবহিতৈষী দেবতারা আছেন এবং তারা যজ্ঞকারীর নিবেদন শুনে তাকে তৃপ্ত করবেন। এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে ঋগ্বেদের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক সূক্ত দাঁড়িয়ে আছে। এর থেকে সিদ্ধান্ত করা সম্ভব যে, তখন অধিকাংশ মানুষ বিশ্বাসী ছিল। এ সিদ্ধান্তে কিছু ফাক আছে, কারণ তখনকার যা প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি তাতে ওই বিশ্বাস না থাকলেও তাদের যজ্ঞ করা ছাড়া ইষ্টসিদ্ধির কোনও পথই জানা ছিল না। কাজেই যজ্ঞে প্রার্থিত বস্তু পাওয়া না গেলেও যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হত, স্তব ও প্রার্থনার সূক্ত রচিত হত, যজ্ঞে সেগুলি আবৃত্তি ও গান করাও হত। এবং এর নেপথ্যে কিছুমানুষের সংশয়ও জন্মাচ্ছিল, কোথাও কোথাও তা বাড়ছিলও, কিছু সূক্তে তা প্রকাশও পাচ্ছিল। আমাদের বর্তমান এই রচনাটির ভিত্তি এই সূক্তগুলি।

প্রথমেই প্রশ্ন ওঠে, এ সব সংশয় কদের মনে উঠেছিল? প্রশ্নকর্তারা কোনও বিশেষ একটি অংশের মানুষ নন, বরং এরা তৎকালীন সমাজের বৃহৎ একটি বৃত্তাংশে ছড়িয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে আছেন ব্রহ্মচর্যের শেষে সমাবর্তনের পরে গৃহে প্রত্যাবৃত ছাত্র, ব্রহ্মচারী; আছেন রাজা, ঋষি, ভ্রাম্যমাণ নানা মতের

প্রবক্তা ও গুরু; সাধারণ ক্ষত্রিয়, তরুণ বালক, প্রখ্যাত আচার্য ও আরও অনেকে; অর্থাৎ মোটামুটি ভাবে সমাজের প্রতিনিধিস্থানীয় বহু মানুষ। এখন একটি সঙ্গত প্রশ্ন আপনিই আসবে; যে-সমাজে দেবতাদের ওপরে বিশ্বাসের ভিত্তিতেই তখনকার একমাত্র ধর্মানুষ্ঠান—যজ্ঞ—আচরিত হত, সে-সমাজের সাহিত্যে সেই দেবতাদের অস্তিত্ব, সর্বজ্ঞাত্ব, মঙ্গলময়ত্ব, সর্বশক্তিমত্তা ও মানবহিতৈষী এবং যজ্ঞের প্রণালী ও তার উপযোগিতা নিয়ে যদিও বা কারও কারও মনে প্রশ্ন উঠে থাকে, তবু সে সব প্রশ্ন ধর্মগ্রন্থে সংরক্ষিত হল কেন? এ সব প্রশ্ন তো সমকালীন ধর্মাচরণের মূলে আঘাত করছে, এগুলো তো অগ্রাহ্য করে বিলোপ করাই হত সমাজস্বার্থের অনুকুল।

এ প্রশ্নের কোনও সদুত্তর বেদ থেকে পাওয়া যায় না, অতএব আমাদের নির্ভর করতে হবে যুক্তিযুক্ত অনুমানের ওপরে। দুটি সম্ভাব্য অনুমান করা যায়: প্রথমত, সংশয়-সূচক ঋক বা সূক্ত বা অংশগুলির রচয়িতা বলে যাঁদের নাম পাচ্ছি, তাঁদের বাইরেও সমাজের বৃহৎ একটি অংশের মধ্যেও এ-জাতীয় সংশয় পরিব্যাপ্ত ছিল। এদের সংখ্যাটা উপেক্ষনীয় নয় বলেই এ সব সংশয়কে তৎকালীন ঋষিমণ্ডলী গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন মনে করেছিলেন। দ্বিতীয়ত, যাঁদের নামে সংশয়সূচক অংশগুলি শাস্ত্রে বিধৃত হয়ে আছে তারা তখনকার সমাজে এতটাই সম্মান ও শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন যে, তাদের রচনা, তাদের সংশয় ও প্রশ্ন অগ্রাহ্য করা সম্ভব ছিল না। তা ছাড়া তখনকার শাস্ত্রে অর্থাৎ ঋগ্বেদ থেকে উপনিষদ পর্যন্ত সাহিত্যে এমন অনেক কথা সংরক্ষিত আছে যা আপাতদৃষ্টিতে তাদের তাৎক্ষণিক স্বার্থের প্রতিকুল, তবুও এগুলি রক্ষিত হয়েছে। এর মধ্যে এক ধরনের মৌলিক সত্যনিষ্ঠার প্রমাণ আছে: মানুষের বিশ্বাসের ভিত্তিতে রচিত এত স্তব যদি স্মৃতিতে ধারণ করে রাখা, তাহলে সেই সময়েরই মানুষের সংশয়ের প্রকাশই বা কেন থাকবে না? ঠিক এই কারণেই দ্বেষ, হিংসা, শত্রুতা, স্বার্থপরতা, অন্যের ক্ষতি, সম্পত্তিনাশ,

এমনকী মৃত্যু ঘটানোর প্রচেষ্টা এবং দেবতাদের মধ্যেও স্বার্থের সংঘাতের বহু প্রমাণ বেদে রয়ে গেছে। ঋগ্বেদ থেকে উপনিষদে এই সংরক্ষণ প্রাচীন মনস্বীদের উদারতার একটি নজির, এবং এর উত্তরাধিকারীদের, অর্থাৎ আমাদের একটা গর্বের বস্তু।

সংশয়ের আলোচনা করার আগে দেখা দরকার কীসে তাদের সংশয় ছিল না। প্রকৃতির সুনিয়ন্ত্রিত আচরণে–দিনরাত্রি ও ঋতুর নিয়মিত আবর্তনে— একটা দৃঢ় প্রত্যয় ছিল। তার চিহ্ন এ সাহিত্যে প্রায় সর্বত্র। প্রকৃতির ব্যতিক্রমী আচরণ যেমন খরা, বন্যা, ভূমিকম্প, পঙ্গপাল নিয়ে তাদের স্বভাবতই ক্ষুব্ধ বিস্ময় ছিল; কিন্তু সেটার কারণ তারা ধরে নিয়েছিল যে, প্রকৃতি নিয়ম মেনে চলে। সে-নিয়ম, প্রকৃতিতে ও সমাজে, ঋত; বরুণ ঋতের অধিদেবতা এ কথাও যেমন শুনি, তেমনই ঋত একটি স্বয়ংক্রিয় শক্তি এ বিশ্বাসও তাদের ছিল। এ ছাড়া সমাজে উচ্চ-নীচ ভেদেও তাদের বিশ্বাস ছিল। ঋগ্বেদেই বর্ণভেদ দেখা দেয় এবং তখন থেকে উচ্চতার মানদণ্ডে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়,বৈশ্য–ত্রিবর্ণের পুরুষের স্থান ওপরে; প্রাগার্য, ম্লেচ্ছ, চণ্ডাল, শূদ্র, দাস এবং নারী নীচে। আর্য শ্রেষ্ঠ জাতের মানুষ, বাকিরা অপকৃষ্ট; তাদের চেহারা খারাপ, তারা আচরণহীন, শিশ্নোদর নিয়েই থাকে; আর্য উপাসনা-পদ্ধতিতে তাদের বিশ্বাস নেই। আর্যের উপাসনা-পদ্ধতিই উৎকৃষ্ট। কীকটের (বঙ্গদেশ) লোকেরা যজ্ঞ করে না, ওরা গাভি নিয়ে কী করবে? কাজেই, হে দেবতা, ওদের গাভিগুলো আমাদের এনে দাও।' এ কথার ভিত্তি ওই আর্য শ্রেষ্ঠত্ব। এবং ওই নীতিতেই আর্যেতর মানুষের সম্পত্তিতে আর্যের অধিকার আছে, এও তাদের বিশ্বাসের একটা অঙ্গ। রুদ্র, তুমি আমাদের সন্তান ও পশুপালের ওপরে তোমার অস্ত্র নিক্ষেপ কোরো না; তুমি আমাদের শত্রুদের সন্তান, সম্পত্তি ধ্বংস করে দাও।' দেবতাদের দিয়ে শত্রুনাশ ও শত্রুর সম্পত্তি লুণ্ঠনের জন্যে প্রার্থনার পাশাপাশি ঘটনা হল যে আর্যরা নিজেরাও প্রয়োজন মতো সে-কাজ

করত। কাজেই সমাজে বর্ণগত ও লিঙ্গগত উচ্চাবচতায় সাধারণভাবে বিশ্বাস ছিল, এবং এই বিশ্বাসের বশে উচ্চবর্ণের মানুষ নিম্নবর্ণের ও বর্ণভেদের (প্রাগার্যদের) বাইরের মানুষদের হীন জেনে প্রয়োজনে তাদের ওপর অত্যাচার করত। আর নারীকে একেবারে প্রথম পর্বের পর থেকেই সাধারণ ভাবে হীন বলে মনে করা হত। সমাজে এ সব বিশ্বাস ভিত্তিস্থানীয় ছিল, এ নিয়ে মতভেদ বা আচরণে ভেদ ছিল না, কারণ এর সবটাই— আর্য, শূদ্র, ম্লেচ্ছ, নারী, পুরুষ–ঘোরতর প্রত্যক্ষ ব্যাপার।

সমাজে যেখানে বিপত্তি, অভাব, অসংগতি, যেখানে তার কোনও প্রত্যক্ষ প্রতিকার ছিল না, সেখানেই স্থান দেবমণ্ডলীর ও তাদের কেন্দ্র করে যজ্ঞানুষ্ঠানের। সংশয়ের ভূমি সেইখানেই। প্রশ্ন, সংশয় কীসে? যজ্ঞে যেহেতু মূর্তি ছিল না। তাই আর্যদের কাছে তাদের দেবতার উদ্ভব ছিল তাদের কল্পনায়। যাস্কের নিরুক্তে দেবতাদের আকার নিয়ে আলোচনায় দেখেছি মানুষের আকারে কল্পনা করা একান্ত স্বাভাবিক বলে তাই ঘটেছিল; তাই বেদের দেবতারা–প্রকৃতির শক্তি, যেমন বায়ু, সূর্য, চন্দ্র, পর্জন্য, অগ্নি বাদ দিয়ে সবাই মনুষ্যরূপী। তবু যে কিছু কিছু সংশয় ছিল তা জানা যায় যাস্কের নিরুক্তের দৈবতকাণ্ডে। যেখানে প্রশ্ন করা হচ্ছে, 'তা হলে অশ্বিনারা (দুজন) কারা?' উত্তরে শুনি, 'কেউ বলে এরা আকাশ ও পৃথিবী, কেউ বলে এরা দিন ও রাত্রি। আবার কেউ-বা বলে এরা পুণ্যবান রাজা (অর্থাৎ উচ্চবর্গের মহান মানুষ্য)।'(১)

এর থেকে বোঝা যায়, দেবতাদের মৌলিক সত্তা নিয়ে মানুষের মনে প্রশ্ন ছিল এবং ভাল কাজ করেছে এমন মানুষও দেবতার পদে উন্নীত হয়েছেন। ঋগ্বেদ রচনা শেষ হওয়ার শ-চারেক বছর পরে যাস্ক এ কথা বলেন। কিন্তু, এ কথা মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, এই ধরনের বিকল্প ভাবনা সমাজে আগে থেকেই ছিল, না হলে 'কেউ বলে' বলে যাস্ক তিনটি বিভিন্ন মত উদ্ধার করতে

পারতেন না। এই সব বিকল্প মত ঋগ্বেদের সময়েই ক্রমে ক্রমে উদ্ভূত হয়েছিল এবং প্রচলিত ছিল, যাস্ক সেগুলিকে একত্র করে বলছেন মাত্র। দেবতাদের আদিসত্তা বা স্বরূপ নিয়ে তখনই মানুষের মনে প্রশ্ন ছিল।

দেবতাদের স্বরূপের চিন্তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত যে-প্রশ্নটি তা হল, দেবতাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস অথবা অবিশ্বাস। সমস্ত যজ্ঞপ্রিক্রিয়ার ভিত্তিই, দেবতারা আছেন–এই বিশ্বাস। যজ্ঞে তো দেবতারা বিমূর্ত, তাঁদের আহ্বান করে প্রার্থনা করা হয়। কখনও সে-প্রার্থনা পূর্ণ হয়, কখনও হয় না। স্বভাবতই চিন্তাশীল মানুষ ভাববে, 'আমরা যে হাব্য সাজিয়ে, স্তবগান করে এই সব দেবতাদের আহ্বান করে প্রার্থনা জানাই, এদের তো দেখতে পাই না, এরা কোথায় থাকেন?' হিরণ্যস্তূপ ঋষি বলছেন, 'সূর্য এখন কোথায়, কে তা জানে, কোন আকাশে এখন তিনি তাঁর রশ্মিজাল বিকীর্ণ করছেন?'(২) মনে হয়, সন্ধ্যার অন্ধকারে এ প্রশ্ন ঋষির ও অন্য অনেকেরই মনে জেগেছিল: 'যে-সূর্যকে সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত আকাশে দেখা যায়, সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত সেই সূর্য কোথায় যায়, কে তা জানে?' অর্থাৎ, কেউই তা জানেন না। বামদেব ঋষি বলছেন, 'কোন পথটি দেবতাদের কাছে পৌঁছেছে, কে তা জানে, কে তা বলবে?' দেবতাদের যে আবাসগুলি অধোমুখী দেখা যায়, সে সব আবাস কে জানে, কোন গোপন উৎকৃষ্ট অনুষ্ঠানে (তা জানা যায়?)।'(ঋগ্বেদ ৩:৫৪:৫) ঋষি ঋণঞ্চয় বলছেন, 'কোথায় থাকেন ইন্দ্র? কোন বীর ইন্দ্রকে দেখেছে?'(৩) বামদেব ঋষি প্রশ্ন করেন, 'কোথায় তোমার বাসস্থান? কেন আমাদের আনন্দিত করছ না?'(৪) অগ্নিদেবতাসম্বন্ধে ঋষি আত্রেয়ইষ জিজ্ঞাসা করছেন, 'সেই অগ্নি কোথায় থাকেন, যাঁর আগমনে হৃষ্ট ভক্তজনেরা অগ্নিস্থানে অগ্নিকে প্রজ্বলিত করেন?'(৫) অরণি দুটির সংঘর্ষণে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়,এটা তারা চোখেই দেখত। তাই স্বভাবতই মনে প্রশ্ন আসত, যখন মানুষ অগ্নিকে প্রজ্বলিত করছে না, তখন অগ্নি কোথায় থাকেন? তেমনই অন্য এক ঋষি, মান্য, প্রশ্ন

করছেন, ‘হে আদিত্যগণ, এই জীবিত যে আমরা, আমাদের অভিমুখে দ্রুত চলে এসো। মৃত্যুর আগে কোথায় থাক তোমরা, আমাদের হবন শোন তো?’(৬) যজ্ঞকালে যাঁদের আহ্বান করে রাহুগণপুত্র গৌতম ঋষি অগ্নিকে বলছেন, ‘তুমি (আসলে) কে, কোথায় আছ?’(৭) স্তব ও নৈবেদ্য উৎসর্গ করা হচ্ছে, তারা যজ্ঞকারীদের মানসলোকে বাস করেন, বা অবতীর্ণ হন যজ্ঞের সময়ে। কিন্তু অন্য সময়ে? কোথায় থাকেন তাঁরা? গূঢ়, অনুচ্চারিত যে-প্রশ্নটি এর অন্তরালে আছে তা হল: কোথাও তারা সত্যিই আছেন তো?

প্রশ্নটা খুবই জরুরি, কারণ এরই সঙ্গে জড়িত তাদের অস্তিত্বের মৌলিক সমস্যাগুলি যেগুলির সমাধানের জন্যে তারা যজ্ঞ করে। তাই যজ্ঞের উপযোগিতা, পদ্ধতি নিয়ে সংশয় আসবেই, ‘কে সেই যজ্ঞকারী, হে অগ্নি, যে তোমার উদ্দেশে যজ্ঞ সাধন করে সমৃদ্ধি পেয়েছে? হে অগ্নি, কেমন মন নিয়ে আমরা যজ্ঞ করব?’ এর পশ্চাতে একটা হতাশাজনিত সংশয় আছে; যে-মন নিয়ে ভক্ত উপাসনা করছে তাতে অভীষ্ট ফল পাচ্ছে না; তাই এই আর্ত আকুতি। অর্থাৎ যজ্ঞে হব্য ও স্তোত্র দিয়েও প্রার্থী জানে না কেমন মনোভাব নিয়ে যজ্ঞ করলে সেটা সফল হবে। তারই সঙ্গে প্রশ্ন আসে ইন্দ্র— যজ্ঞে যিনি অদৃশ্য–তাকে আহ্বান করলে তিনি কেমন করে শুনবেন? ‘স্তোতার (স্তব) ইন্দ্র কেমন করে শোনেন? শুনেও বা কেমন করে তার সুরক্ষার ব্যবস্থা করেন? ইন্দ্রের কোন সব প্রাচীন দানের কথা জানা যায়, এই সব হাব্য পেয়ে ইন্দ্র কেমন করে স্তোতার বাসনা জানবেন?’(৯) এ প্রশ্ন যজ্ঞকারীর থেকেই যায়– প্রার্থী স্তব নৈবেদ্য দিয়ে দেবতার উপাসনা করলে দেবতা কেমন করে প্রার্থীর মনোভাব জানবেন? না জানলে তো প্রার্থনা পূরণের প্রশ্নই ওঠে না। ঋষি ত্রিত কুৎস বলেন, ‘তোমরা (হে দেবতারা) যারা আলোকিত ত্রিলোকে আছে, তোমাদের ঋত, অনৃত কোথায় থাকে? পূর্বকালে আমরা যে-আহুতি অর্পণ

করেছিলাম, সেগুলো কোথায় আছ? তোমরাই তা জান, হে আমার আকাশ ও পৃথিবী।'(১০)

প্রার্থনা করে, স্তব করে, নিয়ম অনুসারে যজ্ঞ করেও যখন ফল ফলে না। তখন এক গভীর নৈরাশ্য ভক্তকে আচ্ছন্ন করে, সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রশ্নও আসে। এর ঠিক পরেই তাই দেখি, 'হে দেবতারা, পুরাতনকালে যে সব উপকার করতে, সেই উপকার করার ক্ষমতা তোমাদের কোথায় গেল? কোথায় গেল হে বরুণ ঋতকে ধারণ করার, (ভক্তকে) রক্ষা করার সেই ক্ষমতা? হে অর্যমা, ভক্তকে দুর্গম দেশে পথ দেখাবার ক্ষমতা কোথায় গেল? হে আমার আকাশ-পৃথিবী, তোমরাই তা জান।'(১১) ভক্তরা একাগ্রচিত্তে দেবতাদের স্তব করেন, তার পর কী হয় সে সব স্তোত্রের? সেগুলি কি কোথাও পৌঁছোয়? কক্ষীবান বলছেন, 'হে অশ্বিদ্বয়, কোন সেই স্তব যা তোমাদের প্রীত করে? এমন কোনও স্তোতা কি আছে যে তোমাদের তুষ্ট করতে পারে? তোমাদের ভক্তরা যারা তোমাদের শৌর্য জানে না, তারা তোমাদের কোনভাবে তুষ্ট করবে?'(১২) সব কিছু সাধ্য মতো করেও, দেবতাদের স্তব, খাদ্য দিয়েও যখন অভীষ্ট ফল পাওয়া যায় না। তখন সেই দেবতার উদ্দেশে প্রশ্ন নিবেদন করে ভক্ত: 'তুমি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হচ্ছে না, কেন তুমি আমাদের তুষ্ট করার জন্য আমাদের প্রাথিত দান দিচ্ছে না?'(১৩)

যজ্ঞ তো নিষ্কাম কর্ম নয়, বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে, বিশেষ অবস্থায় মানুষ যজ্ঞ করত। সে-অবস্থা হয় বিপদের, রোগশোকের অথবা কোনও কোনও বস্তুর অভাবের। এ সব অভাব মেটাবার জন্যে, আতঙ্ক, অনিশ্চয়, অভাব বা বিপত্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই যজ্ঞ, বিধিমতে সে-যজ্ঞ করেও যখন প্রাথীর আশা পূর্ণ হয় না, তখন সে অন্ধগলির প্রান্তে এসে ঠেকে। কারণ, প্রকৃতিকে জয় করার ও অভীষ্ট সিদ্ধির জন্যে একটি উপায়ই তার জানা আছে:

যজ্ঞ সম্পাদন। সে-উপায় যখন নির্ম্মফল হয় তখন সে চোখে অন্ধকার দেখে। বহু সুক্তের বহু ঋকেই এই গভীর হতাশা প্রতিফলিত। এই হতাশাতেই অন্তর্নিহিত থাকে প্রশ্ন ও সংশয়। দেবতারা মঙ্গলময়, এমন একটা বিশ্বাস হল সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ডের, সমস্ত যজ্ঞবিধির ভিত্তিভূমি। যখন মানুষ মনে করে যে, বিশ্বচরাচরে ঋত আছে, তার অধিষ্ঠাতা বরুণ আছেন, আছেন অন্যান্য মানবহিতৈষী সর্বশক্তিমান দেবতারা, অথচ তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এই বিশ্বে আছে নানা অশুভ শক্তি, যেগুলি নানা ভাবে মানুষকে ব্যর্থ করে, পীড়া দেয়, তখন সমস্ত বিশ্ববিধান সম্বন্ধেই একটা গভীর সংশয় দেখা দেয়। মন্দের অস্তিত্ব সত্ত্বেও দেবাসার্বভৌমবাদ প্রথমে সেই সব তত্ত্বকে অবলম্বন করে সৃষ্ট হয় যেগুলি ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করে কেমন করে একজন সর্বশক্তিমান ও সর্বমঙ্গলময় ঈশ্বর পৃথিবীতে মন্দকে স্থান দিতে সম্মত হন।'(১৪)

সংসারে মন্দের নানা রূপ; তবে সাধারণ ভাবে বলতে গেলে যা-কিছু ব্যক্তিস্বর্থ বা গোষ্ঠীস্বর্থকে আঘাত করে, তা-ই মন্দ। এ মন্দ প্রকৃতির যে-শক্তি মানুষের অনিষ্টসাধন করে তাতেও যেমন স্পষ্ট, মানুষের দ্বেষহিংসা, ক্ষতিকারক কার্যকলাপ, তাতেও তেমনই প্রকাশিত। আবার যখন দূরারোগ্য রোগ, যন্ত্রণা, অকালমৃত্যু, প্রতিবন্ধিত্ব মানুষকে আঘাত করে শরীরে মনে, তখন সে-ও মন্দের এক বুপ, সহজ বুদ্ধিতে যার কোনও ব্যাখ্যা মেলে না। তখনই মানুষের মনে গভীর সংশয় দেখা দেয়: দেবতারা যদি মঙ্গলময় ও মানবহিতৈষী হন, তারাই যদি বিশ্বসংসার নিয়ন্ত্রণ করেন। তবে যা মানুষের স্বার্থের প্রতিকুল, যা তাকে পীড়া দেয়। তার ক্ষতি করে, এমন শক্তিকে তাঁরা এ সংসারে প্রবেশ করতে দিলেন কেন? এই বিরোধ আস্তিক্যের মর্মমূলে টান দেয়, বিশ্বাসকে উৎখাত করতে উদ্যত হয়।

মানুষের মনে দেবতাদের সম্পর্কে সংশয় অনেকগুলি বুপে দেখা দিতে পারে। দেবতাদের সঙ্গে মানুষের প্রথম সম্পর্ক যজ্ঞে: অনুষ্ঠানে প্রার্থনাপূরণ না হলে

মানুষ ভাবতে বসে, গোলমালটা কোথায়? যজ্ঞের নৈবেদ্যটা কি ঠিকঠাক হয়নি, মনোমতো হয়নি দেবতাদের? যজ্ঞের প্রক্রিয়া কি তাদের অভিমত নয়? আমাদের স্তব কি তাদের প্রীত করেনি? এগুলিই যদি কারণ হয়, তাহলে সমস্যা হল, এ সব বিষয়ে তাঁদের অভিরুচি কী তা কেমন করে জানা যাবে? এইখানে ভক্ত ও তার ভগবানের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড মহাশূন্যের ব্যবধান থেকেই যায়।

ঋষি গৌতম প্রশ্ন করেন: 'দেবতাদের বিধিমতে আরাধনা করার পরেও কোন (ঋত্বিক) জানতে পারেন। কার কাছে পৌঁছোল (সেই হবি, ঘৃত ইত্যাদি), কে জানতে পারে সেই উদ্দিষ্ট দেবতা (ইন্দ্র) কে?'(১৫) ত্রিত কুৎস প্রশ্ন করেন অগ্নিকে, সমস্ত যজনীয়দের আদিভুত (অগ্নি)-কে প্রশ্ন করি, যিনি (দেবতাদের) দূত তিনি (আমাকে) বলুন, আমাদের (প্রতি বর্ষিত) তাঁর পুরাতন প্রসাদগুলি কোথায় গেল? বর্তমানে তার নূতন প্রসাদ কে ভোগ করছে? আমার আকাশ পৃথিবী তা জানেন।'(১৬) দেবতারা আমাদের বলুন, এ প্রার্থনা নানা ভাষায় বারে বারে আছে। আমরা বুঝতে পারছি না, অর্থাৎ সাধারণ বুদ্ধিতে, যুক্তিতে যেমনটি হওয়ার কথা তা হচ্ছে না, মিলছে না হিসেবা; অতএব দেবতারা আমাদের বলুন। আমরা সন্দেহ করতে চাই না, কিন্তু যখন দুই আর দুই মিলে বারেবারেই তিন কিংবা পাঁচ হয়, তখন শুধু খটকা লাগে না, সমস্ত বিশ্বাসের ভিত্তিতে টান পড়ে। প্রশ্ন উদ্যত হয় দেবতাদের উদ্দেশে। অথচ দেবতারা তো সংশয় নিরসন করেন না, ভিক্তের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন না, কাজেই প্রশ্ন থেকেই যায়। ঋষিরা যখন স্তব রচনা করেন তখন সে সব প্রশংসার উৎস তাদের বিশ্বাস এবং প্রয়োজন; স্তবের সঙ্গে যুক্ত থাকে বহুবিধ প্রার্থনা, সুস্থ, বিজয়ী, নীরোগ, দীর্ঘজীবী, প্রাচুর্যপূর্ণ, সমৃদ্ধ জীবনযাপন করতে যা যা প্রয়োজন তার জন্যে প্রার্থনা। অনেক সময়ে প্রার্থনার সঙ্গে থাকে দানপ্রস্তুতি অর্থাৎ কোন দেবতা কোন কোন পুর্বতন প্রাথীকে কী কী দান করে কৃতার্থ

করেছেন তার তালিকা। জ্ঞানের জন্যে, পারিবারিক শান্তির জন্যেও প্রার্থনা থাকে; জীবনের অজ্ঞেয়, রহস্যময় দিক, যা চিরকাল মানুষকে ভাবিয়েছে তাকে বোঝবার জন্যেও চেষ্টা ব্যক্ত হয়েছে বহু সূক্তে।

সারা পৃথিবীতেই জীবনের রহস্য সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা একটা দুর্লভ সম্পদের মতো মুষ্টিমেয় কিছু মনীষী সংগোপনে রক্ষা করেন। ঋগ্বেদ-অথর্ববেদে এমন কিছু সূক্ত আছে যার ব্যাখ্যা প্রশ্নাতীত নয়, নানা ভাষ্যকার নানা ভাবে অর্থ করার পরেও যেগুলির বিবক্ষিত বিষয়টি রহস্যাচ্ছন্নই রয়ে গেছে। অর্থাৎ এগুলি যেহেতু জীবনের মৌলিক রহস্য সম্বন্ধে রচয়িতা ঋষির ব্যক্তিগত উপলব্ধি, যা তিনি স্বভাবতই কতকটা রহস্যাবৃতই রাখতে চেয়েছিলেন, তাই অভিধাগত অর্থ দিয়ে তাঁর উপলব্ধির গহনে প্রবেশ করা যায় না। তেমনই খিলসূক্তে কিছু কিছু সূক্ত আছে যার পশ্চাৎপট হারিয়ে গেছে বলে সেগুলির যথাযথ অর্থ আজ আর জানা যাবে না। এগুলি কতকটা ইচ্ছে করেই ধাঁধার আকারে রচিত, হয়তো এগুলিরও অন্তর্গূঢ় অভিপ্রেত অর্থের মধ্যে আদিতে কিছু প্রশ্ন নিহিত ছিল, যার সমাধান না করতে পেরে রচয়িতা তার ওই সব অনুত্তরিত প্রশ্ন প্রহেলিকার আকারে সংরক্ষণ করেছেন। এ সব প্রশ্ন স্পষ্ট আকারে নেই বলে এদের আজ আর স্বরূপে চেনা যাবে না। কিছু আছে যা আজকের পণ্ডিতরা ভূমি, পশু ও নারীর প্রজনিকা শক্তি বৃদ্ধির জন্যে-সম্ভবত কিছু সুচিরলুপ্ত অনুষ্ঠানের সঙ্গে–আবৃত্তি করার উদ্দেশ্যে রচনা করেছিলেন; এগুলির মধ্যেও কিছু জিজ্ঞাসা আছে যা জিজ্ঞাসার আকারে উপস্থাপিত নয়, প্রতিপাদিত তথ্যের আকারে রক্ষিত আছে। যা বলতে চাই তা হল সরাসরি প্রশ্ন ছাড়াও গৌণ ভাবে তৎকালীন মনীষীদের নানা জিজ্ঞাসা ও সংশয় নানা আকারে রয়ে গেছে যেগুলিকে অভিধাগত অর্থে চেনা যাবে না, তাই সেগুলির যথার্থ স্বরূপ হয়তো কোনও দিনই উদঘাটিত হবে না।

আমাদের আলোচনা অবশ্য উচ্চারিত প্রশ্ন নিয়েই। আর্যদের দেবমণ্ডলীতে প্রধান দেবতা ছিলেন তাদের অভিযানের দেবায়িত সেনাপতি ইন্দ্র। এই দেবায়ন তাঁর মৃত্যুর পরে ঘটেছিল এবং তখন তিনি তাঁর ভক্তদের সব রকম সমস্যার সমাধান করেন। তিনি সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, ধনদাতা, অন্নদাতা, ঋগ্বেবেদের সমস্ত সুক্তের এক-চতুর্থাংশের বেশি অংশের দেবতা ইন্দ্র। প্রথম দিকে দেবমণ্ডলীর প্রধান, পরবর্তীকালে তিনিই হলেন দেবরাজ। ইন্দ্র তার নির্দিষ্ট আধিপত্য প্রয়োগ করলে অন্যান্য দেবতারা যথাযথ আচরণ করবেন, সমস্যা থাকবে না। সেই জন্যে ইন্দ্র সম্বন্ধেই সবচেয়ে বেশি আগ্রহ ভক্তদের, তাই তাকে নিয়েই নানা সংশয়। এত ক্ষমতাবান যে ইন্দ্র 'কোন বোধে সেই পরামদেবতাকে মানুষ অবধারণ করবে? সেই মহান দেবতা এক নিমেষেই তার মনীষা দিয়ে আশ্চর্য (কর্ম) সম্পাদন করেন। তিনি (ভিক্তের) পাপ ক্ষমা করেন এবং স্তোতাকে দান করেন। (১৭) প্রশ্ন বামদেব ঋষির, এবং শুধু তার নয়, বহু ভক্তেরই: 'এমন যে মহাপরাক্রমশালী ইন্দ্র, কোন মনীষা দিয়ে তাকে জানবে মানুষ?' অর্থাৎ ইন্দ্রকে ধারণা করে বোধের অন্তর্ভুক্ত করা মানুষের সাধ্য নয়।

এখানে প্রশ্ন মানুষের জ্ঞানের বা বোধের সীমা নিয়ে, মানুষের বোধের বাইরে ইন্দ্র; তাঁকে ধারণা করা মানুষের সাধ্য নয়। কিন্তু নেম ভার্গব ঋষির প্রশ্ন আরও মৌলিক। যারা সংগ্রাম (মতান্তরে অন্ন) পেতে চাও, সেই যজ্ঞকারীরা ইন্দ্রকে সত্যই স্তবে পূর্ণ করে–যদি সত্যই তিনি থাকেন।' বলা হচ্ছে, 'ইন্দ্র নেই, কে তাকে দেখেছে? কার উদ্দেশে স্তব করব?'(১৮) নেম ভার্গব বলছেন, যজ্ঞকারীরা কিছু প্রার্থনা করে ইন্দ্রকে তুষ্ট করুক, যদি সত্য বলে কিছু থাকে'। এটা পুরোহিত-যজমানের মধ্যে চিরন্তন দেনাপাওনার সম্পর্ক যা তারা যজ্ঞ করে, দেবতার কাছে প্রার্থনা করে, প্রার্থনা পূরণের আশা করে বহুকাল ধরে বজায় রেখেছে। যজ্ঞে স্তব হাব্য ও অনুষ্ঠানের পেছনে যে

বিশ্বাসের প্রণোদনা তা হল ইন্দ্রের অস্তিত্বে আস্থা। ইন্দ্র বলে কোনও শক্তিমান ভক্তহিতৈষী দেবতা থাকলে তবে তো ভক্তের অভীষ্ট পূর্ণ হবে? এখানে নেম ভাগবি বলছেন, 'ইন্দ্রই নেই।' আগেই বলে নিয়েছেন, 'যদি সত্যই তিনি থাকেন'। এখানে সম্ভাবনা দুটো: তিনি আছেন বা তিনি নেই।

ন্যায়শাস্ত্রে প্রথম প্রমাণ হল প্রত্যক্ষ, ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা। লোকেরা যদি চোখে ইন্দ্রকে দেখে থাকত, তা হলে নেম ভার্গবের আপত্তি টিকত না; সেই জন্যে ইন্দ্রে যারা বিশ্বাসী তাদের কাছে এই প্রত্যাহ্বান, 'তোমরা যে ইন্দ্রকে বিশ্বাস করে তাঁর উদ্দেশে যথাবিধি যজ্ঞ করে আশা করে বসে থাক যে, তিনি তোমাদের প্রার্থনা পূরণ করবেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কোনও দিন কি সেই ইন্দ্রকে দেখেছে?' এর উত্তর স্বভাবতই চুপ করে থাকা, কেউ সত্যিই ইন্দ্রকে কোনও দিন দেখেনি। আর ইন্দ্র হলেন দেবশ্রেষ্ঠ, তাকেই যদি কেউ কোনও দিন না দেখে থাকে তা হলে বাকি দেবতারা যাঁরা তার তুলনায় নীচে, তাঁদের সম্বন্ধে কোনও প্রশ্নই ওঠে না। তা হলে সমস্ত যজ্ঞক্রিয়াটাই শুধু নিরর্থক হয়ে গেল না, বিশ্বচরাচর সম্বন্ধে প্রত্যয়ের ভিতটাই ভেঙে গেল, শূন্য বেদির সামনে উচ্চারিত প্রার্থনা বাতাসে মিলিয়ে গেল। প্রতিধ্বনি সংশয়ের ধ্বনিতেই ফিরে এল স্তোতার কাছে।

ঋষি গৃৎসমদ এ সংশয়ের এক ধরনের একটা উত্তর দিয়েছিলেন, 'যে ঘোর দেবতার বিষয়ে প্রশ্ন করে তিনি কোথায়, কিংবা যারা বলে ইনি নেই, ইনিই তো প্রসন্ন হয়ে বহুতর পুষ্টি, শত্রুদের সম্পত্তি আহরণ করে এনেছেন, তাঁকে বিশ্বাস কর। হে জনগণ, তিনিই ইন্দ্র।'(১৯) এ ঋক্‌টিতে লক্ষ করবার অনেকগুলি বিষয় আছে। প্রথমত, এটির পূর্বপক্ষ হচ্ছে নেম ভার্গবের স্পষ্ট উক্তি–ইন্দ্র নেই; এতে তার উত্তর দেওয়া হচ্ছে। যিনি প্রসন্ন হয়ে বহু শক্রিসম্পত্তি আহরণ অর্থাৎ হরণ করে এনে আর্যদের পুষ্টি জুগিয়েছেন তাঁর

অস্তিত্ব অস্বীকার করা তো বাতুলতা। সেই শত্রুসম্পত্তি, সেই পুষ্টি তো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তব, কাজেই যিনি তা শত্রুদের কাছ থেকে হরণ করে আর্যদের এনে দিয়েছিলেন তার অস্তিত্বে কেমন করে অবিশ্বাস করা যায়?

এখানে দুটো বিভিন্ন যুগের দুই বিভিন্ন ইন্দ্রের কথা বলা হচ্ছে। আর্যদের সেনাপতি ইন্দ্র যখন প্রথম অভিযানে প্রাগার্যদের পরাস্ত করে তাদের শস্য অন্ন খাদ্য সম্পত্তি পশুপাল হরণ করে এনে দিয়েছিলেন সেই ঐতিহাসিক সেনাপতির স্মৃতি তো আর্যদের মনে উজ্জ্বল। কালক্রমে তাঁর মৃত্যু হলে আর্যরা কল্পনায় তাকে স্থাপন করে 'দেবরাজ' করে তুললে পর তিনি আর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রইলেন না। তখন তাঁর স্থান স্মৃতিতে কল্পনাপ্রসূত প্রত্যয়ে। ভূমিকা তাঁর একই রইল, অন্তত প্রথম কিছুকাল তিনি বিজেতা সেনাপতি, পরাক্রান্ত নেতা, আগন্তুক আর্যদের অন্নদাতা। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন তিনি আর দৃষ্টিগোচর নন, তখন বিশ্বাসী সংশয়ীকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে ঐতিহাসিক ইন্দ্রের বাস্তব সত্তা, এবং অনুযোগের সঙ্গে নির্দেশ দিচ্ছে: তাকে বিশ্বাস করো জনগণ, তিনিই ইন্দ্র। এই শেষ অংশটি–জনাস ইন্দ্র–চোদ্দোবার পুনরাবৃত্ত হয়েছে। এত বার আবৃত্তি করার প্রয়োজনটা বোঝা যায়; সংশয়টা একা নেম ভাগবের ছিল না। বস্তুত নেম ভাগবের উক্তিতে সংশয়ের ভাষা নেই, প্রত্যয়েরই ভাষা:

ইন্দ্র নেই। এ বোধ বহু মনে সংক্রামিত হয়েছিল বলেই এত বারবার তার খণ্ডন করার দরকার পড়ল।

যজ্ঞ সম্বন্ধে আমরা গবেষকদের কাছে যা জেনেছি তাতে আবৃত্তি ও গানের বিশেষ বিশেষ অংশে সমবেত জনতা সক্রিয় অংশ নিত। মনে হয় ওই 'স জনাস ইন্দ্রঃ' অংশটিও তেমনই একটা অংশ যা সকলে উচ্চকণ্ঠে আবৃত্তি করত। এই প্রক্রিয়াকে মনস্তাত্ত্বিকরা বলেন আত্মবিশ্বসনের উপায়

(autosuggestion), কোনও একটা উক্তি নিজের কাছে বারবার আবৃত্তি করলে ক্রমে অবচেতনে সেটা প্রত্যয়ের স্তরে দৃঢ় হয়ে যায়।

আরও দুটো জিনিস লক্ষ করবার আছে: প্রথম লোকে যখন অদৃশ্য ইন্দ্রের সর্বশক্তিমত্তা এবং আর্যহিতৈষাতে সন্দিহান, তখন গৃৎসমদ এবং তৎপহীরা সে সংশয় নিরসন করতে চাইছেন ঐতিহাসিক ইন্দ্রের আর্যদের অনুকুলে ভূমিকা দিয়ে। মাঝে হয়তো কয়েক শতকের ব্যবধান, কারণ প্রথম ইন্দ্র যে আর্যরা ভারতবর্ষে প্রবেশ করবার অন্তত দু-তিনশো বছর। আগেই ছিলেন তার প্রমাণ আনাতোলিয়ার বোঘজ-কো-ঈ শিলালেখে। তিনি সম্ভবত পরাক্রান্ত বিজেতা ছিলেন বলেই আর্যদের পরবর্তী সব পরাক্রান্ত সেনাপতিদের উপাধি দেওয়া হত ইন্দ্র। ইন্দ্র যে একটি পদ তা নিয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই।(২০) তা হলে নেম ভার্গব অদৃশ্য ইন্দ্রের অস্তিত্ব অস্বীকার করছেন প্রথম ইন্দ্রের তিরোধানের বেশ কয়েক শতাব্দী পরে, প্রথম জনের আহৃত সম্পদের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে। পরিশেষে এ সমস্ত প্রসঙ্গটার পেছনে আছে সমষ্টিগত ভাবে আর্যদের যজ্ঞফলের ব্যর্থ প্রতীক্ষায় অবসিত সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা। ইন্দ্র থাকলে প্রার্থনা শুনতেন, একদা তো শুনেছিলেন, কিন্তু সে কবেকার কোন ইন্দ্র? তাকেই, বা তার স্মৃতিকেই সামনে এনে গৃৎসমদ বলছেন, ‘স জনাস ইন্দ্রঃ’। বলছেন, কারণ বলবার খুব মর্মান্তিক প্রয়োজন ঘটেছে। একা নেম ভার্গবই নন, চিন্তাশীল, যুক্তিবাদী অনেক মানুষই তখন ইন্দ্রের অস্তিত্বে সন্দিহান।

‘দেবতার অস্তিত্বে, এমনকি দেবরাজ (ইন্দ্র)-এর অস্তিত্বে এই সন্দেহ এবং বিশ্বসৃষ্টির মূল ভিত্তিভূমি সম্বন্ধে সংশয়ের উদ্রেকও নাস্তিক্য নয়। এ সব ধারণাকে এর পরেও যুক্তি দিতে হবে যে, ঈশ্বরে বিশ্বাস একটি ভ্রান্ত বিশ্বাস। এ সব যুক্তি তখনই দেখা দেয় যখন দার্শনিক বিকল্প হিসেবে দীর্ঘকাল ধরে

উদীয়মান ভগবদবিশ্বাস বিশ্বভুবনের ঐকান্তিক উৎস ও অধিপতি সম্বন্ধে ধারণার মুখোমুখি হয়।'(২১)

শুধু একজন দেবতার প্রতি অবিশ্বাস, এমনকী তিনি দেবরাজ ইন্দ্র হলেও তার প্রতি অবিশ্বাসও প্রকৃত নাস্তিক্য নয়। দেবতায় বিশ্বাস ও সৃষ্টির মূল বিমূর্ত শক্তির উৎস–এ দুটি দীর্ঘকাল ধরে পরস্পরের সম্মুখীন হয়ে থাকার পর যখন এদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে অর্থাৎ মানুষ যখন তার কল্পনাসৃষ্ট অবয়বী দেবতায় বিশ্বাস হারায়, তার পরেও সৃষ্টির মূল শক্তির ওপরে বিশ্বাস রাখতে গিয়ে দুটি বিশ্বাসের সংঘাতে যখন সব বিশ্বাস হারাবার যুক্তি সৃষ্টি করে, তখনই দেখা দেয় নাস্তিক্য সে-বোধ ঋগ্বেদে স্পষ্ট হয়নি, তার উদ্ভব অনেক পরে; তবু তার সূচনা ঋগ্বেদেই।

যজ্ঞ এবং দেবতা সম্বন্ধে তাদের নিশ্চিত জ্ঞানের অভাব সম্বন্ধে ঋষিরা অবহিত ছিলেন: 'কোন বিদ্বান ছন্দগুলির প্রয়োগ জানেন? কেই-বা হোতা, প্রমুখদের স্থানের উপযুক্ত বাক্য জানেন? সাতটি ঋত্বিকের পরের অষ্টম স্বতন্ত্র ঋত্বিক কাকে বলে? ইন্দ্রে দুটি অশ্ব (হর)গুলিকে কে জানে?'(২২) যজ্ঞ যখন একমাত্র উপাসনা, তখন মানুষ সেসব কাম্য বস্তুর জন্য প্রার্থনা করে, তা পাওয়ার সব সম্ভাবনা নিহিত থাকে যজ্ঞ-অনুষ্ঠানটির ওপরে। এর তিনটি মূল অংশ: ১) দেবতা, ২) স্তোত্র ও হাব্য, এবং ৩) যজ্ঞের প্রক্রিয়া। এর সবগুলিই মানুষ নিজের কল্পনা ও বুদ্ধি থেকে সৃষ্টি করেছে; এখন, এগুলি যে যথার্থ ও বাস্তব তার তো কোনও প্রমাণ নেই। কে জানে, দেবতারা সত্যই আছেন কি না, মানুষ যে স্তব ও নৈবেদ্য তাদের সামনে অর্পণ করেন, সেগুলি দেবতাদের কাছে গ্রহণযোগ্য কি না তা-ই বা কে জানে এবং যে প্রক্রিয়ায় যজ্ঞ সম্পাদন করা হয় তাও-ও তো কোনও এক বিস্মৃত অতীতে মানুষই উদ্ভাবন করেছিল, সে প্রক্রিয়া যে যথার্থতারও তো কোনও নিশ্চয়তা নেই। তাই সংশয় মূল ব্যাপার থেকে প্রক্রিয়ার খুঁটিনাটি–যেমন ছন্দের প্রয়োগ, ইন্দ্রের দুটি অশ্ব–

এসব নিয়েও। কোনওটাই তো দেবতারা মানুষকে বলে দেননি: তারা আছেন কী নেই। কেমন স্তবে তাঁরা প্রীত হন, কোন হাব্য তাঁদের মনোমতো এবং কেমন ভাবে যজ্ঞ সম্পাদন করলে তাঁরা তুষ্ট হয়ে প্রার্থীর প্রার্থনা পূরণ করবেন; এ সবই মানুষের অনুমান। অতএব বড় একটা ফাক ওখানেই থেকে গেছে। এই অনুপুঙ্খগুলি যোগ করলে হয় যজ্ঞ, কাজেই, এগুলির যে-কোনও একটা ভুল হলেই যজ্ঞ নির্ম্মফল হবে, মানুষের প্রার্থনা অপূর্ণ থেকে যাবে। যত কাল যাচ্ছিল নির্ম্মফল যজ্ঞের সংখ্যা বাড়ছিল, স্বভাবতই মানুষের মনে প্রশ্ন জাগছিল গলদটা কোথায়? কারণ তাদের যাবতীয় প্রার্থিত বস্তু যজ্ঞের মাধ্যমেই পাওয়ার কথা, না পেলে বাস্তবজীবনে বহুতর অপূর্ণতা, ক্ষতি, ব্যর্থতা। কাজেই সংশয় যখন আপাত খুঁটিনাটি ব্যাপার–ছন্দ, হাব্য, স্তব–নিয়ে তখনও ব্যাপারটা তাদের কাছে জীবনমরণ সমস্যাই।। যজ্ঞে অভীষ্ট ফল না পাওয়া গেলে জীবনযাত্রা দুর্বল হয়ে উঠতে পারে, আবার এত ছোট ছোট সব ত্রুটিতেই যজ্ঞ নির্ম্মফল হয়ে যেতে পারে। তাই বারেবারে বিভিন্ন অনুপুঙ্খ নিয়ে যে মানুষের মনে সংশয় জেগেছে সেগুলি তুচ্ছ নয়, এবং বস্তুত অনুপথের চেয়ে অনেক বেশি সেগুলির গুরুত্ব: গোটা যজ্ঞটাকেই নির্ম্মফল করে দিতে পারে এই সব আপাত ক্ষুদ্র ত্রুটির যে-কোনও একটাই।

দেবতাদের অস্তিত্ব ছাড়াও যজ্ঞক্রিয়ার যথার্থতা নিয়েও নানা সংশয় ছিল। মানুষ দেবতার প্রসাদ চেয়ে স্তব ও হাব্য দিয়ে যজ্ঞে যে অনুষ্ঠান করে তা তো মানুষই ধীরে ধীরে নিজের চিন্তা ও কল্পনা দিয়ে উদ্ভাবন করেছে, সেগুলো দেবতার মনোমতো কি না তা জানিবার কোনও উপায়ই নেই। তাই সে অশ্বিনদের প্রশ্ন করেছে: 'উপাসকের স্তব কে শোনে? কাকে তা শ্রীত করে? দেবতাদের মধ্যে কে এই সব শোভন প্রশংসার স্তব শোনেন?'(২৩) অথবা '(অশ্বিনরা), কেমন স্তোত্র তোমাদের পক্ষে যোগ্য, (যার দ্বারা) অনুপ্রাণিত হয়ে তোমরা আমাদের কাছে আসবে? কে তোমাদের ক্রোধ বহন করতে পারে?'

(৪:৪৩:৪) এর অর্থ হল: আমরা তো আমাদের অনুমানশক্তির ওপরে ভরসা করে যা তোমাদের পক্ষে উপযুক্ত মনে করি তেমন স্তব করি। কিন্তু সে স্তব যে সত্যিই তোমাদের উপযুক্ত, গ্রহণযোগ্য ও শ্রীতিকর সে বিষয়ে আমরা কেমন করে নিশ্চিত হব? যদি আমাদের স্তব তোমাদের অভিমত বা তুষ্টিজনক না হয় তা হলে স্বভাবতই তোমরা ক্রুদ্ধ হবে; তোমাদের সে-ক্রোধ আমরা সামান্য মানুষ কেমন করে বহন করব? মরুতদের প্রশ্ন করা হচ্ছে, 'কেমন খাদ্য তোমাদের পক্ষে উপযুক্ত?' (১:১৬৫:১৫) দেবতাদের মধ্যে কনিষ্ঠতম যে অগ্নি তাকে আমরা যজ্ঞ সম্বন্ধে প্রশ্ন করছি, তিনিই বলুন, এই যে দেবতারা ত্রিলোকে সঞ্চরণ করেন, স্বর্গে ও মর্ত্যে, এদের মধ্যে যথার্থ ও অযথার্থ হিব্য সম্বন্ধে কে জানেন? (১:১০৫:৪৫)

এর মধ্যে দুটি জিনিস লক্ষ করবার মতো: মরুতরা বায়ু, তারা কি হব্য আহার করেন, করতে পারেন? তাই মানুষ বিভ্রান্ত বোধ করছে এই ভেবে যে এই যে আমরা মানুষের সুখাদ্য, সুপেয় বস্তু নিবেদন করছি, বায়ু দেবতাদের কাছে কি তা গ্রহণীয়? তারা কি এ সব আহার বা পান করতে পারেন? দ্বিতীয়ত, সূর্য চন্দ্র বায়ু পৃথিবী এ সব দেবতা তো প্রথম থেকেই ছিলেন, কিন্তু মানুষ দু-হাতে অরণি ঘর্ষণ করে সৃষ্টি করল অগ্নিদেবতাকে, তাই সকলের পরে এর জন্ম বলে একে কনিষ্ঠতম বলা হচ্ছে। দেখা যায়, জন্মমাত্রই অগ্নি অরণি দুটিকে গ্রাস করে, অতএব, 'এই যে চকু-পুরোডাশ-মাংস, ইত্যাদি এনে অগ্নির সামনে নিবেদন করছি, এগুলো ইনি আহার করবেন তো? আগুনে যেহেতু অরণি খণ্ড দুটি ভস্ম হয়ে যায়, হব্যও তেমনই ভস্ম হয়ে যায়; কিন্তু কাঠ তো খাদ্য নয়, এগুলো তার খাদ্য বটে তো? ভস্ম করাই কি আহার? যা ভস্মীভূত হয় তা-ই কি যথার্থ আহার্য?' এ সব সংশয়ের তো কোনও সমাধান মেলে না। অগ্নি একমাত্র দেবতা। যাঁর প্রচণ্ড শক্তি মানুষ নানা রূপে প্রত্যক্ষ করে, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কোনও কিছুতে অগ্নিসংযোগ করলে অল্প সময়েই তা দগ্ধ হয়,

দাবানলে বিস্তীর্ণ অরণ্যানীভস্মের স্তূপে পরিণত হয়। তাই অগ্নিদেবতা আর্যদের কাছে বিশেষ সম্মানের; অগ্নি ব্রাহ্মণ, প্রত্যেক মণ্ডলের প্রথম সূক্তটি বা সূক্তগুলি অগ্নির উদ্দেশে নিবেদিত। সেই অগ্নিকে প্রীত রাখার অনেক দায়, আর্যরা প্রাগার্য বসতি গ্রাস করছিল। অগ্নিসংযোগ করে, এ ভাবেই তাদের বাসভূমির বিস্তার ঘটছিল। আকস্মিক অগ্নিকাণ্ড থেকে আত্মরক্ষণ করাও তাদের প্রয়োজন হত। অগ্নিপক খাদ্য প্রস্তুত করা, হিংস্র শ্বাপদ থেকে রাত্রে নিরাপত্তার জন্যে প্রজ্বলিত অগ্নির শরণ নেওয়াও অত্যাবশ্যক ছিল। তাই এমন যে বহুধা-সম্মাননীয় অগ্নি, তার সম্বন্ধে মানুষের নানা প্রশ্ন: যখন আমরা প্রজ্বলিত করি না, তখন তিনি কোথায় থাকেন, আমরা যা দিয়ে তার উপাসনা করি তা তার অভিমত তো?

দেবতাকে উপাসক বারেবারেই প্রশ্ন করছেন, কখন তুমি খাদ্য ও প্রাচুর্য দিয়ে আমার স্তবের ও হব্যের প্রতিদান দেবে? ওইগুলির পিছনের সত্য হল, যজ্ঞ করেও অভীষ্ট ফল না। পাওয়া, বা এত বিলম্বে পাওয়া যে, যজ্ঞ ও ফলের মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ যুক্তিসিদ্ধ ভাবে স্থাপন করা দুরূহ; তখন স্বভাবতই মানুষের মনে হবে এ ফল আকস্মিক, কাকতালীয়বৎ। ফলে, যজ্ঞ করে প্রার্থিত ফল না পেয়ে স্বভাবতই মানুষ অধীর হয়ে উঠে যজ্ঞের অন্তরালে যে-দেবতাটির কাছে প্রার্থনা নিবেদন করেছিল তারই কাছে এই অযৌক্তিক বিলম্বের জন্যে নালিশ করেছে, ব্যাখ্যা চেয়েছে। জানতে চেয়েছে তার যজ্ঞক্রিয়ার কোনও ত্রুটির জন্যেই কি এই বিলম্ব, নৈবেদ্যটিকি দেবতার মনোমতো হয়নি? বা স্তোত্রটি? এ সব সংশয় যজ্ঞকারীর পক্ষে অনিবার্য, এর থেকে তার অব্যাহতি নেই, যেহেতু কেন ফল হচ্ছে বা কেন হচ্ছে না। এ সম্বন্ধে দেবতারা চিরনিরুত্তর।

মানুষ দেবতাদের সম্বন্ধে অতিকথা রচনার সময়ে সর্বদাই অবচেতনে অবহিত থাকে যে, এখন সে যে সব দেবতাকে আহ্বান করে যে পদ্ধতিতে যজ্ঞ

সম্পাদন করে যে-যে প্রার্থনা জানাচ্ছে, দূরবিস্মৃতি কোনও এক অতীতে (in illo tempore) দেবতারা ঠিক সেই প্রক্রিয়ায় যজ্ঞ করে সেই সব অভীষ্ট ফল লাভ করেছিল। অর্থাৎ, এই যজ্ঞপ্রিণালী পরীক্ষিত, ভক্তের প্রার্থনা পূরণ করার ক্ষমতা যে দেবতাদের আছে তা-ও পরীক্ষিত। কিন্তু এ তো মানুষের স্বাকল্পিত প্রবোধ; বাস্তবে যখন বিধিমতে যজ্ঞ করেও ফল মেলে না, তখন তো সব কিছুতেই সন্দেহ জাগে: যজ্ঞের হবে, স্তোত্রে, যজ্ঞ প্রক্রিয়ায়, ভক্তের অভীষ্টসাধনে দেবতার ক্ষমতায়, ইচ্ছায় এবং সর্বোপরি দেবতাদের অস্তিত্বে।

এই শেষের সন্দেহ সম্বন্ধে পরে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করব, আপাতত একটি ঋক্ থেকে এ সন্দেহের সার্বিক চরিত্রটিকে দেখা যেতে পারে: মানুষের মধ্যে কে তোমার বন্ধু (বা আত্মীয়), অগ্নি, কে তোমার উদ্দেশে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে? তুমি প্রকৃত (রূপে) কে, কোথায় তুমি থাক?'(২৪) বোঝা যায়, তখনকার মানুষ যে সব দেবতার স্তব করে যজ্ঞ করত, তাদের যথার্থ অস্তিত্ব নিয়ে, নিবাস নিয়ে এবং প্রার্থনা পূরণের ক্ষমতা ও ইচ্ছে নিয়ে তাদের মনে সংশয় ছিল। অবশ্য সংশয় থাকলেও তো উপায়ান্তর ছিল না। ইষ্টসিদ্ধি ও অতিলৌকিক শক্তির সহায়তা লাভের জন্যে পৃথিবীর সর্বত্রই মানুষ আদিযুগ থেকে নানা ভাবে যজ্ঞ বা তার অনুরূপ অনুষ্ঠান করে এসেছে। এ সময়ে তাদের মনে যুগপৎ বিদ্যমান থাকত বিশ্বাস ও সংশয়। ইষ্টসিদ্ধি চাই, উপায় যজ্ঞ। দেবতাদের প্রসন্ন করলে তারা অলৌকিক শক্তির সাহায্যে প্রকৃতিকে বশীভূত করে প্রার্থিত বস্তু দান করবেন। কোনও এক ভাবে এ সব বিশ্বাস না থাকলে যজ্ঞই করা সম্ভব হত না। যজ্ঞ সম্পাদন করবার সময় এ বিশ্বাস গৌণ বা অস্থির ভাবে হলেও তাদের চেতনে, অবচেতনে বিরাজ করতিই। আবার তারই সঙ্গে থাকত অবিশ্বাস বা তার প্রথম স্তর, সংশয়, হয়তো কতকটা দোলাচলত।

অথর্ববেদ সংহিতায় নতুন ধরনের একগুচ্ছ প্রশ্ন শুনি। ‘স্কম্ভ’ নামে একটি দেবতার কল্পনা দেখি, ইনি বিশ্বভুবনকে ধারণ করছেন স্কম্ভ বা স্তম্ভের মতো। এঁর কাছে প্রশ্ন:

‘তোমার রূপে বর্ণ কে সঞ্চারিত করল? তার কোন অঙ্গে তপঃ থাকে? আর ঋত? তাঁর বিশিষ্ট ব্রত ও প্রত্যয়ই বা কী? তার কোন অংশে সত্য থাকে? তার কোন অঙ্গ থেকে উজ্জ্বল অগ্নি দেদীপ্যমান, কোথা থেকে বায়ু প্রবাহিত হয়?’ (১১:৮:১৬)

এই ধরনের বহু প্রশ্নের শেষে শুনি: ‘তিনি কে?’ দেবতাদের স্বরূপই ছিল মৌলিক প্রশ্ন। অবশ্যই এ সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়ার কোনও উপায়ই ছিল না। আদিম মানুষের কল্পনা প্রয়োজন অনুসারে ভৌতিক জগৎ থেকে নানা দেবতাকে মনে মনে নির্মাণ করে, স্তবের দ্বারা জনসাধারণের মধ্যে তাঁদের প্রচার করে, যজ্ঞের দ্বারা তাদের কাছে নিবেদন করে–সুস্থ, দীর্ঘায়ু, বিজয়ী ও সমৃদ্ধিমান হয়ে বেঁচে থাকার জন্যে বিস্তর প্রার্থনা। কিন্তু চিন্তাশীল মনে এ সব প্রক্রিয়ার পাশাপাশি জেগে থাকে সংশয়।

স্বাস্তেরই মতো ব্রহ্মের উদ্দেশে আরও প্রশ্ন ভিক্তের:

তাঁর কোন অঙ্গে থাকে তপ, কোথায়ই বা থাকে। ঋত? কোথায় থাকে ব্রত, কোথায় শ্রদ্ধা, তার কোন অঙ্গে শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠিত থাকে? তার কোন অঙ্গ থেকে অগ্নি দীপ্ত হয়, কোন অঙ্গ থেকে প্রবাহিত হয় বায়ু? কোন অঙ্গ থেকে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে চন্দ্রমার। স্কম্ভের অঙ্গের পরিমাপ করে মহ, তাঁর কোন অঙ্গে থাকে ভূমি? কোন অঙ্গে অন্তরিক্ষ? কোন অঙ্গে আকাশ আশ্রিত থাকে, কোন দিকে থাকে আকাশের উত্তরের দিক। কাকে পেতে চেয়ে অগ্নি ঊর্ধ্বদিকে ধাবিত হয়,

কাকে পেতে ইচ্ছে করে বায়ু প্রবাহিত হয়?.. অর্ধমাসগুলি কোথায় চলে যায়, কোথায় যায় মাসগুলি সংবৎসরের সঙ্গে? সেই স্কম্ভকে বল, 'কে তিনি?'(২৫)

এই স্কম্ভ সর্বোচ্চ এক দেবতার প্রতিনিধি, কাজেই চোখের ওপরে যে সব ঘটনা স্থানে-কালে নিরন্তর নীরবে ঘটে চলেছে, মানবদেহে এবং বিশ্বচরাচরে যে সব অবয়বসংস্থান আছে, অথবা থাকার কথা, সেগুলি সম্বন্ধে যে সব প্রশ্ন চিন্তাশীল মানুষের মনে উত্থিত হয় সেগুলি এই স্কম্ভের সামনে উপস্থাপিত করা হয়েছে–সমাধানের আশায়। এ সব প্রশ্নের উদ্ভব সংশয় থেকে ততটা নয়, যতটা জিজ্ঞাসা ও কৌতুহল থেকে।

স্কম্ভের কল্পনা ও অথর্ববেদে এর সংযোজন কিছু পরবর্তীকালের। ততদিনে মানুষ সর্বাতিগ এক দেবতার কল্পনা করতে পেরেছে, যিনি অগ্নি, বায়ু, পর্জন্য, ইত্যাদির ঊর্ধ্বের্ব। অতএব এত দিন নানা দেবতা সম্বন্ধে নানা পর্যায়ে যত প্রশ্ন জমা হয়েছে তা-ই একগুচ্ছ প্রশ্নের আকারে এখানে উচ্চারিত। লক্ষণীয়, বিমূর্ত কতকগুলি ধারণা, শ্রদ্ধা, ব্রত, তপ এখানে স্থান পেয়েছে। সূক্তটি সম্ভবত উপনিষদ-যুগের, তাই ঔপনিষদিক কিছু প্রশ্ন এর মধ্যে স্থান পেয়েছে। 'কাল'। অথর্ববেদে একটি নতুন বিষয়; এখানে কাল সম্বন্ধে অংশত চেতনা ও প্রশ্ন–অর্ধমাস, মাস ও সংবৎসর সম্বন্ধে প্রশ্নের মধ্যে দিয়েই মহাকাল সম্বন্ধে মানুষের ধারণা এখানে প্রতিফলিত। প্রশ্নগুলি ক্রমশ দৃশ্যমান বস্তুজগৎ ছেড়ে অদৃশ্য বিশ্বচরাচরে ক্রিয়াশীল কিছু বিমূর্ত শক্তি সম্বন্ধেও। মানুষ এ সব কিছুই বোঝে না, কিন্তু সে অবহিত যে এ সবই বিশ্ববিধানের অন্তর্গত, এবং এ না বোঝার আকুতি এই সূক্তে স্পষ্ট ভাবে উচ্চারিত।

'দেবতাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে মূল প্রশ্নের কোনও সদুত্তর মেলে না; তাই কবি প্রশ্ন করেন: ইন্দ্র কোথা থেকে (এলেন)? সোম কোথা থেকে, অগ্নি কোথা থেকে জন্মালেন? তুষ্টা কোথা থেকে এলেন, ধাতা কোথা থেকে?...

ইন্দ্র থেকে ইন্দ্র, সোম থেকে সোম, অগ্নি থেকেই অগ্নি, তুষ্ট জন্মেছিলেন তুষ্ট থেকেই, ধাতা থেকে ধাতা।’(২৬)

এ প্রশ্নে প্রকারান্তরে ইন্দ্রের অস্তিত্বই অস্বীকার করা হল। আর এই ঋকে ইন্দ্র, সোম, অগ্নি, তুষ্ট ও ধাতার জন্ম বা উদ্ভব নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। এরা প্রত্যেকেই মুখ্য, পুরোনো দেবতা, বহু সূক্তে এঁদের স্তুতি আছে, অতএব এঁরা আছেন ধরে নিয়েই যজ্ঞে এঁদের আহ্বান ও স্তব করা হয়। এদের অস্তিত্ব স্বীকার করতে গেলে এদের উৎপত্তি বা জন্মও স্বীকার করতে হয়। এ ঋকে সেই প্রশ্ন: এদের উদ্ভব কোথা থেকে? কৌতুহল নিবৃত্ত করছে। পরবর্তী ঋক, সেখানে যে একটি মাত্র উত্তর সম্ভব তাই দেওয়া হয়েছে: যাদের উদ্ভব। আসলে মানুষের কল্পনাতেই, তাঁরা তো প্রকৃতপক্ষে আত্মসম্ভব, নিজেদের থেকেই নিজেরা উৎপন্ন হয়েছেন। অন্য ভাষায় এর অর্থ হল, এঁরা কল্পনাসঞ্জাত।

চক্ষুষ্মান মানুষ চারদিকে চোখ মেলে তাকিয়ে প্রকৃতির বহু ঘটনার উত্তর পায় প্রকৃতিকে ভাল করে লক্ষ করেই, ঠিক তেমনই আরও বহু ব্যাপারের কোনও সমাধান সে পায় না, না প্রকৃতিতে, না তার আপনি বুদ্ধির জগতে, না সে থাকে প্রাচীন মনস্বীদের স্মৃতিতে। অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যা যখন মেলে না। তখন মানুষ তার প্রশ্ন তুলে ধরে তার দেবতাদের উদ্দেশে, যে-দেবতাদের সে সৃষ্টি করেছে মানুষের চেয়ে সব দিক থেকে শ্রেষ্ঠ সত্তা হিসেবে। তাদের শ্রেষ্ঠত মেনে নিয়েই স্তব, তাদের শ্রেষ্ঠতা জেনেই প্রার্থনা, এবং প্রশ্ন:

‘বহুবিধ প্রিয় এবং অপ্রিয় (অভিজ্ঞতা), স্বপ্ন, উৎপীড়ন, শ্রান্তি, আনন্দ, আমোদ এ সব উগ্র পুরুষ কেন বহন করে? আর্তি, অভাব, অমঙ্গল, দুঃখ–এ সব মানুষের মধ্যে কোথা থেকে আসে? সমৃদ্ধি, ঐশ্বর্য, সার্বিক অভাব, চিন্তা, যন্ত্রণা— আসে কোথা থেকে?... এই পুরুষে কে বুপ সঞ্চার করল, কে দিল শরীরের ভার, আর নাম? কে (তাকে) দিল অগ্রগতি, বিচিত্র প্রকাশ, পুরুষকে

কে দিল চরিত্র? পুরুষে প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান কোন দেবতা আশ্রিত করলেন? কে পুরুষকে যজ্ঞ করতে দিলা? তার মধ্যে কে দিল সত্য, কে দিল মিথ্যা? কোথা থেকে এল মৃত্যু, কোথা থেকে অমৃত? কে একে দিল বাস, কে দিল আয়ু, কে দিল শক্তি, কে-ই বা দিল গতিবেগ?'(২৭)

মনে রাখতে হবে, এ সব প্রশ্ন যারা করছে তারা কোনও আদিম জনগোষ্ঠী নয়, মোটামুটি সভ্য পরিবেশে বাসকারী মিশ্র প্রাগার্য-আর্য এক জনগোষ্ঠী, যারা শুধু দীর্ঘকাল ধরে যজ্ঞই করছে না, দুটি ভিন্ন সংস্কৃতির সংঘর্ষে যাদের চিত্তে নানা প্রশ্ন স্পষ্ট বুপ পেয়েছে। প্রশ্নগুলি কী বিষয়ে? মানুষের দেহসংস্থান, মনের বিভিন্ন উপকরণ, বিচিত্র আবেগ, নানা অভিজ্ঞতা থেকে সঞ্জাত এ সব প্রশ্ন। এগুলির অধিকাংশই দর্শনের ধার ঘেঁষা: সত্যমিথ্যা, মৃত্যু, অমৃত কোথা থেকে এল, মানুষের ওপরে কোন দেবতা? মানুষের পরমায়ু নির্ধারণ করছে কে, তার শক্তি ও গতিবেগ আসে কার কোথা থেকে? প্রথমেই প্রশ্ন বিভিন্ন উপলব্ধি নিয়েপ্রিয় ও অপ্রিয় অভিজ্ঞতাগুলি, স্বপ্ন, নিশিজাগরণ, আনন্দ, উগ্র আমোদ এ সব মানুষ কেন বহন করে? অভিজ্ঞতাগুলি বাস্তব, চিরন্তন ও সর্বজনীন, অথচ এগুলো আসে কোথা থেকে? প্রথম এ সব প্রশ্ন জীবজগতে আর কারওরই নয়, একান্ত ভাবে মানুষেরই; দ্বিতীয়ত, চারদিকে তাকিয়ে মানুষ দেখেছে। এ সব অভিজ্ঞতা কোনও ব্যক্তিবিশেষের নয়, সকলেরই; তৃতীয়ত, সে লক্ষ করেছে দেহসংস্থান ও মনঃসংস্থান মোটামুটি ভাবে সব মানুষেরই একই রকম। তা হলে এ সব কিছু মানুষে আধান করল কে? কোন সে শক্তি যা নিয়ন্ত্রিত করে তার দেহমান, তার বুপ-অবয়ব, তার সুখদুঃখ, তার পরমায়ুর পরিধি, তার মৃত্যু–এবং তার অমৃত? অর্থাৎ মানুষ মানতে চাইছে না যে মৃত্যুতেই সকল অভিজ্ঞতার ইতি টেনে দেওয়া হয়। এ সব প্রশ্ন যেমন গভীর, তেমনই চিরকালীন। এবং ঠিক তেমনই অসমাধেয়। কোথাও এ সবের উত্তর নেই।

কিন্তু খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম-ষষ্ঠ শতকেই এ সব মানুষের মনে উদিত হয়েছে এবং উত্তর পাওয়া যাবে না বলে সে প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকেনি। ওই অথর্ববেদেই পড়ি: 'চোখ দিয়ে সকলেই দেখে, মন দিয়ে সকলে জানে না– পশ্যন্তি সর্বে চক্ষুষা ন সর্বে মনসা বিদুঃ।।' (১০:৮:১৪) অর্থাৎ এই যে সব প্রশ্ন মানুষের মনে উদিত হচ্ছে এর কারণ চোখ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দিয়ে সকলেই বাইরের জগতের তথ্যগুলি গ্রহণ করে। কিন্তু তার থেকে অনিবার্য ভাবে যে সব প্রশ্ন উত্থিত হয়, সেগুলির সমাধান মন দিয়ে পায় না। মোটামুটি প্রশ্নগুলি দু' ভাগে বিভক্ত: আমার দেহেমনে যা আছে, ঘটেছে, ঘটছে এবং আমার বাইরে বিশ্বপ্রকৃতিতে যা ঘটছে। সে সবের পেছনে কোনও নির্ধারক বা নিয়ন্তা আছে কি? থাকলে তাকেই এই প্রশ্ন। তাই স্কম্ভের কল্পনা, এই বিশ্বভুবনকে যিনি ধারণ করে আছেন। যেমন করে বাড়ি তৈরির আগে ভারবাহী বড় খিলানটা গাঁথা হয়, সেই থামের কল্পনা আরোপ করা হচ্ছে কল্পিত দেবতা স্কম্ভে। এর বৈশিষ্ট্য এই যে, থামের মাথা যেমন বাড়ির ছাদ পর্যন্ত প্রলম্বিত থাকে তেমনই এই দেবতার উর্ধগ্রভাগ ভুলোক ছাড়িয়ে দুর্লোকের দিকে প্রলম্বিত; সেই দুলোক, যেখানে মানুষের দৃষ্টি পৌঁছোয় না। অতএব দ্যুলোকের রহস্যেও স্কম্ভর অধিকার আছে, তাই তার কাছে কিছু দার্শনিক প্রশ্নও করা যায়; পরমায়ু কে নির্ধারণ করে, জীবন-মৃত্যু-অমৃতত্ব কে নিরূপণ করে? যে প্রশ্ন করছে সে-ও জানে এর উত্তর কোথাও মিলবে না, তবু অনুত্তরিত প্রশ্নের ভার তো মানুষকে নিরন্তর পীড়া দেয়, তাই তার সকল আর্তি নিয়ে সে আসে তার কল্পিত দেবতার কাছে।

এই সব প্রশ্ন কি সংশয়? যে ভাবে উচ্চারিত তাতে এগুলি শুধুই প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা। কিন্তু এগুলির মূলে আছে এক অসহায় নিরুদ্দিষ্ট সংশয়; মানুষ জানে যে সে শুধু প্রশ্নই করবে, সে-প্রশ্ন পৌঁছোবে না কোনওখানে, এখানে যে সব প্রশ্ন দেখলাম, তার বাইরে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন দেবতাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে।

যজ্ঞের প্রণালী, স্তব, নৈবেদ্য সব ঠিক হলেও এ সব যাঁদের কাছে পৌঁছাবে তাঁরা যদি সত্যিই থাকেন, তবেই তো যজ্ঞ থেকে যা চাওয়া হচ্ছে তা পাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে? 'দেবতারা তো মানুষের কল্পনা থেকে সৃষ্ট, তার বাইরে বাস্তবে তাঁরা কোথাও আছেন কি না তা জানিবার কোনও উপায়ই ছিল না। চারিদিকে চোখ মেলিলে দেখা যায় সৃষ্টি, মানুষ জানে সব সৃষ্টির স্রষ্টা বা কারণ থাকে। বীজ থেকে শস্য হয়, ডিম থেকে মাছ, পাখি, কীটপতঙ্গ, তা হলে এ সৃষ্টির বীজ কী, কর্তা কে? দেবতা সম্বন্ধে মানুষের ধারণা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় নয় 'যুক্তিতে (অনুমানে) অথবা মনের ক্রিয়াগুলি সম্বন্ধে ধ্যান থেকেও ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা জন্মায় না, বহির্জগৎকে লক্ষ করেও নয়।'(২৮) আমরা দেখেছি, বহু প্রধান দেবতাকে নিয়েই মানুষের মনে সংশয় ছিল। ঋগ্বেদের সর্বপ্রধান দেবতা ইন্দ্রকে নিয়ে এ সংশয় সংশয়ের স্তর ছড়িয়ে পৌঁছেছে নেতিবাদের স্তরে নেম ভার্গবের উক্তিতে: ইন্দ্রের উদ্দেশে সত্য স্তোম নিবেদন করা, হে অন্নকামী (বা সংগ্রামকামী) (ভক্ত)। যদি সত্য থাকে। নেম এ কথাও বলছে, ইন্দ্র নেই, কে (র্তকে) দেখেছে? কার অভিমুখে স্তব করব?(২৯)

দেবতাদের অস্তিত্ব নিয়ে মানুষের যে-সংশয় তার মধ্যে একটি হল: এই বিশ্বচরাচর কে সৃষ্টি করেছেন? বেদে নানা দেবতাকেই সৃষ্টিকর্তা বলা হয়েছে, প্রথমাংশে প্রধানত ইন্দ্রকে, পরের দিকে বৃহস্পতি, ব্রহ্মাণস্পতি, প্রজাপতি, ব্রহ্মন, হিরণ্যগর্ভ, ইত্যাদি দানা দেবতাকে। যাই হোক এদের মধ্যে কোনও একজনকে সৃষ্টিকর্তা ধরে নিলেও বিপত্তি আছে। যে-যুক্তিতে একজন সৃষ্টিকর্তাকে স্বীকার করতে হচ্ছে তা হল, সৃষ্টি যখন আছে তখন কেউ একজন স্রষ্টা থাকতে বাধ্য। এখন একজন সৃষ্টিকর্তা মানলে ওই যুক্তিতেই তাকেও সৃষ্ট বলে স্বীকার করতে হবে এবং তখন আবার ওই প্রশ্নই উঠবে সেই সৃষ্টিকর্তাকে কে স্বীকার করেছিল? তাঁর সৃষ্টিকর্তাকে? কাজেই পিছিয়ে যেতে যেতে

কোথাওই পৌঁছানো যায় না; ন্যায়শাস্ত্রে একে অনবস্থা' দোষ বলে। সেই অসুবিধা থেকেই যায় এবং প্রথম স্রষ্টার প্রশ্নটি অমীমাংসিতই থেকে যায়। এই কারণেই দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বলছেন, যাকে ভগবানের সৃষ্টি বলে মনে করা হয় সেই বেদও যদি বলে ভগবান পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তবুও সে উক্তিতে কোনও গুরুত্ব আরোপ করবার কোনও প্রয়োজন নেই।'(৩০) অর্থাৎ সৃষ্টির স্রষ্টা খুঁজতে গেলেই অনবস্থা-দোষ ঘটে, তাই ওই সিদ্ধান্ত অচল।

সৃষ্টি যে মৌলিক, ভৌতিক উপাদান থেকেই উদ্ভূত হয়েছে–কোনও দৈবশক্তির বা আত্মিক শক্তির সহায়তা ছাড়াই— এটা হল আধিভৌতিক বা ভূতার্থবাদী সৃষ্টিতত্ত্ব; এর বিপরীতটি অর্থাৎ কোনও দৈব বা আধ্যাত্মিক শক্তির দ্বারাই সৃষ্টি— এটা আধ্যাত্মবাদ। যখনকার কথা আলোচনা হচ্ছে, তখনকার মানুষ সচেতন ভাবে কোনও সৃষ্টিতত্ত্বই নির্মাণ করেনি; তবু কোনও দেবতাই স্রষ্টা, এ বোধ আর পাঁচটা প্রাচীন সভ্যতার মতো ভারতবর্ষেও প্রচলিত ছিল; এ নিয়ে যথার্থ দার্শনিক স্তরের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত অনেক পরের যুগে, দর্শনপ্রস্থানগুলির উত্থানের কালে হয়েছিল। ঋগ্বেদের যুগে প্রত্যক্ষ সৃষ্টি থেকে স্রষ্টার সন্ধান চলছিল, কারণ তাদের অভিজ্ঞতায় তারা দেখত, বীজ, অণ্ড বা কারণ ছাড়া কার্য, অর্থাৎ শস্য-বৃক্ষ বা অণ্ডজ প্রাণী হয় না; স্বভাবতই ওই স্তরের চেতনাতে ওই স্তরের প্রশ্ন এবং সমাধানই পাওয়া যাচ্ছিল। এই প্রশ্নটি তীব্রতম রূপ পেয়েছে। ঋগ্বেদের একেবারে শেষ পর্যায়ে বিখ্যাত 'অস্যবামীয়' সূক্তে (সূক্তটির প্রথম দুটি শব্দ 'অস্য বামস্য' থেকেই এই নামকরণ)। যে-প্রসঙ্গে কথাটা উঠেছিল, প্রত্যক্ষের জগতে সৃষ্টিকর্তর কোনও হদিস মেলে না, সেই প্রশ্নই এ সূক্তে এক জায়গায় উচ্চারিত সেই আদিমতম স্রষ্টার প্রসঙ্গে, 'কে তাঁকে প্রথম জন্মাতে দেখেছে?–কোঁ দদর্শ প্রথমং জায়মানম' (১:১৬৪:৪) যিনি বিশ্বচরাচরের আদিস্রষ্টা তিনি যদি কোনও ব্যক্তি হন তো নিরুক্তে যাস্ক যেমন বলেছেন, তারও একটা জন্মক্ষণ থাকবে। তখন কে তাঁকে জন্মাতে

দেখেছিল? প্রশ্নটা ওই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ প্রত্যক্ষের। উত্তর প্রশ্নকর্তা ও শ্রোতাদের মনে একটাই: কেউই দেখেনি; অর্থাৎ তার সত্তার সূচনার কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই। তা হলে তার অস্তিত্ব অনুমানসিদ্ধ। অনুমিতিতেও প্রমাণ হয়; কিন্তু সে একটি দীর্ঘতর প্রক্রিয়া, প্রতিপাদ্য থেকে সিদ্ধান্ত পর্যন্ত, যে-প্রক্রিয়া এখানে প্রয়োগ করবার কোনও অবকাশই নেই। ওই ঋকেই বলা হচ্ছে:

'যিনি জাত হচ্ছিলেন, নিজে অস্থিমান হয়েও অস্থিহীন কোনও সত্তা থেকে। তাঁর প্রাণ, রক্ত ও আত্মা ছিল। তিনি কোথায়, সেই প্রজ্ঞাবান জ্ঞাতাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করতে কে গিয়েছিল? অনভিজ্ঞ আমি প্রশ্ন করছি, কারণ আমি আমার মন দিয়ে এটা বুঝতে পারছি না, বুঝতে পারছি না দেবতাদের এই সব গুঢ় পদক্ষেপগুলি। (৩১)

এই ঋক দুটির মধ্যে একটি আর্তি প্রকাশ পেয়েছে, জিজ্ঞাসু মানুষ নিজের অজ্ঞতা, অভিজ্ঞতার অভাব খোলাখুলি স্বীকার করছে, বলছে, 'আমি জানি না, আমি আমার স্বল্পবুদ্ধিতে ধারণ করতে পারছি না। কিন্তু আর কেউ কি কোনও মনস্বী জ্ঞাতার কাছে। এ সব প্রশ্ন উপস্থাপিত করেছে, উত্তর পেয়েছে। এ সব প্রশ্নের? এই প্রখ্যাত 'অস্যবামীয়' সূক্তটির বাকি অংশ গুঢ় রহস্যের ভাষায় রচিত, যার কোনও সরাসরি অর্থ মেলে না। মেলার কথাও নয়, কারণ এর মধ্যে সৃষ্টি, বিশ্বচরাচর, দেবতারা এবং জীবন সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন আছে যেগুলো রহস্যের সান্ধ্যভাষায় রচিত। এখানে সমাধান নেই, বিভিন্ন ভাষ্যকার এবং সায়ণাচার্য যাই ব্যাখ্যা দিন না কেন। তা ছাড়া সায়ণাচার্য এ সব রচনার প্রায় আড়াই হাজার বছর পরে ব্যাখ্যা করছেন, বিজয়নগরে ব্রাহ্মণ্যবাদের পুনরভ্যুত্থানের এবং যজ্ঞক্রিয়ার পুনঃপ্রবর্তনের যুগে; তাঁর ভাষ্যে সব কিছুরই একটা বোধগম্য ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রবণতা আছে। ফলে যা দুর্জেয়–হয়তো রচয়িতার অভীষ্টই ছিল দুর্জেয় বুপেই তাকে সংরক্ষণ করা, কারণ তাঁর বোধেই হয়তো বিষয়টা স্পষ্ট ছিল না— সায়ণ তাকেও সুবোধ্য

ব্যাখ্যা দিতে তৎপর। ফলে ব্যাকরণ, অন্বয়, ইত্যাদি নিয়ে নানা কসরত তাকে এ নিয়ে করতে হয়েছে। এখন খোলাচোখে দেখলে অর্থ অতটা স্পষ্ট হয় না যতটা সায়ণ দেখাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু যেটা খুবই স্পষ্ট সেটা হল, প্রশ্নগুলোর গুরুত্ব, এ সব প্রশ্ন যে তখনকার মানুষের চেতনার মুলে গভীর ভাবে নাড়া দিয়েছিল সেটা খুব ভাল করেই বোঝা যায়। ওই রহস্যগুঢ় ভাষায় প্রশ্নগুলির সমাধান দেওয়ার চেষ্টাতেও একটি চেতনার সমস্যা ও তার ব্যক্তিগত উপলব্ধির সমাধান অন্তর্নিহিত রয়ে গেছে। ফলে দীর্ঘ সূক্তটিতে ঋষির উপলব্ধি গৌণ বা গূহ্য ভাষায় বুপ পেয়েছে, সমাধান বা উত্তরের বুপে নয়। ওই সূক্তেই আরও প্রশ্ন আছে:

'তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, পৃথিবীর শেষ কোথায়? জিজ্ঞাসা করি, পৃথিবীর নাভিমূল কোথায়? রেতোবষী অশ্বের রেতঃ সম্বন্ধে প্রশ্ন করি, সমস বাক্যের পরম আধার (স্থান) সম্বন্ধে প্রশ্ন করি। (উত্তর) এই বেদিই হল পৃথিবীর শেষ ভাগ, যজ্ঞ হল পৃথিবীর নাভি, সোম হল বর্ষণশীল অশ্বের রেতঃ, প্রজাপতিই হল ঊর্ধ্বতন আকাশে পরম বাক্য।'(৩২)

এখানে পর পর ঋক দুটিতে প্রশ্ন এবং উত্তরের ভঙ্গি আছে, কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়, উত্তরগুলি উত্তরই নয়, রূপক সমাধানমন্ত্র। এখানে প্রশ্নটি যথার্থই প্রশ্ন, অর্থাৎ কোনও অজ্ঞাত বিষয় জানিবার জন্যে উচ্চারিত। কিন্তু এখানে উত্তরগুলি অভিধাগত অর্থে উত্তরই নয়, গুঢ় সংকেতপূর্ণ রূপকমাত্র। অবশ্যই পৃথিবীতে বহু দার্শনিক জিজ্ঞাসার সমাধান কোনও কোনও মানুষের মনে আবছা একটা উপলব্ধির রূপেই প্রতিভাত হয়। আপাতদৃষ্টিতে যাকে উত্তর বলে পেশ করা হচ্ছে তা প্রকৃতপক্ষে উত্তর নয়।

এই রকম একটি নিগুঢ়ার্থযুক্ত সূক্তের নাম 'নাসদীয়' সূক্ত, অস্যবামীয়ের মতো এটিরও নামকরণ প্রথম শব্দ কাটির সমাহারে। এটির শুরু নাসদাসীন্নো

সদসসীৎ' দিয়ে। সায়ণাচার্য বলেছেন পরমেষ্ঠী নামক প্রজাপতি এ সূক্তটি রচনা করেন, এবং এর উদ্দিষ্ট দেবতা হলেন প্রজাপতি। এ সূক্তের শুরুতে শুনি, তখন অসৎ (অবিদ্যমান) ছিল না, বিদ্যমানও ছিল না, আকাশের নীচে কোনও আয়তন ছিল না, আকাশও ছিল না, কোথায় কী কাকে আবৃত করবে, গভীর গহন জলও ছিল না।'(৩৩) এখানে কবি যে-মুহূর্তটি কল্পনা করছেন তা হল সৃষ্টির আগেকার এই মুহূর্ত, যখন সৃষ্টিও ছিল না, সৃষ্টির কোনও উপাদানও ছিল না–সদাত্মকও নয়, অনস্তিত্ববাচকও নয়। তখন মহাকাশের ওপরে নীচে কিছুই ছিল না, আবৃত করবার কোনও বস্তুও ছিল না, কোনও উপাদানও ছিল না, আধারও ছিল না। সৃষ্টির প্রাক্কালের সেই মহাশূন্যে সেই সর্বউপাদানরিক্ত একটি অবস্থা কল্পনা করা হচ্ছে। পরের ঋকে সৃষ্টিরহস্য উদঘাটন করে বলা হচ্ছে, 'অন্ধকার দিয়ে প্রথমে অন্ধকার আবৃত ছিল। এ সমস্ত অজ্ঞেয় সলিল ছিল, বিদ্যমান ও অবিদ্যমান দিয়ে আবৃত ছিল (চরাচর); মহৎ তপস্যার দ্বারা 'এক সঞ্জাত হলেন।'(৩৪) বলা বাহুল্য, এ কল্পনার মধ্যে একটি বিশ্বচরাচরের রহস্য গুঢ় ব্যঞ্জনার দ্বারা অভিব্যক্ত হয়েছে, এর মধ্যে কবিত্ব অবিসংবাদিত ভাবেই আছে: অন্ধকার দিয়েই অন্ধকার ঢাকা ছিল... মহৎ তপস্যার দ্বারা 'এক সৃষ্টির আদিভূত সত্তার উদ্ভব হল। সমস্তটাই যতটা ব্যঞ্জনা-ঋদ্ধ ততটাই অভিধাবিরোধী; আবছা একটা বোধ জন্মায়, স্পষ্ট কোনও জ্ঞান জন্মায় না। জীবনের সবচেয়ে মৌলিক প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে হয়তো এর বেশি। স্পষ্ট ভাবে কোনও উত্তরই পাওয়া যায় না। তবু বলতেই হয় অনুত্তরিত এ প্রশ্নগুলি উচ্চারিত হওয়া অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এত গভীর দার্শনিক জিজ্ঞাসার উদ্ভব যে-কোনও প্রাচীন সভ্যতাকেই গৌরবান্বিত করে।

এই সুক্তে আর তিনটি ঋকের পরে ষষ্ঠ ঋকে আমরা অন্য প্রশ্নের সম্মুখীন হই। কবি বলছেন:

‘কে যথার্থভাবে জানে, কেই বা তা স্পষ্ট করে বলেছে, এই সৃষ্টি কোথা থেকে কোনখান থেকে জাত হয়েছে? ওই সৃষ্টির পরে (সৃষ্টি) দেবতারা অর্বাচীন হয়ে গেলেন; তাই কে জানে কোথা থেকে এ সৃষ্টি এসেছে? এই সৃষ্টি যার থেকে হয়েছে সে হয়তো ধারণ করেছিল, হয়তো বা ধারণ করেনি। উধর্বতম আকাশ যিনি এ সবের অধ্যক্ষ হয়তো তিনি জানেন, হয়তো বা (তিনিও) জানেন না।’(৩৫)

সৃষ্টি নিয়ে মানুষের বিস্ময়ের মূলই হল স্রষ্টা কে, সে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা। এ কথা কে জানে, কার পক্ষে জানা সম্ভব? যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনিই জানতে পারেন, কিন্তু ঋষির মনে তা নিয়েও সংশয়: তিনিও কি সত্যিই জানেন? অর্থাৎ সৃষ্টি এমন একটা বিরাট রহস্য, যার বৃত্তান্ত হয়তো স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাও জানে না। তিনি, সেই আদিম স্রষ্টা এমন মহনীয় যে, তাঁর উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গেই বাকি দেবতারা তার থেকে অর্বাচীন হলেন। তার পরে বাকি দেবতারা সৃষ্ট হলেন, অতএব দেবতাদের সকলের ওপরে তাঁর স্থান। এ কথা বলার পরেও বলা হচ্ছে সেই তিনিও হয়তো সৃষ্টিরহস্য জানেন না। এ উক্তির মধ্যে প্রাধান্য পাচ্ছে সৃষ্টি নিয়ে মানুষের গভীর সম্ভ্রম ও বিস্ময়, যেন কেউ, এমনকী স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাও বিষয়টি জানলে তাঁর মহিমা ক্ষুন্ন হয়।

এর পরের বিখ্যাত ‘প্রজাপতিসূক্তটির বিষয়বস্তু হল সৃষ্টির প্রাক্কালে প্রজাপতি নিজেকে যজ্ঞে উৎসর্গ করেছিলেন যজ্ঞে হননীয় পশুরুপে। সেই আদিমতম ক্ষণে:

‘কী পরিমাপ ছিল সে যজ্ঞের, কী আকৃতি ছিল, আজন্য কী ছিল, উপকরণ কী ছিল, কী ছিল পরিধি (কাষ্ঠনির্মিত যজ্ঞের উপাদান)? সে যজ্ঞের ছন্দ কী ছিল, প্রউগ নামক উকৃথি (স্তোত্র)-ই বা কী ছিল, যখন সমস্ত দেবতারা দেবতাকে (পশুরূপে হনন করে) যজ্ঞ করেছিলেন।’(৩৬)

পৃথিবীর অনেক দেশের অতিকথাতেই এমন একটি যজ্ঞকে সৃষ্টির আদিকারণ বলে অভিহিত করা হয়েছে যেখানে দেবতারা কোনও এক দেবতাকেই- অনুমান করা হয় তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দেবতাকেই–যজ্ঞে আতুতি দেন। এই মহৎ হাব্য দেওয়ার ফলে তার থেকেই এই মহান বিশ্বচরাচর সৃষ্ট হতে পেরেছিল যেহেতু কার্য (ফাল) কারণের (উৎপত্তিহেতু) অনুরূপই হয়। অন্যান্য যজ্ঞে অভীষ্ট ফল শুরুত্বে, স্থায়িত্বে, তাৎপর্যে ছোট মাপের। তাই সে সব যজ্ঞে অশ্ব, বলদ, মহিষ, ছাগ, মেষ ইত্যাদি বলি দিলে চলে, কিন্তু যেখানে যজ্ঞফল হল বিশ্বচরাচরের সৃষ্টি, সেখানে বলির জীবকে তো অনুরূপ ভাবে মহত্তম হতে হবে, অতএব স্বয়ং প্রজাপতিকে এখানে বলি দেওয়ার কল্পনা করা হয়েছে। সে তো হল, কিন্তু ওই মহাযাগের উপাদান, উপকরণ কী ছিল? যেখানে হাব্য স্বয়ং প্রজাপতি, শমিত ঋত্বিক স্বয়ং দেবতারা, সেখানে যজ্ঞের পরিধি, সীমা, পরিমাপ, ছন্দ, উকথ, ইত্যাদি যে কী হতে পারে সে পর্যন্ত সে কল্পনাই পৌঁছোয় না। তাই আবার একগুচ্ছ অনুত্তরিত, অসমাধেয় প্রশ্ন। যজ্ঞে স্তোত্র লাগে, হিব্য লাগে, তাই ঋষি হব্যের নির্দেশ দিয়ে যেন বলছেন, এমন মহাবিশ্বসৃষ্টিযজ্ঞে, স্বয়ং প্রজাপতি সেখানে হাব্য, সেখানে অনুরূপ উকৃথ, ছন্দ কেমন হবে, কে তা জানে? অর্থাৎ কেউ জানে না। অথচ সেই আদিম মাহেন্দ্রক্ষণ, সেই আদিমতম মহাযাগ, যার ফল বিশ্বসৃষ্টি—তার উপাদানও অবশ্যই মহত্তম হওয়া চাই। কিন্তু সে অবধি ঋষির কল্পনা পৌঁছোয় না বলেই প্রশ্ন রইল অনুত্তরিত। এবং এর নেপথ্যে অনুচ্চারিত যে প্রশ্ন, তা হল, তেমন কোনও যজ্ঞ কোনও দিন সত্যিই হয়েছিল কি? কে দেখেছে, কে জানে, কে সাক্ষ্য দেবে এই মহাযাগ অনুষ্ঠানের।

যেহেতু বীজ থেকে গাছ হয়, অর্থাৎ কারণ থেকে কার্য হয়, সেহেতু এই বিশ্বচরাচর-সৃষ্টি-বুপি কার্য থেকে অনুমান করতেই হবে যে, মহাকালের আদিম কোনও লগ্নে কোনও একটি ‘কারণ’ দেখা দিয়েছিল বা সংঘটিত

হয়েছিল যার কার্য হল সৃষ্টি। এবং সে যুগে যেহেতু যজ্ঞ-অনুষ্ঠানকেই সমস্ত কিছুর বীজ বা কারণ মনে করা হত, তাই সেই প্রথম সৃষ্টিও সম্ভব হয়েছিল কোনও এক মহা বিশ্ব-যজ্ঞ থেকে। এইটে মেনে নিলেও বাকি অংশগুলি আপনাআপনিই এসে যাবে: বিশ্বসৃষ্টির বলির পশুর অনুরূপ মাহাত্ম্য চাই। স্বয়ং প্রজাপতি ছাড়া আর কে-ই বা তা হতে পারে? ওই মহাযাগের ঋত্বিক-পুরোহিত-হোতাও অনুরূপ হওয়া চাই। অতএব, একমাত্র দেবতারাই এই পৌরোহিত্যের জন্যে উপযুক্ত বিবেচিত হতে পারেন। এর পরে থাকে ছাোট ছাোট অঙ্গ–ছন্দ, সাম, যুপকাষ্ঠ, বেদির মাপ, ইত্যাদি কিন্তু এত সব কে তখন দেখেছিল, খেয়াল করেছিলা? অতএব ওগুলো রইল প্রশ্ন হিসেবেই, উত্তর মিলল না। কিন্তু তার সঙ্গে মূল প্রশ্নও রইল অনুত্তরিত: সমস্ত যজ্ঞটাই বা কবে কখন কীভাবে ঘটেছিল, কে তা জানে?

পৃথিবীর প্রায় প্রাচীন অতিকথাতেই একটি আদিমতম যজ্ঞের কল্পনা আছে; কারণ যজ্ঞই ইষ্টফল সৃষ্টি করে, অতএব সৃষ্টির আদিতে তেমন এক যজ্ঞ না থাকলে এই বৃহৎ বিশ্বচরাচর সৃষ্টি হল কেমন করে? সেই আদিম যজ্ঞই পরবর্তী সকল যজ্ঞের প্রথমতম আকল্প; এবং দেবতারা তা সম্পাদন করেছিলেন বলে তা স্বভাবতই ফলপ্রসূত হয়েছিল, বিশ্বসৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল। বেদের ব্রাহ্মণসাহিত্য, যার প্রথম অংশ এই সব সূক্তের সমকালীন, তাতে বারেবারেই দেখি দেবাসুরের যুদ্ধে প্রথমে দেবতারা পরাজিত হচ্ছেন। পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে তাঁরা আসছেন প্রজাপতির কাছে নালিশ করতে। তখন প্রজাপতি তাদের একটি নতুন যজ্ঞের নির্দেশ দিচ্ছেন; বলছেন, প্রাচীনকালে দেবতারা অনুরূপ সমস্যার সমাধান করেছিলেন এই যজ্ঞটির অনুষ্ঠান করে, দেবতারা সেই নবলব্ধ যজ্ঞ দ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধ করছেন।

যে-সমাজে এই কথা বারবার উচ্চারিত হচ্ছে, সেখানে মানুষ বিশ্বাস করবেই যে, সকল সমস্যার সমাধান করতে পারে যজ্ঞ, সকল প্রয়োজনীয় সৃষ্টির মূলেই

যজ্ঞ। তাই যদি হয়, তা হলে, বিশ্ব যখন সৃষ্টি হয়নি, তখন সে সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল কোনও একটি মহৎ চিরকালীন তাৎপর্যপূর্ণ যজ্ঞের অনুষ্ঠানের দ্বারা। এমন যজ্ঞে পশু স্বভাবতই শ্রেষ্ঠ দেবতা, ঋত্বিকরাও দেবতা। এবং সেই শ্রেষ্ঠ দেবতা নিজেকে পশুরুপে উৎসর্গ করে হনন করলে পর সম্ভব হয়েছিল মহাকালের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি–বিশ্বসৃষ্টি। এখানে রহস্যের সমাধান না হোক, কল্পনার মহনীয়তা স্পষ্টই লক্ষ করা যায়।

দশটি ঋকে রচিত 'প্রজাপতিসূক্ত' যার অপর নাম হিরণ্যগর্ভসূক্ত'। এর প্রথম ঋকেই বলা হচ্ছে:

'প্রথমে হিরণ্যগর্ভ ছিলেন, (বা হলেন)। যিনি জাতমাত্রই সমস্ত জীবজগতের অধিপতি হন, তিনি আকাশ ও পৃথিবীকে ধারণ করেছিলেন। কোন দেবতাকে হবি দিয়ে পরিচর্য করব? তিনি আমার দাতা, বলের দাতা, যাঁর শাসন সমস্ত দেবতারা উপাসনা করেন, অমৃত ও মৃত্যু যাঁর ছায়া, কোন দেবতাকে. ॥ যারা শ্বাস নেয়, চোখের নিমেষ ফেলে তাদের সকলের উপরে যিনি আপন মহিমায় সমস্ত পৃথিবীর রাজা হয়েছিলেন, দ্বিপদ ও চতুষ্পদদের ওপরে যাঁর প্রভুত্ব, কোন দেবতাকে. । হিমালয় প্রভৃতি পর্বতগুলি যাঁর মাহাত্ম্য, সমুদ্র-সহ সমস্ত জলাধার যার, দিক ও উপদিকসমূহ যাঁর দুটি বাহু, কোন দেবতাকে...।। যিনি আকাশ ও পৃথিবীকে, স্বর্গকে এবং আদিত্যকেও দৃঢ় করেছেন, অন্তরিক্ষে যিনি জলের নির্মাতা, কোন দেবতাকে...।। দীপ্যমান আকাশ ও পৃথিবী যার সুরক্ষায় মনে মনে নিজেদের সুরক্ষিত জেনেছে, উদিত সূর্য যাঁর উদ্ধের্ব বিভাত হয়, কোন দেবতাকে.। যিনি দেবতাদের একমাত্র অধিদেবতা ছিলেন, কোন দেবতাকে... । যিনি পৃথিবীর জনক, যে সত্যধর্ম আকাশের জন্ম দিয়েছেন, যিনি বিপুল উজ্জ্বল জলরাশির স্রষ্টা, কোন দেবতাকে. হে প্রজাপতি, তুমি ভিন্ন অন্য কেউই সমগ্র জাত মাত্রের এই বিশ্বকে

ব্যাপ্ত করেনি, যে কামনা নিয়ে আমরা হোম করছি, তা আমাদের (অধিগত) হোক আমরা যেন পুথিবীর ধর্মসমূহের অধিপতি হই।।'(৩৭)

এই প্রখ্যাত সূক্তটিকে প্রজাপতি সূক্ত বলা হয়; সম্ভবত এই কারণে যে, এর শেষ ঋকে প্রজাপতিকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, তুমি আমাদের সকল প্রার্থনা পূরণ কর। এখানে অনেকগুলি বিষয় লক্ষ করবার মতো: সমস্ত সূক্তটির মধ্যে অন্য কোথাও কোনও প্রার্থনা নেই, এবং এই শেযতম ঋকে সূক্তের বাকি নাটি ঋকে যে ধ্রুবপদ–কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম— সেটি অনুপস্থিত। তা ছাড়া প্রজাপতি বলে এখানে দেবতাকে আহ্বান করা হলেও বাকি অংশের যে দেবতা তিনি পরিচিত প্রজাপতির গুণ ও ক্রিয়ার অনেক উন্ধের্ব। সমস্ত সূক্ত জুড়ে যে দেবতার পরিচিতি তিনি মহাবিশ্বের শ্রেষ্ঠ, সর্বোচ্চ এবং একমাত্র অধিষ্ঠাতা, সকল সৃষ্টির একমাত্র স্রষ্টা। এ কথা সত্য যে, ঋগ্বেদের ঋষিদের একটি প্রবণতা ছিল যে, যখন যে দেবতাকে উদ্দেশ করে স্তব করা হয় তখনকার মতো সেই দেবতাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলেই অভিহিত করা হয়।' তা সত্ত্বেও চোখে পড়ে যে, এমন করে সূক্ষ্ম, প্রায় পারমাণবিক স্তরে তুলে ধরে সর্বস্রষ্টা বলে কোনও দেবতাকে বর্ণনা করা হয়নি। আর বিস্ময় সেইখানেই; রচয়িতা ঋষি যাঁকে এত মহান, সর্বশক্তিমান, আকাশপৃথিবী সমুদ্রপর্বত দ্বিপদ-চতুস্পদের স্রষ্টা এবং সমগ্র বিশ্বভুবনের একমাত্র অধিপতি (ভুতস্য জাতঃ পতিরেকঃ) বলে জানেন, সেই ঋষিই নটি ঋকের শেষে একটিই ধ্রুবপদ করছেন, 'কোন দেবতাকে হবি দিয়ে উপাসনা করব?' স্বভাবতই মনে হয়, এই দেবতাকেই তো হবির্দান করা চলে, প্রশ্ন কীসের?

এখানে দুটো বিষয় লক্ষ করবার আছে। প্রথমত, এই যে প্রশ্ন, কোন দেখতাকে হবি দেব, তার সঙ্গে ওই নটা ঋকের বাকি বক্তব্যের কোনও সংগতি নেই। প্রত্যেক ঋকের প্রথম তিনটি চরণে এক শ্রেষ্ঠ দেবতার স্তব করা হচ্ছে, নানা ভাবে এবং শেষে সমস্ত যুক্তির সংগতি ও ধারাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে।

অকস্মাৎ প্রশ্ন করা হচ্ছে কাকে হবির্দান করব। এই অসংগতি এত মৌলিক যে, সায়ণাচার্য থেকে আরম্ভ করে অনেক ভাষ্যকারই বলেছেন, ওই 'কস্মৈ'-এর অর্থ হল 'প্রজাপতিকে, অর্থাৎ 'ক' শব্দটির অভিধাগত অর্থই হল প্রজাপতি, কাজেই ওই বাক্যাংশটি কোনও প্রশ্নই নয়, একটি উক্তিমাত্র: 'প্রজাপতিকে হাব্য দিয়ে আরাধনা করব।' সুবিধেও আছে: শেষ ঋকে প্রজাপতিকে সম্বোধন করে প্রার্থনা জানানো হয়েছে এবং সম্ভবত সেই কারণেই, সূক্তটির নামও দেওয়া হয়েছে প্রজাপতি সূক্ত, স্বভাবতই এ সূক্তে প্রজাপতিই দেবতা এবং প্রতি ঋকে তাকেই হবি দেওয়ার কথাই আছে। এ সব দুয়ে দুয়ে চার হয়ে মিলে গেলেও কিছু মুশকিল যে ছিল তার প্রথম প্রমাণ, ব্রাহ্মণশাস্ত্রে এই সূক্তটির উদ্ধৃতিতে দেখছি, 'তস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম', অর্থাৎ 'সেই দেবতাকে হাব্য দিয়ে উপাসনা করব।' এতে কোনও গোলমাল থাকে না; প্রতি ঋকে যে মহান দেবতার বর্ণনা করা হয়েছে তিনটি চরণে, শেষ চরণে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তাকেই হবির্দান করো। এই পরিবর্তনটিই কিন্তু প্রমাণ যে, কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম' নিয়ে কিছু মনীষীর মনে অনুপপত্তির সংশয় জেগেছিল, তাই এই সমাধান। বলা বাহুল্য, ব্রাহ্মণসাহিত্যে এ পরিবর্তন কিন্তু ঋগ্বেদের 'কস্মৈ'-কে স্পর্শ করল না, সেখানে অসংগতি রয়েই গেল।

সে অসংগতি কী? এটা ব্যাকরণের: নামপদ বা বিশেষ্য অকারান্তে শব্দের চতুর্থী একবচনের রূপ হত 'কায়া' (যেমন নরায়), অর্থাৎ 'ক' মানে যদি প্রজাপতি হত। শুধুমাত্র তাহলেই 'ক' নামপদ হত, এবং সে ক্ষেত্রে 'প্রজাপতির জন্যে বা তার উদ্দেশে' এই অর্থে চতুর্থ একবচনে হত 'কায়'। কস্মৈ স্পষ্টতই সর্বনাম শব্দরূপ, যেমন ব্রাহ্মাণে তস্মৈ, মানে 'তাঁর জন্যে বা তার উদেশে'। ভাষ্যকারীদের ওই কসরত ব্যাকরণের ধোপে টেকে না। এ সূক্তটির কেন্দ্রীয় দেবতা প্রায় নিরাবয়ব উষ্ণমার্গের একটি ভাবসত্তা, নিয়ম অনুসারে এ সূক্তটির নাম হওয়া উচিত ছিল 'হিরণ্যগর্ভ' সূক্ত, কিংবা 'নাসদীয়া' বা

‘অস্যবামীয়’ সূক্তের মতো প্রথম পদগুলির সমাহারে ‘হিরণ্যগর্ভঃ সমাবর্তত সূক্ত। তা না করে শেষ ঋকটি, যেটি সমস্ত সূক্তটির সঙ্গে তাৎপর্যগত ভাবে প্রায় অসম্পৃক্ত, সেটির খাতিরে এটিকে প্রজাপতিসূক্ত’ বলা হয়েছে। ভাষ্যকারীদের বিশেষ সুবিধে হয়েছে গায়ের জোরে ‘ক’ মানে ‘প্রজাপতি’ বলা ব্যাকরণের প্রাথমিক নিয়মকে অগ্রাহ্য করে।

এখন প্রশ্ন থাকে, তা হলে ওই ভাবে প্রত্যেক ঋকের প্রথম তিনটি চরণের সঙ্গে অসম্পৃক্ত চতুর্থ চরণটি ধ্রুবপদ হয়ে উঠল। কেন? এ প্রশ কি যথার্থই প্রশ্ন? ঋষি কি সত্যিই জানতে চাইছেন, কাকে হবির্দান করব? এ সূক্তটি দশম মণ্ডলের, অর্থাৎ ঋগ্বেদ সংকলনের শেষ পর্যায়ের। এর মধ্যে খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চদশ শতক থেকে দশম শতকের মধ্যে বিস্তর নতুন নতুন দেবতা যুক্ত হয়েছে, দেবমণ্ডলী ধীরে ধীরে আঞ্চলিক ও কালিক দেবীসমাগমে এত স্ফীত হয়েছে যে, শেষ দিকের বেশ কিছু সূক্তের দেবতা ‘বিশ্বে দেবাঃ’ অর্থাৎ ‘সমস্ত দেবতাদের উদ্দেশে’। যদিও এ সব সূক্তেই কিছু কিছু ঋকে বিশিষ্ট দেবতার নামও করা আছে। তবুও সমাহারে একত্র একটি দেবসমাবেশ কল্পনা করা হয়েছে। দেবতা বেড়েছে, যজ্ঞও বেড়েছে, জটিলতাও বেড়েছে, বিশেষ বিশেষ দেবতার উদ্দেশে বিশেষ বিশেষ পশু ও হব্যের বিধানও দেখা দিয়েছে। এই পটভূমিকাতে দেখতে হবে এই সূক্তটিকে, যেটি আদৌ প্রজাপতিসূক্ত নয়। প্রথম মণ্ডলের প্রথমাংশ এবং দশম মণ্ডলের শেষ দিকে বেশ কিছু প্রায় নিরাবয়ব ও নির্ব্যক্তিক দেবতা এসেছেন, যেমন পরমাত্মন, কাল, বৃহস্পতি, ব্রহ্মণস্পতি (এই যুগেই অথর্ববেদের স্কম্ভও দেখা দিয়েছেন)। এঁদেরই মধ্যে প্রধান এই হিরণ্যগর্ভ, যিনি মূলত নির্ব্যক্তিক, কিন্তু পূর্বতন সকল স্রষ্টার ওপরে যাঁর স্থান, কারণ তিনি শুধু বিশ্বচরাচর নয় ওইসব দেবতাদেরও স্রষ্টা। তখন যজ্ঞ চলছে, বিশেষ বিশেষ দেবতাকে আহ্বান করে, আবার দলবদ্ধ ভাবে ‘বিশ্বে দেবাঃ’কেও আহ্বান করে। এই সময়ে যখন কোনও ঋষির উপলব্ধিতে এমন

এক দেবাদিদেব সর্বভূতের আদিস্রষ্টা দেবতা উদিত হন, তখন তার দুটো প্রশ্ন জাগে: যেহেতু ইনি আর সকলের ঊর্ধ্বে, তাই এর উপযুক্ত হব্য কী তা কীভাবে অনুমান করব। একে কী দিয়ে তৃপ্ত করব? দ্বিতীয়ত, এত যে দেবতা দেবমণ্ডলীতে, ইনি তো তাদের একজন নন, অথচ ইনিই শ্রেষ্ঠ, প্রধানতম, আদিমতম। এমন কোনও দেবতা যেহেতু পূর্ববর্তীর্ণ ঋষিদের কল্পনায় ছিল না। তাই এর সম্বন্ধে ভাবতে গিয়ে তো মনে হবেই এমন সর্বতিগ এক দেবতা থাকতে, যজ্ঞে হবি দেব কোন দেবতাকে? তাই প্রত্যেক ঋকের প্রথম তিন চরণে এর নৈর্ব্যক্তিক অথচ সর্বতিশয়ী গুণ, কৃতি ও ক্ষমতার কথা বলে ঋষি প্রশ্ন করছেন, তাহলে হবি দেব কোন দেবতাকে?' বলা বাহুল্য, এ প্রশ্নের উত্তর নেই, তাই শেষ ঋকে পরিচিত পদ্ধতিতে প্রজাপতিকে আহ্বান করে তাঁর কাছে অভ্যস্ত ঐশ্বর্যের জন্য প্রার্থনা করা হল।

———————

(১) তৎ কাবশ্বিানো দ্যাবাপৃথিব্যাবিত্যেকে অহোরাত্রাবিতোকে সূর্যচন্দ্রমসাবিত্যেকে রাজানৌ

পুণ্যকৃতাবিতৌতিহাসিকাঃ। (১২:১:৫-৮)

(২) কেদানীং সূর্য্য কশ্চিকেত কতমাং দ্যাং রশ্মিরস্যা ততান। ঋগ্বেদ (১:৩৫:৭)

(৩) ক্ব স্য বীরঃ কো অপশ্যদিন্দ্রম। ঋখেদ (৫:৩০:১)

(৪) কা তে নিযক্তিঃ কিমুনো মমৎস্যি। ঋগ্বেদ (৪:২১:৯)

(৫) কুত্রা চিদস্য সমূতৌ রথা নৃষদনে। ঋখেদ (৫:৭:২)

(৬) জীবান্নো অভি ধৌতনাদিত্যাসঃ পুরাহ থাৎ। কন্ধ স্থা হবনশ্রুতঃ।। ঋগ্বেদ (৯:৬৭:৫)

(৭) কো হা কস্মিল্লিসি শ্রিতঃ।। (১:৭৫:৩)

(৮) কা ত উপেতির্মানসো বরায় ভুবদগ্নে শংতম কা মনীষা। কো বা যজ্ঞৈঃ পরি দক্ষং ত আপ কেন বা তে মনসা দাশেম। (১.৭৬.১)

(৯) কথা শৃণোতি হুয়মানমিন্দ্রঃ কথা শৃঙ্খান্নবসামদ্য বেদ। কা অস্য পূবীবুপমাতায়ো হ কথৈনমাহুঃ পুখুরিং জরিত্র। (৪.২৩.৩)

(১০) অসী যে দেবাঃ স্থান ত্রিম্বা রোচনে দিবঃ।। কদ্ধ ঋতং কদনুতং কি প্রত্না বা আহুতির্বিত্তং মে অস্য বোদাসী। (১.১০৫.৫)

(১১) কন্ধ ঋতস্য ধর্ণসি কন্দ্বরুণস্য চক্ষণম। কদর্যমণো মহস্পথতি ক্রামেম দূঢ্যো, বিত্তং মে অস্য রোদসী। (১.১০৫.৬)

(১২) কে রাধদ্ধোত্রাখিনা বাং কো বাং জোষ উভয়োঃ। কথা বিধাত্যপ্রচেতাঃ।। (১:১২০:১)

(১৩) কিমুনো মমৎসি কিং নো দুদু হর্ষদে দাতবা উ। (৪:২১:৯)

(১৪) ‘Theodicy originally referred to theories that sought to explain how an all-powerful and al-good God can permit evul in the world.’–Peter Berget, p. 36

(১৫) কস্মৈ দেবা। আবহানাশ্ম হোম কো মাংসতে বীতিহোত্রঃ সুদেবঃ।। (১:৮৪:১৮)

(১৬) যজ্ঞং পৃচ্ছাম্যবমাংস তদুত বি যোচেতি। ক ঋতং পূর্বং গতং কস্তদ্বিভর্ত্তিনূতনং বিত্তং মে অস্য রোদসী। (১.১০৫.৪)

(১৭) কয়া তচ্ছথে শচ্যা শচিষ্ঠে যায়া কৃণোতি মুহু কা চিদৃশ্বঃ। পুরু দাস্ত যে বিচয়িষ্ঠো অংহোহথ দধতি দ্রবিণং জরিত্রে। (৪:২০:৯)

(১৮) প্র সুস্তোমং ভরত বাজয়ন্ত ইন্দ্রায় সত্যং যদি সত্যমস্তি। নেন্দ্রো অস্ত্রীতি নেম উ ত্ব আহক ঈং দদর্শ কমভি ষ্টবাম। (৮:১০০:৩)

(১৯) যং স্মা পৃচ্ছতি কুহ সেতি ঘোরামুতেমাহুর্নৈষো অস্তীত্যেনমসো অর্থঃ পুষ্টার্বিজ। আমিনাতি শ্রদস্মৈ ধাত্ত স। জনাস ইন্দ্রঃ।। (২:১২:৫)

(২০) আমার The Indian Theogony, Penguin, 2000; -এ ‘ইন্দ্র’ অংশ ‘ইন্দ্র’ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

(২১) ‘This skepticism is about the existence of a god, even the king of the gods, and the cmergence of impersonal conceptions of the ultimate ground of the universe is not yet atheism. Such conceptions have yet to advance arguments that belief in god is a false belief Such arguments begin to appear where emerging theistic conceptions of God and conceptions of the absolute source and ruler of the world confront one another as philosophical options over an extended period of time.’–Macmillan Encyclopaedia of Religion. Atheism’. p. 481

(২২) কলছন্দসাং যোগমা বেদ ধীরঃ কে ধীরং প্রতি বাচং পপাদ্য।
কমৃত্বিজামষ্টমং শূরমাঙ্গুহঁরী ইন্দ্রস্য নি চিকায় কঃ স্বিৎ।। ১০.১১৫.৯

২৩. ক উ শ্রবৎ কতমো যজিয়ানাং বন্দারু দেবঃ কতমো জুবাতে। কস্যোমাং দেবীমমৃতেষু প্রেষ্ঠাং হৃদি শ্রেষ্যাম সুষ্টুতিং সুহব্যাম। (৪:৪৩:১)

২৪. কস্তে জমির্জনানামগ্নে কো দাশগ্রধবরঃ। কো হি কস্মিন্নসি শ্রিতঃ।। (১:৭৫:৩)

(২৫) কস্মিন্নসঙ্গে তপ অস্যাধি তিষ্ঠতি কস্মিন্নঙ্গে ঋতমস্যাধ্যাহিতমা কি ব্রতং কৃ শ্রদ্ধাস্য তিষ্ঠতি কস্মিন্নঙ্গে সত্যমস্য প্রতিষ্ঠিতম। কস্মাদঙ্গাব্দীপ্যতে অগ্নিরস্য কস্মাদঙ্গাৎ পবতে মা িতরিন্থা। কস্মাদঙ্গাদ্বিমীতেহধি চন্দ্রমা মহ স্কম্ভস্য মিমানো অঙ্গম। কস্মিন্নঙ্গে তিষ্ঠতি ভূমিবস্য কস্মিন্নঙ্গে তিষ্টিত্যন্তরিক্ষম। কস্মিন্নঙ্গে তির্ষ্ঠিত্যাহিতা দৌঃ কিস্মিন্নঙ্গে তির্ষ্ঠিতৃত্যুত্তরং দিবঃ। কং প্রেপ্সন দীপ্যতে ঊর্ধ্বের্ব অগ্নিঃ কিং প্রোপ্সন পাবতে মাতিরিন্থা . কার্ধমাসা কি যান্তি মাসাঃ সংবৎসরেণ সহ সংবিদ্যানাঃ।। (১০:৭:২-৫)

২৬. কুন্ত ইন্দ্রঃ কুতঃ সোমঃ কুতো অগ্নিরজায়িত। কুতন্তুষ্টঃ সমভুবৎ কুতো ধাতাত্বিজায়িত। ইন্দ্রাদিন্দ্রঃ সোমাৎ সোমো আগ্নেয়গ্নিরজায়ত। তুষ্টা হা জজ্ঞে তুষ্টুর্ধাতুর্ধাতাজায়িত। অথর্ব বেদ (১১:৮:৮৯)

(২৭) প্রিয়াপ্রিয়াণি বহুলা স্বপ্নং সবাধমতন্দ্র্যঃ। আনন্দানুগ্রো নন্দাংশ্চ কম্মাদ্বাহতি পুরুষঃ। আর্তিরবর্তিনিঋতি কুতো নুপুরুষেই মতিঃ। রাব্ধিঃ সমৃদ্ধির বৃদ্ধির্মতিবুদিতয়ঃ কুতু।. কোহস্মিন বুপং ব্যদর্ধাৎ কো মহ্যা িনং চ নাম চ। মাতুং কোৎস্মিনকঃ কেতুং কশ্চারিত্রাণি পুরুষে। কোহস্মিন প্রাণমবধৎ কো অপনিং ব্যানমু। সমানমস্মিন কো দেবোহবি পুরুষে শিশ্রায়। কোহস্মিন যজ্ঞমদধাৎ কো দেবোহধি পুরুষে। কোহস্মিন সত্যং কোহিনৃত্যং

কুতো মৃত্যুঃ কুতোহ মৃতম। কোহস্মিন বাসঃ পর্ষদধাৎ কোহস্যায়ুরকল্পয়ং বলং কোহ স্মৈ প্রাযৈচ্ছৎ কে অস্যাকাল্পয়ঞ্চবম। অথর্ব বেদ (১০:২:৯-১৫)

(২৮) 'Man's knowledge of God was inferential, being not derived either by meditating on the operations of his own mind, or by observing the process of external nature.'– Dictionary of the History of lateas, mp. 302

(২৯) প্র সুস্তোমং ভরত, বাজয়ন্ত ইন্দ্রায় সত্যং যদি সত্যমস্তি। নেন্দ্রো অতীতি নেম উ ত্ব আহক ঈং দদর্শ কমভি ষ্টবাম।।ঋগ্বেদ (৮.১০০.৩)

(৩০) 'If the Vedas, considered to be the work of God, say that God is the creator of the world, no value need be attached to the statement.'–DP Chattopadhyaya, 1964, Wol il, p. 25

(৩১) কে দদর্শ প্রথমং জায়মানমস্থন্বন্তং যদনস্থা বিভর্তি। ভূম্যা অসুরসৃগাত্মা ক স্থিাৎ কো বিদ্বংসমুপ গাৎ প্রস্টুমেতৎ। পাকঃ পৃচ্ছামি মনসাবিজানন দেবানামেনা নিহিতা পদানি। (১:১৬৪:৪,৫)

(৩২) পৃচ্ছামি ত্বা পরমন্তং পৃথিব্যাঃ পৃচ্ছামি যাত্র ভুবনস্য নাভিঃ। পৃচ্ছামি ত্বা বৃষ্ণো অশ্বস্য রেতঃ পৃচ্ছামি বাচঃ পরমে বোম। ইয়ং বেদি পরো অন্তঃ পৃথিব্যা অয়ং যজ্ঞো ভুবনস্য নাভিঃ। অয়ং সোমো বৃষ্ণো অশ্বস্য রেতো। ব্রহ্মায়ং বচঃ পরামং ব্যোম। ঋগ্বেদ (১:১৩৪:৩৪, ৩৫)

(৩৩) নাসদাসীনো সদাসীত্তদানীং নাসীন্দ্রবে। নে বোমা পরে যৎ। কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্মন্নম্ভঃ কিমাসীদ গহনে গভীরম। ঋগ্বেদ (১০:১২৯:১)।

(৩৪) তম আসীত্তমসা গূঢ়মগেহপ্রকেতং সলিলং সর্বসা ইদম। তুচ্ছ্যেনাম্বে পিহিতং যদাসীত্তিপসস্তৎ মহিনাজায়তৈকম। (১:১২৯:২)

(৩৫) কে অদ্ধা বেদ কাইহ প্র বেচিৎ কুত আজাত কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ। অর্বাগে দেবা অস্য বিসর্জনেনাথ কো বেদ যত আব্বভুব। ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আব্বভুব যদি বা দধে। যদি বা না। যে অসাধ্যক্ষঃ পরমে বোমনং সো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ।। (১:১২৯,৬,৭)

(৩৬) কাসীৎ প্রমা প্রতিমা কিং নিদানামাজ্যং কিমাসীৎ পরিধিঃ ক আসীৎ ছন্দঃ। কিমাসীৎ প্রউগং কিমুকথং যদেবা দেবমজান্ত বিশ্বে। (১০:১০৩:৩)

(৩৭) হিরণ্যগর্ভঃ সমাবর্ততাগ্রে ভুতস্য জাত পতিরেক আসীৎ। স দাঁধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম । যি আত্মদা বলদ যস্য বিশ্ব প্রশিষ্যং যস্য দেবাঃ। যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ কস্মৈ...। যঃ প্রাণতো নিমিষতোহাত্র মহিত্বৈক ইদ্রাজা জগতো বভুব। যি ঈশে অস্য দ্বিপদশচতুষ্পদ, কাস্মৈ...। যস্যোমে হিমবন্তো মহিত্না যস্য সমুদ্রং রসায়া সহায়ুঃ।। যস্যেমাঃ প্রদিশো যস্য বাহু কস্মৈ...। যেন দৌ বুগ্রা পৃথিবী চ। দৃলিহা যেন স্বঃস্তভিং যেন নাকঃ। যো অন্তরিক্ষে রাজসো বিমানঃ কস্মৈ...। যং ক্রন্দসী অবসা তস্তভানে অভ্যৌক্ষেতাং মনসা রোজমানে। যাত্রাধি সুর উদিতো বিভাতি কস্মৈ. । ততো দেবানাং সমাবর্ততাসুরেকঃ কস্মৈ...।। যো দেবেষ্বধি দেব এক আসীৎ কস্মৈ।। প্রজাপতে ন ত্বদেবতান্যন্যো বিশ্বা জাতানি পরি তা বভুব।

যৎকামাস্তে জুহ্বমস্তন্নো অস্তু বযং স্যাম পতয়ো রয়ীণাম। ।(১০:১২১:১-৮, ১৩)

(৩৮) হ্বিন্টারনিৎস তাঁর Ancient laudian Literature, Vol -এ এ প্রবণতাকে herotheism বা Kathenotheism বলেছেন।

মৃত্যু ও সংশয়

যজুর্বেদ যজ্ঞ অনুষ্ঠানের সংহিতা, সেখানে এ-জাতীয় চিন্তা বা প্রশ্নের অবকাশ নেই। তবু তৈত্তিরীয় সংহিতায় এক জায়গায় পড়ি, 'এই লোক থেকে (মনুষ্যলোক থেকে) ভাল ভাবে আসতে হবে। এ কথা বলেছেন (তীর), কে তা জানে যে ওই লোকে (= পরলোকে) (কিছু) আছে বা নেই।'(১) যজুর্বেদের কিছু অংশ ঋগ্বেদের সমসাময়িক, কিছু অংশ হয়তো পরে রচিত। ঋগ্বেদের দশটি মণ্ডলের শেষটিতে বেশ কয়েকটি সূক্ত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত। যম সম্বন্ধে অথর্ববেদে বলা হয়েছে, মর্ত্য (মানুষদের) মধ্যে যিনি প্রথমে মারা যান— যো মমার প্রথমে মর্ত্যনাম।' (অথর্ববেদ ১৮:৩:১৩) তিনি মারা গিয়ে প্রথমে পরলোকে গেছেন, সেখানেই আছেন। এই বিশ্বাসে মানুষ তার সদ্যোমৃত প্রিয়জনের শবদাহকালে যমের কাছে প্রার্থনা করে বলত, এ লোকটি সেই জগতের পথঘাট চেনে না, তুমি এক সঙ্গে করে নিয়ে যাও, অন্যদের সঙ্গে বৃক্ষতলে একে নিয়ে আনন্দ কোরো। মৃতের আত্মীয়দের স্বাভাবিক উদ্বেগ ও মৃতের কুশল, কল্যাণ ও আনন্দবিধানের ব্যবস্থা করার জন্যে অতি স্বাভাবিক উৎকন্ঠা। এই ধরনের কথার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। আমাদের চেনা জগৎ থেকে এ চলে গেছে, এখন এর সুখদুঃখ মঙ্গল-অমঙ্গলের ওপরে আমাদের কোনও প্রভাব থাকবে না, তাই আমাদের রইল। শুধু উৎকন্ঠা। এটা যেমন

অনিবার্য ভাবে স্বাভাবিক, তেমনই মধুর। ধরে নেওয়া যেতে পারে আর্যরা তার আগের কয়েক শতাব্দী ধরেই এ ভাবেই মৃতদেহের সৎকার করত এবং সে সময়ে এ ধরনের প্রার্থনাই উচ্চারিত হত; অতএব মৃত্যুর পরে মানুষ যমের তত্ত্বাবধানে কোনও এক জগতে পূর্বের মৃতদের সঙ্গে ভালই থাকে, যম এবং পূর্ববর্তীর্ণ মৃতরা 'সধমাদং মদস্তি— এক সঙ্গে আনন্দ করে।' মনে রাখতে হবে, যম তখনও মৃত্যুর দেবতা নন, মৃতদের দেবতা। তাঁকে পরলোকে স্থাপন করায় জীবিত মানুষের বিশেষ স্বার্থ ছিল। মৃত্যুকে মানুষের কোনও প্রাচীন সভ্যতাই জীবনের একান্ত সমাপ্তি বুপে মেনে নিতে যে পারেনি, তার একটা বড় কারণ হল, জীবিত আত্মীয়রা মৃতকে স্বপ্ন দেখত এবং মনে করত যাকে দেখা যাচ্ছে সে নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও আছে। কোথায় থাকবে তার সন্ধান তারা জানত না, কিন্তু স্বাভাবিক ভাবেই তারা মনে করত। প্রথম মৃত মানুষ যম যেখানে আছেন সদ্যোমৃতও সেখানেই থাকবে। তাই দশম মণ্ডলের যম-সূক্তগুলিতে ওই আকুতিএ ওখানে যাচ্ছে কিন্তু পথঘাট চেনে না, একে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাও, সুখে রাখে।

যজুর্ব্বেদেরই অন্তর্গত শতপথ ব্রাহ্মাণে পড়ি, 'এই যে পথগুলি বিপৎসংকুল, যেগুলি আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে— এতে হ বা আধ্বানো বারণা য ইমেহন্তরেণ। দ্যাবাপৃথিবী।' (২:৩:৪:৩৭) এই ধরনের কথা কৌষীতকি ব্রাহ্মণ (৮:২)-এও আছে। যখন সদ্যোমৃতের অন্ত্যেষ্টির সময়ে তাকে লোকান্তরে যেতে বলা হয় তখন মানুষ কল্পনা করে যে, সে বা তার আত্মা পৃথিবী ছেড়ে অন্তরিক্ষ-পথে পরলোকে যাবে। অন্যত্র বলা আছে দেবালোক মর্ত্যলোক থেকে 'অন্তর্হিত' অর্থাৎ আড়ালে–অদৃশ্য। হয়তো সেই কারণেই মানুষ ভেবেছিল পরলোকে যাওয়ার পথটি আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানের অন্তরিক্ষ-পথ ধরেই। কিন্তু শাস্ত্র বলছে, সে পথ বিপৎসংকুল; এ বিপদ যে ঠিক কী তা কোথাও বলা নেই। তবে তখনকার শাস্ত্র, ঋগ্বেদ ও অথর্ববেদ থেকে আমরা

জানতে পারি, নানা নামের ও গোত্রের মন্দ আত্মা, অপদেবতা ও প্রেতাত্মাতে তখন মানুষের বিশ্বাস ছিল, এবং এ বিশ্বাসও ছিল যে এরা অন্তরিক্ষবাসী। অতএব ইললোক থেকে পরলোকে যাওয়ার যে পথ অন্তরিক্ষা দিয়ে সেগুলি তো প্রেত, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব, কিন্নরদের জগতে। তারা মানুষের ক্ষতিই করে এমন কথা প্রায় সর্বত্রই শোনা যায়। তা হলে মৃত্যুর পরের ওই বিপৎসংকুল পথ পেরোনোটাও অনিশ্চয়ে ও আশঙ্কায় আকীর্ণ।

যমলোকে ঢুকলে যম না হয় পথ দেখিয়ে পূর্ব মৃতদের সঙ্গে আরামে থাকার ব্যবস্থা করে দেবে, কিন্তু ঢোকার পথেই তো নানা বাধা। যমের দুটি ভয়ংকর কুকুর আছে, নাম শ্যাম ও শবল। কোনও মৃতের আত্মা যমলোকে ঢুকতে এলেই এরা তাকে ছিঁড়ে খাওয়ার চেষ্টা করে এমন আশঙ্কা ছিল বলে, একটা গরুকে মেরে চিরে ফেলে, মৃতদেহের ওপরে উপুড় করে শুইয়ে তার দুই হাতে মরা গরুর নড়িতুড়িগুলো দিয়ে দিতে হবে। শ্যাম ও শবল যখন ওই নাড়িডুড়িগুলো খেতে থাকবে ততক্ষণে আত্মটি ঢুকে যাবে যমলোকে। সেখানে যে মৃত গরুটি পার করে দেয়, শাস্ত্রে তার নাম অনুস্তরণী গৌঃ। শ্যাম ও শবল, মন্দ আত্মা, রোগব্যাধির সঙ্গে সম্পৃক্ত অশুভ শক্তি, প্রেতাত্মা, তথা যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব, কিন্নর এত সব বিপদে আচ্ছন্ন পরলোকে যাওয়ার পথ। কাজেই পরলোকে পৌছোনোটা বেশ বিপজ্জনক এবং অনিশ্চিত। মানুষের জ্ঞানবুদ্ধিকল্পনায় সে পথ আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী নানা আত্মার রাজত্বের অঞ্চল অন্তরিক্ষ পেরিয়ে। যেহেতু ওই পথে পরলোকে পৌঁছে সেখান থেকে আবার ফিরে এসে কেউ কোনও দিন পথ এবং গন্তব্যস্থল সম্পর্কে যথাযথ হদিস দেয়নি, তাই সমস্ত ব্যাপারটাই সংশয়ে আকীর্ণ। কে তার যথার্থ খবর জানে? অর্থাৎ কেউই জানে না। জীবন নিয়েই যেখানে নানা অনুত্তরিত প্রশ্ন সেখানে পরলোক পর্যন্ত যাওয়ার পথ মানুষের অজ্ঞানের অন্ধকারে আবৃত, অতএব নিরতিশয় বিপৎসংকুল। কাজেই মৃতের জন্য জীবিতের প্রার্থনা, ‘হে যম, তুমি আগে সেখানে গিয়েছ, এদের পথঘাট চিনিয়ে দিয়ে, যত্ন কোরো,

দেখো এরা যেন আনন্দে থাকে।' যার প্রিয়জনের মৃত্যু ঘটেছে তার পক্ষে এমন প্রার্থনা করা তো খুবই স্বাভাবিক। আর এই ধরনের প্রার্থনা করতে করতে ধীরে ধীরে একটি বিশ্বাস লোকের মনে রূপ নিচ্ছিল: মৃত্যুর পরে মানুষ স্থূলদেহে না হলেও সূক্ষ্মীদেহে–যে-দেহে সে স্বপ্নে দেখা দেয়–কোথাও না কোথাও থাকে; সেখানে যম থাকেন এবং মৃতদের সূক্ষ্ম দেহে অবস্থানের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করেন। এই ভাবে প্রতি আন্ত্যেষ্টিতে উচ্চারিত প্রার্থনার মধ্যে দিয়ে প্রজন্মের পর প্রজন্ম পরম্পরাগত ইচ্ছাপূরক কল্পনায় মৃত্যুর পরে থাকবার একটি জগৎ নির্মাণ করে নিয়েছিল।

এর বাইরে বেদের অন্যত্র মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থান একটি অন্ধকার নিরানন্দ লোকে, এমন কথাও পাওয়া যায়। মৃত্যুর পরে এ জীবনের ভোগসুখ কিছু থাকে না, এমন একটি বিশ্বাস ছিল বলেই বেদে বারংবার প্রার্থনা করা হয়েছে: 'জ্যোক পশ্যেম সূর্যমুচ্চরন্তমদীর্ঘকাল ধরে যেন সূর্যকে উদিত হতে দেখি'; অথবা, 'পশ্যেমা শরদঃ শতাং, জীবেম শরদঃ শতাং, সুখিনঃ সাম শরদঃ শতম— একশো শরৎ (= বৎসর) দেখব, একশো শরৎ বাঁচব, একশো শরৎ সুখী হ'ব।' তখন মানুষ বিশ্বাস করত। 'শতায়র্বে মনুষ্যঃ'–মানুষের পরমায়ু হল একশো বছর, এবং এই একশো বছর পৃথিবীতে আনন্দে, সুস্থ, সমৃদ্ধ ভাবে বাঁচারই আকাঙ্ক্ষা ছিল তার। এ আকাঙ্ক্ষার পশ্চাতে ছিল একটি আতঙ্ক; মৃত্যুর পরে তো সে আবছা অন্ধকারে দুঃখময় স্থানে থাকে। তাই মৃতব্যক্তির জীবিত আত্মীয়রা মৃতের জন্যে যমের অধীনে সুখে থাকবার একটি কল্পস্বর্গ নির্মাণ করেছিল, যাতে জীবিতরা স্বস্তি পায় এই ভেবে যে, যে সব সুখ আমরা এখানে পাচ্ছি, ওরাও অনুরূপ একটি সুখের জগতে বেঁচে থাকে। এমন চিন্তায় প্রিয়জনের মৃত্যুর পরে ইহলোকের সুখভোগ করতে কোনও দ্বিধা বা কুণ্ঠা জাগে না। না হলে অনুক্ষণ একটি কুণ্ঠা ও অপরাধবোধ এখানকার সমস্ত ভোগসুখকে ক্লিষ্ট করবে।

কিন্তু প্রত্যক্ষের বড় প্রমাণ নেই–তাই ওই জগৎটার অস্তিত্ব সম্বন্ধে মানুষের মনে কোনও নিশ্চয়তা আসে না। তার আরও একটা বড় কারণ হল, প্রত্যেক মানুষই তো মরবে: এবং তার মরণের পরে তার কী হবে তা নিয়ে যা জল্পনা সে তো সম্পূর্ণভাবে তার ইচ্ছাপূরক কল্পনারই সৃষ্টি। কে কবে পরলোকে গিয়ে ফিরে এসে সাক্ষ্য দিয়েছে যে সত্যিই তেমন একটা জগৎ আছে, যেটা সুখের, যেখানে মৃত্যুর পরে মানুষ ভালই থাকে? যদি সবটাই নিছক কল্পনানির্ভর হয়, যদি সত্যিই তেমন কোনও জগৎ না থাকে? এই বিষম মর্মন্তিক আশঙ্কার প্রকাশ তৈত্তিরীয় সংহিতার ওই উক্তিতে: 'কে তা জানে যে পরলোকে কিছু আছে কি না আছে?' কেউ তো প্রত্যক্ষ দেখেনি, মানুষ মৃত্যুর পরে কোনও আকারেই, কোথাওই থাকে কি না। মরণোত্তর ইহলোকের ওপারের আর-এক 'ভুবনের অস্তিত্বের কোনও প্রমাণ যেখানে নেই, সেখানে এই-যে সংশয় কেউ যা দেখেনি কেউ যা জানে না, যেটার একমাত্র ভিত্তি অনুমান, সেটা যদি সত্যিই না থাকে তা হলে? তা হলে মৃত্যুই অন্তিম পরিণাম, ইহলোকই একমাত্র লোক–মৃত্যুর পরে, ইহজগতের পরে আর কিছুই নেই। ওই বিরাট কালো শূন্য গহ্বরটার মুখোমুখি হওয়াটা একটা সাংঘাতিক অভিজ্ঞতা। এই মারাত্মক সংশয়ের প্রথম উচ্চারণ তৈত্তিরীয় সংহিতায়, পরে আরও আছে। কিন্তু এই উক্তিটি খুব-একটি সাহসী উক্তি এবং নিশ্চয়ই এটি আরও অনেকের গভীর ও মর্মান্তিক সংশয়ের উচ্চারণ। কল্পনায় সযত্ন-রিচিত একটি আরামপ্রদ পরলোক থাকলে এবং থাকার নিশ্চিত প্রমাণ মিললে কী আনন্দেরই না হত। কিন্তু প্রমাণ যেখানে নেই সেখানে না থাকার সম্ভাবনাটাকে তো উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অতএব বহু মানুষের মর্মন্তুদ সংশয় উচ্চারণ করার মধ্যে একটা বুদ্ধির স্বচ্ছতা ও প্রত্যয়ের সীমাবোধের সচেতনতার পরিচয় আছে। প্রত্যয় নিশ্চিত হতে গেলে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা তদনুরূপ সিদ্ধ অনুমান প্রয়োজন। যেখানে সেগুলির একান্ত অভাব সেখানে প্রত্যক্ষ তো নয়ই, গ্রহণযোগ্য অনুমান বলেও সিদ্ধ হয় না। তা হলে বাকি থাকে সংশয়। মরণের পরে

অতলান্তিক ওই গহ্বরের শূন্যতা ও অন্ধকারকেই প্রকারান্তরে স্বীকার করা হচ্ছে এই সংশয়ের উচ্চারণে। অন্যান্য সংশয়ের তুলনায় ওই সংশয়টির গুরুত্ব বেশি, কারণ এর সমস্তটাই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের ওপারে। 'সংশয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের সমস্ত অনুসন্ধিৎসা ও আবিষ্কারের সঙ্গেই অন্বিত।'(২) সহজেই লক্ষ্য করা যায়, সূর্য, চন্দ্র, আকাশ, পৃথিবী, অগ্নি এ সব নিয়ে কোনও সংশয় নেই, কারণ এগুলো প্রত্যক্ষ। যা সরাসরি প্রত্যক্ষ নয়, যেমন বীজ থেকে গাছ হওয়া, ভ্রূণ থেকে শিশুর বা শাবকের জন্ম, খাদ্য থেকে পুষ্টি, অনাহারে-রোগে দুর্বলতা, এ-ও প্রত্যক্ষ এবং সহজ অনুমানের ভিত্তিতে সিদ্ধ। মৃত্যু প্রত্যক্ষ, অতএব অনস্বীকার্য, সর্বজনীনও বটে, এ নিয়ে কোনও সংশয়ের অবকাশ নেই। সংশয় আছে মৃত্যুর পরের অবস্থা নিয়ে।

অনেকে বলেছেন, এই আমাদের পৃথিবী থেকে ভাল ভাবে আসা উচিত (স + এতব্যম = স্বেতব্যম)। সে-কথা মনে রেখেই ঋষি বলছেন, আসা তো উচিত। কিন্তু আসব কোথায়? কেউ কি জানে, মৃত্যুর পরে যাওয়ার কোনও জায়গা আছে কি না। প্রিয়জনের মৃত্যুর পটভূমিকায় আমরা তার অদৃশ্য ভবিষ্যতের জন্যে যে একটি নিটোল কল্পনা করে নিয়ে যম এবং পূর্ব মৃতদের সঙ্গে সুখে থাকবার জন্যে তাকে রওনা করিয়ে দিই, মুখে আশ্বাসবাণী উচ্চারণ করে, তার পর? যদি সত্যিই তার যাওয়ার কোনও জায়গা না থাকে? তা কেউ জানে না, কেউ দেখেনি, দৃঢ় ভাবে কেউ বলতে পারে না তেমন কোনও জগৎ মৃত্যুর ওপারে আছে কি না। এ সংশয় উচ্চারণ করায় সাহস আছে। যে বিশ্বাসটুকু–ধারণা, কল্পনা যাই হোক–অবলম্বন করে মানুষ প্রিয়জনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করে; নিজেকে বলে–'ওর ভবিষ্যতের একটা সুখের, স্বস্তির নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা করে দিলাম; সেই বিশ্বাসের ভূমিতেই এই সংশয়। এ কথা উচ্চারণ করা মানে যারা পূর্বে প্রিয়জনের অন্ত্যেষ্টি সম্পাদন করেছে, যারা এখন করছে, পরে যারা করবে তাদের সকলেরই পায়ের তলার মাটি

টলিয়ে দেওয়া। কাজটি এক অর্থে নিষ্ঠুর, অমানবিক, তবু যিনি এমন উচ্চারণ করছেন এ তার একক উপলব্ধি নয়; তাঁর পূর্বের ও তার সমকালীন বহু মানুষের মনে এ সংশয় উদিত হয়েছে। পরে যারা মৃত আত্মীয়দের অগ্নিকৃত্য করবে ওই সান্ত্বনাবাণী উচ্চারণ করে, অনিবার্য ভাবে তাদেরও মনে ওই সংশয় জগবে। এরা স্থানে কালে ছড়িয়ে, এবং সংখ্যায়। ভারী। ফলে তিনি এ সংশয় উচ্চারণ করেছেন, তিনি অতীতের সমকালের এবং আগামীকালের বহু মানুষের সংশয় উচ্চারণ করেছেন–না করে উপায় ছিল না। কেউ যা দেখেনি, যে জগতের অস্তিত্বের কোনও নিশ্চিত প্রমাণ নেই, তেমন একটা জগতে প্রিয়জনকে পাঠানো হচ্ছে, তা কি এই মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে? তাতে তো প্রিয়জনের সঙ্গে প্রতারণা করা হয়। পরে যারা এসে এই সব কথা বলে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করবে। তারাও তা হলে অনিশ্চিতকে নিশ্চিতের রূপে আবৃত করে আত্মীয়বন্ধুদের সঙ্গে শঠতা করবে?

মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় প্রশ্নের কেন্দ্রে মৃত্যু। অন্যান্য সামাজিক অভাব মেটানো যায়, অসুবিধার প্রতিকার হয়, অভাব ঘোচে, রোগও সারে; কিন্তু মৃত্যুই একমাত্র যা চূড়ান্ত, নিষ্প্রতিকার, একান্ত। কাজেই মরণোত্তর অবস্থা নিয়ে যে-সংশয় তার আক্রমণ অমোঘ। তাই তখনকার সমাজ এই সংশয়কে ভাষায় উচ্চারণ করেছে এবং ঋষিরা সে-উচ্চারণকে বেদের মধ্যে সংরক্ষণও করেছেন। মধুর সান্ত্বনা ও ইচ্ছাপূরক আশ্বাসবাণীর মধ্যে যদি যথার্থ সত্য না থাকে, তা হলে প্রকাণ্ড যে সংশয়ের কালো পর্দটা চোখের সামনে দুলতে থাকে, তা জীবনমরণকে আচ্ছন্ন করে একান্ত হয়ে ওঠে। কোনও নিশ্চয় বোধ দিয়ে একে খণ্ডন করা যায় না, তাই এ উচ্চারণ এত তাৎপর্যপূর্ণ, এত মারাত্মক ভাবে ভয়াবহ এবং এত অনুত্তরণীয়। বেদের ঋষিদের সততার ও সাহসিকতার প্রমাণ তৈত্তিরীয় সংহিতার এ অংশ। বেদকে এক ভাবে এটি

মহিমান্বিতও করেছে, কারণ আজও এ সংশয়ের কোনও সমাধান মেলেনি, এইখানে দাঁড়িয়ে আজকের মানুষ একই রকম অসহায় বোধ করে।

বলে, 'মানুষের উচিত প্রতি মাসে যথাবিধি যজ্ঞ করে যাওয়া, কারণ মানুষের কথা কেই-বা জানে?' জীবনে যতটুকুতা করা যেতে পারে, তার পরে সবটাই দুর্জেয়, 'কে-ই বা জানে?'(৩) অর্থাৎ কেউই জানে না। মৃত্যুর পরে যজ্ঞ করা যায় কি না সেটা যেহেতু অনিশ্চিত, তাই ইহজীবনে নিয়ম মেনে মাসে মাসে যজ্ঞ করা উচিত। হয়তো তার ফল সুদূরবিস্তৃত। তবে সেটা তো ঘোর অনিশ্চিত; কে জানে মানুষের জীবন সম্বন্ধে শেষ কথাটা? এই অনিশ্চয়ই বহু সংশয়ের মূলে।

_____

১. মনুষ্যল্লোকান্নাম্মায়োকৎ শ্বেতবামিত্যাচুঃ কোহিতদ্বেন্দ যদ্যমুমিন লোকেহস্তি বান বেতি। ।(৬:১:১:১)
(২) 'Doubt is inseparable from all inquiry into and discoveries about the empirical world,' Macmillan Encyclopaedia of Religion p. 427
(৩) তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ (১.৮.৪.৩); এই কথাই পড়ি শতপথ ব্রাহ্মণেও (৫.২.২)।

অবৈদিক সংশয়

যজ্ঞ তার সমস্ত কিছু আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান নিয়ে ভারতবর্ষের মাটিতে আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চদশ শতক থেকে অন্তত দু-হাজার বছর ধরে প্রচলিত। যখন আর্যরা ভারতবর্ষে আসে তখন তারা প্রধানত পশুচারী, তবে

কিছু কৃষিও জানত; পশুচারী স্বভাবত যাযাবর বলেই স্থায়ী ভাবে কোথাও বসবাস করে চাষ করার সময় কখনও কখনও পেলেও, পশুপাল নিয়ে দীর্ঘ পথ পরিক্রমার সময় পেত না। সেই যাযাবর-জীবনে যজ্ঞ ছিল স্বভাবতই সংক্ষিপ্ত ও সরল, যদিও জীবনের মূল প্রশ্নগুলো এক রকমেরই ছিল। তারা যখন আর্যবর্তী দখল করে কৃষিকাজ পাকাপাকি রকমে করতে শুরু করল তখন সেই সব প্রশ্নই অনেক জটিল চেহারা নিল। যজ্ঞ দীর্ঘায়িত হল; পুরোহিতের সংখ্যা বেড়ে সতেরো (যাগবিশেষে আরও অনেক বেশি) হল; যজ্ঞের উপকরণের তালিকা ও পরিমাণ বাড়াল; দক্ষিণ বাড়তে লাগল চক্রবৃদ্ধি হারে, যজ্ঞের কালসীমাও বাড়তে বাড়তে সোমযাগের সত্র বারো বছর পর্যন্ত বিস্তৃত হল (শাস্ত্রে এক হাজার বছর ব্যাপ্ত সোমযাগের কথাও আছে!)। ফলে যজ্ঞের মহিমা গরিমা বেড়েই চলল। অবশ্য এ সব অল্প সময়ে বা হঠাৎ হয়নি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতিতে কয়েকশো বছর ধরে এর প্রস্তুতি চলছিল। আমরা প্রথমে এর কারণ নির্ণয় করব, পরে এর তাৎপর্য, ফল ও এ অবস্থা থেকে উদ্ভূত সংশয়গুলির আলোচনা করব।

খ্রিস্টপূর্ব একাদশ শতকে ভারতবর্ষে প্রথম লোহা দেখা যায়, কিন্তু তখন তা পরিমাণে অল্প ছিল বলে প্রথম শ-তিনেক বছর অলংকার ও অন্যান্য অকিঞ্চিৎকর কাজেই লোহা ব্যবহার করা হত। খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকে প্রথম বেশি পরিমাণে লোহা দেখা গেল, তখন মানুষ লোহার লাঙলের ফলা তৈরি করতে শুরু করল। এর আগে চাষের জন্যে লাঙলে কাঠের ফল লাগানো হত। কাজেই পরিশ্রম বেশি করতে হত, আর তাতে অল্প জমি চাষ করতে বেশি সময় লাগত। লোহার ফলার লাঙলে অল্প পরিশ্রম ও সময়ে অনেক বেশি জমি চাষ করা যেত। এর ফল হল সুদূরপ্রসারী; বেশি ফসল উৎপন্ন হলে প্রয়োজনের বেশিটা উদ্বৃত্ত হত। অবশ্যই সেটা জমা হত মুষ্টিমেয় কিছু লোকের হাতে, তারা এই উদ্বৃত্তের বিনিময়ে কুটিরশিল্পের সামগ্রী তৈরি

করাতো গরিব শিল্পীদের দিয়ে, কিছু ফসল সরাসরি রপ্তানিও করত। খ্রিস্টপূর্ব নবম শতক থেকে মধ্যপ্রাচ্য, আরব, পারস্য, মিশর হয়ে দক্ষিণ ইউরোপ পর্যন্ত প্রাগার্যদের যে-বাণিজ্য ছিল, যা আর্যরা এখানে আসার পরে বন্ধ হয়েছিল, সে-পথে আবার বাণিজ্য শুরু হল। ফসল বা শিল্পবস্তু রপ্তানি থেকে–এবং দেশের মধ্যে অন্তর্বাণিজ্য থেকে যে-সম্পদ আসত তা জমত ওই মুষ্টিমেয় একটি শ্রেণির হাতে। ফলে দেশে বেশ স্পষ্ট একটা শ্রেণিবিভাজন হল, যেখানে অল্প কিছু লোক বিত্তবান এবং অধিকাংশ লোকই বিত্তহীন। যে-চাষি অন্যের জমিতে খাটত, যে-মজুর ধনীর ব্যবসার জন্য শিল্পবস্তু নির্মাণ করত–তারা সে কাজ করত পেটভাতায়। ফলে ব্যবসার লাভের বড় অংশটাই মুনাফা হয়ে জন্মত ওই অল্পসংখ্যক ধনিকের হাতে।

এ ছাড়া দেশে ঋগ্বেদের আমল থেকেই বর্ণবিভাগ তো ছিলই। চারটি বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও ধনী বৈশ্যই ছিল বিত্তবান: ব্রাহ্মণ পৌরোহিত্য এবং আচার্যত্বে, ক্ষত্রিয় যুদ্ধ ও প্রতিরক্ষাকর্মে এবং রাজার প্রসাদে, বৈশ্য কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্যে। ধনী ব্রাহ্মণ হত পুরোহিত ও আচার্য। ধনী ক্ষত্রিয় হত যজমান, যজ্ঞের পৃষ্ঠপোষক, যাদের নামে যজ্ঞগুলি করা হত এবং যারা যজ্ঞের সমস্ত খরচ জোগাতো। এই সময়ের মধ্যে যজ্ঞের সংখ্যা বিস্তর বেড়ে গেছে এবং প্রত্যেকটা যজ্ঞেই অনেক পশু বধ করতে হত, অথচ এখন লোহার লাঙলের ফলার প্রচলন হওয়ার ফলে অল্প সময় ও পরিশ্রমে অনেক বেশি জমি চাষ করা যাচ্ছিল। ফলে লোকে দেখল। যজ্ঞে যদি শ-য়ে শ-য়ে পশুহত্যা করা হয় তা হলে হালের বলদে টান পড়বে। তাই পশুধনের অনাবশ্যক অপচয় বাঁচাবার জন্যে মানুষ সচেষ্ট হল। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম-ষষ্ঠ শতকের রচনা শতপথ ব্রাহ্মণে শুনি যাজ্ঞবল্ক্য বলছেন, এই সব কারণে গোমাংস ভক্ষণ ঠিক নয়। শুধু তাই নয়, ষষ্ঠ শতকে মহাবীরের প্রবর্তিত জৈনধর্মে এবং গৌতম বুদ্ধের প্রবর্তিত বৌদ্ধধর্মে অহিংসাকে ধর্মের একটি মৌলিক

উপাদান বলে ঘোষণা করা হল। যজ্ঞে পশুবধ অপরিহার্য, এ দিকে চাষের জন্যে গোধন সংরক্ষণ করা প্রয়োজন, তাই ব্রাহ্মণ্য ধর্মেও সম্ভবত একটা বিতর্ক চলেছিল, যার চিহ্ন রয়ে গেছে মহাভারত-এ। এখানে ঋষিদের সঙ্গে তর্ক হয় দেবতাদের: যজ্ঞে গো-বধ করা উচিত কি না। দেবতারা তো যজ্ঞের হব্য পেতেন, কাজেই তারা গোমাংসের পরিবর্তে ছাগ ও মেষ মাংসের সপক্ষে মত দেন এবং ঋষিরা শস্যজাত হব্যের সমর্থন করেন। দু-পক্ষই বসু উপরিচরকে মধ্যস্থতা করতে বললে তিনি পশুহত্যার পক্ষে মত দেন, তবে সেটা ছাগ ও মেষ মাংস হতে হবে। এখানে দেখা যায়, চাষের ক্ষতি সকলেই এড়াতে চেয়েছেন। তাই বিকল্প হয় শস্য অথবা ছাগ বা মেষ, যেগুলো দিয়ে চাষ হয় না। এদিকে বহু যজ্ঞে বলদ, মোষ, ইত্যাদি জন্তু বধ করার নির্দেশ আছে। ফলে সত্যকার একটা সমস্যা দেখা দিল এবং ধর্মশাস্ত্রের নির্দেশ নিয়ন্ত্রিত হল। অর্থনীতির দ্বারা। গো-বধ অপ্রচলিত অথবা অল্প প্রচলিত হল, বিকল্প। পশু এবং শস্য ক্রমে প্রাধান্য পেল।

খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম-ষষ্ঠ শতাব্দীতে শ্রেণিবিভাজনের সঙ্গে শ্রমবিভাজনও কঠোরতর হল। যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় সংহিতায় (এরশ-খানেক বছর আগেকার রচনা মনে হয়) বহু কর্মবৃত্তির নাম পাই। অর্থাৎ সমাজে চারটি বর্ণের শ্রমবিভাজন ছাড়াও জীবনযাত্রার উন্নততর মান রচনার চাহিদায় বহুবিধ শিল্পের ও বৃত্তির উদ্ভব হয়েছিল। স্বভাবতই এরা কৃষিগ্রামে বাস করত না। বরং বিভিন্ন বৃত্তির ছোট ছোট দলে (শ্রেণি বা পূগ) ভাগ হয়ে এক-একটি বৃত্তির মানুষ এক-একটি অঞ্চলে একত্র হয়ে কাজ করত; সে সব শিল্পপ্রধান অঞ্চল গ্রামের বাইরে থাকত, যেখানে রাজা, রাজন্য ও বণিক তাদের বৃত্তি (= মাইনে) দিয়ে কাজে নিযুক্ত রাখতেন। এই রকম বহু শিল্পের গোষ্ঠী যেখানে রাজন্য ও বণিকদের সান্নিধ্যে থাকত, সেগুলির চরিত্র গ্রাম থেকে ভিন্ন: জনসংখ্যা ও কর্মব্যস্ততা বেশি, চাষ কম, কারণ তাদের খাদ্য

জোগান দিত। কৃষিগ্রামগুলি। এই নতুন জনাকীর্ণ অঞ্চলগুলি খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম-ষষ্ঠ শতাব্দীর নগর; এক-একটি নগর এক-একটি জনপদের কেন্দ্র। এই সময়ে ষোলোটি বিখ্যাত জনপদের উদয় হয়। ইতিহাসে এগুলির নাম শুনি, মগধ, কোশল, বৎস, অবন্তী, বজি, লিচ্ছবি, কাশী, মল্ল, কুরু, পাঞ্চাল, অঙ্গ, চেদি, গান্ধার, অশ্মক, শূরসেন ও কম্বোজ–ষোড়শ মহাজনপদ। এই হল ভারতবর্ষের দ্বিতীয় নগরায়ণ (প্রথমটি সিন্ধুসভ্যতার সমকালীন)। আর্যরা যে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল থেকে ক্রমান্বয়ে দক্ষিণ-পূর্বের দিকে এগোচ্ছিল, উত্তরের অঞ্চল জয় করে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল সে-কথা জৈমিনীয় ব্রাহ্মাণে পাই (৩:১৪৬); আর তাদের পশ্চিম থেকে পূর্বের দিকে এগোনোর কথা পাই কাঠক ব্রাহ্মাণে (২৬:২)। এই অগ্রগতির ফলে ধীরে ধীরে প্রায় পাঁচশো বছরে আর্যাবর্তের অধিকাংশই আর্যদের অধিকারে আসে এবং ক্রমে বহির্বাণিজ্যের ফলে যখন সমৃদ্ধিবৃদ্ধির সঙ্গে নগরায়ণ ঘটে তখনই ভারতবর্ষে মুদ্রার প্রচলন ঘটে। আগে জিনিসের দাম নিবুপিত হত গরু দিয়ে। এখন থেকে শুরু হল মুদ্রা দিয়ে। এই সময়ে তাই লেখারও প্রচলন ঘটে, লেখা ছাড়া বাণিজ্য হতে পারে না, হিসেব ও বিবরণ লেখা দিয়েই হয়।

তা হলে দেখতে পাচ্ছি, খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম-ষষ্ঠ শতক থেকে ভারতবর্ষে কতকগুলি বড় বড় পরিবর্তন দেখা দিল, যেগুলির ফল সুদূরপ্রসারী। প্রথমত, লোহার লাঙলের ফলার প্রবর্তনের সঙ্গে স্বল্পতর পরিশ্রম ও সময়ে বিস্তৃততর জমি চাষ করা সম্ভব হল, ফলে ফসলে উদ্বৃত্তি দেখা দিল। এ উদ্বৃত্তি সঞ্চিত হল অল্প কিছু ধনীর হাতে যারা পেটভ্যতায় লোক খাটিয়ে জমিতে ফসল উৎপাদন এবং কুটিরশিল্পজাত বস্তু নির্মাণ করাতে লাগল। উদ্বৃত্তি ফসল ও শিল্পদ্রব্য দেশের মধ্যে এবং নৌবাণিজ্যের দ্বারা বিদেশে রপ্তানি করে ধনিকরা অনেক ধন অর্জন করতে লাগল। এই বাড়তি সম্পদ ভোগ করতে ও জমাতে লাগল মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ। এদের তুলনায় শতকরা আশি-নব্বই ভাগ মানুষ খুবই

গরিব, যাদের অধিকাংশই পেট ভাতায় খাটত, জমিতে বা শিল্পের কারখানায়। ফলে সমাজ স্পষ্টত দুটি ভাগে ভাগ হয়ে গেল ধনী ও দরিদ্রে, শ্রেণিবিভাজন প্রকট রূপে দেখা দিল। মুদ্রা ও লিপির প্রচলন এ সবের সঙ্গে সম্পৃক্ত–এ দুটির মধ্যেও সমাজের অগ্রগতি সূচিত হল এবং বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ল। শ্রেণিবিভাজনের একটা তাৎক্ষণিক ফল হল, বাড়তি টাকায় ধনিক শ্রেণি বেশি বেশি যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে লাগল। ফলে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত পুরোহিতশাস্ত্রকার শ্রেণির উদ্ভব হল। এরা নিজেদের ভরণপোষণের জন্যে কোনও পরিশ্রম করত না, সম্পূর্ণ পরোপজীবী ছিল। বাকি সমাজ এদের অন্নবস্ত্র, বাড়িঘর, সুখস্বচ্ছন্দ্যের ব্যয় বহন করত, সমাজে এদের খাতির প্রতিপত্তি ছিল সর্বোচ্চ স্তরে। ফলে আর-একটি বিভাজনও দেখা দিল–কায়িক শ্রম ও মানসিক শ্রমের তারতম্য।

সে দিন থেকে আজ পর্যন্ত যারা মাথার কাজ করে সমাজ তাদের উন্নততর মানুষ বলে গণ্য করে, এবং যারা গা-হাত-পা খাটিয়ে পরিশ্রম করে খায়, তারা নিচু শ্রেণির মানুষ বলে গণ্য হয়। কায়িক শ্রম থেকে ছুটি পাওয়া এই পুরোহিতশ্রেণি অধ্যাপনা, শাস্ত্র নির্মাণ এবং বহু প্রকারের দীর্ঘস্থায়ী জটিল প্রকরণের বহু যজ্ঞ উদ্ভাবন ও অনুষ্ঠান করতে লাগল। প্রথম দিকের রচনার চেয়ে পরের দিকে রচিত ব্রাহ্মণগুলিতে আমরা অনেক বেশি নামের নানা যজ্ঞের কথা শুনি, যেগুলিতে বহু সংখ্যক পুরোহিতের কাজ থাকে। স্বভাবতই পুরোহিতরা তাদের স্বশ্রেণির মানুষকে কাজ দেওয়ার চেষ্টা করবেনই, বিশেষত দেশে যেখানে উদ্বৃত্তাবিত্ত আসছে— রাজা, রাজন্য, ধনী ক্ষত্রিয় বৈশ্যদের হাতে। পুরোহিতরা বিভিন্ন সংকটের জন্যে বিভিন্ন যজ্ঞ উদ্ভাবন করেই চলল। এ সব যজ্ঞে শুধু বেশি সংখ্যায় পুরোহিতই নিযুক্ত হল না, যজ্ঞের উপকরণ সামগ্রীর বহু প্রকারভেদ দেখা গেল; হব্যের পরিমাণ বাড়তে

লাগল, যজ্ঞের কালগত ব্যাপ্তি বাড়ল। আর বাড়ল দক্ষিণার সামগ্রীর প্রকারভেদ ও পরিমাণ। ফলে এখন শুধু ধনীরই সাধ্য রইল যজ্ঞ করবার।

সাধারণ মানুষ যাদের সংখ্যা সমাজে যজ্ঞকারীদের তুলনায় শতকরা পচানব্বই ভাগ, তারা দূর থেকে দুটো জিনিস দেখল। প্রথমত, যা তাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিল তা হল যজ্ঞের আড়ম্বর, প্রাচুর্য, ধুমধাম, ঘটা। যজ্ঞান্তে দেওয়া পুরোহিতকে ও ঋত্বিকদের প্রচুর দান ও দক্ষিণা। এরা দুরের দর্শক হিসেবে ষোড়শ মহাজনপদের নানা স্থানে যুগ যুগ ধরে এই সব সাড়ম্বর যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হতে দেখছিল। সম্ভ্রাম, বিস্ময়, মুগ্ধতার সঙ্গে কি কিছু বিরূপতাও মিশত। না–যেটা ঘটা খুবই স্বাভাবিক বাইরের দরিদ্র দর্শকের পক্ষে? দ্বিতীয়ত, শতকের পর শতক সাধারণ মানুষ জন্ম-পরম্পরায় শুনে শুনে মেলাতে লাগল যজ্ঞ ও যজ্ঞফল। বলা বাহুল্য, রাশিবিদ্যার নিয়ম অনুসারেই কোনও কোনও যজ্ঞে কাকতালীয়বৎ ফল দেখা যেত এবং অনেক সময়ে কোনও কোনও যজ্ঞ নির্ম্মফলও হত। এটাই স্বাভাবিক। স্বভাবতই যজ্ঞে অভীষ্ট ফল পাওয়া না গেলে পুরোহিতরা যজমানের কিংবা ঋত্বিকদের ত্রুটি, অসম্পূর্ণতা অথবা দৈবদুর্ঘটনাকে দায়ী করত, যেমন এখনও মানুষ করে থাকে। কাকতালীয়বৎ যে সব যজ্ঞে প্রার্থিত ফল মিলত, সেগুলি দিয়ে পুরোহিতরা সমর্থন করত সমস্ত যজ্ঞবিধানকে, আর যেগুলি মিলত না সেগুলো প্রকরণগত ত্রুটি দিয়ে ব্যাখ্যা করা হত।

এখন প্রশ্ন হল, মানুষ কি এই ত্রুটির ব্যাখ্যাগুলিকে অভ্রান্ত বলে বিশ্বাস করত? কোথাও, কখনও কি করে? না করেনি। তার প্রমাণ রয়েছে ইতিহাসে। অন্তত খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতক থেকে দেশে ব্রাহ্মণ্যবিরোধী মত ও সেই সব মতাবলম্বী দলের প্রবল প্রাদুর্ভাব ঘটে আর্যাবর্তে। কারণ খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে গৌতমবুদ্ধ যে সব ব্রাহ্মণ্যবিরোধীদের দেখা পান, তখনই তাঁরা প্রত্যেকেই নিজস্ব শিষ্যসহচর নিয়ে দল গড়েছেন। তাই মনে হয়, যজ্ঞ সম্বন্ধে ঔদাসীন্য, অনীহা

সেই অষ্টম শতক থেকেই সমাজে বেশ স্পষ্ট হচ্ছিল। গৌতম বুদ্ধ তার সাধনার সময়ে আনাড় কালাম, রুদ্রক রামপুত্র, অজিত কেশকম্বলী, পূরণ কাশ্যপ, নিগ্রন্থ জ্ঞাতপুত্র, মস্করী গোশাল, ককুদ কাত্যায়ন, সঞ্জয় বৈরাটীপুত্র, এদের দেখা পান। এঁদের প্রত্যেকেরই ভিন্ন ভিন্ন মত, কিন্তু এঁরা সকলেই বেদবিরোধী, যজ্ঞবিরোধী, অনেকেই কর্মফলবিরোধী, কেউ কেউ নিয়তিবাদীও। এঁরা নিজেদের দল নিয়ে গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে ঘুরে বেড়াতেন, এদের কথা শুনে নতুন নতুন লোক দলে যোগ দিতেন, দল ভারী হত। এমন করেই নানা বিরুদ্ধবাদ সমাজে প্রসার লাভ করেছিল।

এই সব দলের উৎপত্তি কিন্তু সংশয়ে: বেদ, যজ্ঞের অনুষ্ঠান, দেবতা পুরোহিতদের ভূমিকা–এসবের যথার্থতা সার্থকতা নিয়ে সংশয়। এ মতগুলির উৎপত্তির ইতিহাস আলাদা করে জানা না গেলেও এটা জোর করেই বলা চলে যে, ব্রাহ্মণ্যযুগের ধর্মাচরণে এরা বিশ্বাস হারিয়েছিলেন। ব্রাহ্মাণ্য সমাজব্যবস্থায় তখন প্রথম তিন বর্ণের পুরুষকে বাল্যকৈশোরে ব্রহ্মচর্য পালন, অর্থাৎ গুরুগৃহেগিয়ে বেদাধ্যয়ন করতে হত। যজুর্বেদীদের সম্ভবত যজ্ঞ করার পাঠও নিতে হত, ঋগ্বেদীদের স্বরে মন্ত্র আবৃত্তি এবং সামবেদীদের সুরে বেদগান করার তালিম নিতে হত। প্রায়োগিক দিকটা হয়তো পরে যজ্ঞের পুরোহিতদের অধীনে শিক্ষানবিশির ভিতর দিয়ে করত, কিন্তু বেদপাঠটা ব্রহ্মচর্যের আবশ্যিক কার্যক্রম ছিল। অবভৃথস্নান অর্থাৎ স্নাতক হওয়ার পরে বিবাহ এবং তার পর বাকি জীবনটা গার্হস্থ্য; তার মধ্যে গৃহীর অন্যান্য করণীয়ের মধ্যে ছোটখাটো যজ্ঞ সম্পাদন করাও ছিল।

সংহিতাব্রাহ্মণযুগে এই দুটি আশ্রমই চলিত ছিল, অর্থাৎ সমাজের উচ্চ ত্রিবর্ণের প্রত্যেককেই যজ্ঞের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হত; বড় বড় যজ্ঞ অবশ্য ধনী যজমান নৈমিত্তিক ভাবে, অর্থাৎ বিশেষ প্রয়োজনে অনুষ্ঠান করতেন। তার মানে খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চদশ শতক থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে এবং একাদশ-দশম শতক

থেকে বিস্তারিত ভাবে সমাজে যজ্ঞ চালু ছিল। প্রত্যক্ষ ভাবে যজ্ঞের সঙ্গে যোগ ছিল ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের। ফলে সমাজের নিরানব্বই ভাগেরও বেশি মানুষ– ক্ষত্রিয়,বৈশ্য, শুদ্র, নারী ও প্রাগার্যরা যজ্ঞ-অনুষ্ঠান বাইরে থেকে দেখত। এই দেখা স্বাভাবিক ভাবেই দূরের থেকে দেখা, সমালোচকের চোখে, অর্থাৎ কারণের সঙ্গে কার্যকে মিলিয়ে দেখা: এ ক্ষেত্রে কারণ হল যজ্ঞ, কার্য যজ্ঞফল। এ দুটো যখন মিলত না। তখন স্বভাবতই সংশয় আসত। অনেক যজমান নিশ্চয়ই বিস্তর খরচ করে যজ্ঞ করেও ফল পায়নি, অনেক পুরোহিতও একান্ত বিশ্বাস ও নিষ্ঠার সঙ্গে যজ্ঞ করেও সে যজ্ঞকে নির্ম্মফল হতে দেখেছে। শুধু কি এরাই? জাঁকজমকে একটা যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হলে চারপাশের সাধারণ মানুষও তা দেখে এবং সে যজ্ঞ থেকে প্রত্যাশিত ফল যে পাওয়া গেল না সেটাও লক্ষ্য করে। বারে বারে এ ঘটনা ঘটলে লোকের মনের সংশয় দৃঢ় হতে বাধ্য। কতকগুলো যজ্ঞ যেমন পুত্রকামনায় অনুষ্ঠিত পুত্রেষ্টি যজ্ঞ বা বৃষ্টিকামনায় করা কারীরী ইষ্টি, এগুলোর ফল তো মানুষ সদ্য সদ্যই মিলিয়ে দেখে। না পেলেই জাগে সংশয়। না পাওয়া সত্ত্বেও সমাজে যজ্ঞের অনুষ্ঠান চলতে থাকে। প্রথমত, যজ্ঞ ছাড়া প্রকৃতিকে বশীভুত করার বা ইষ্টসিদ্ধির কোনও পন্থাই তাদের জানা ছিল না। দ্বিতীয়ত, কাকতালীয়বৎ কয়েকটা যজ্ঞের পরে ইষ্টসিদ্ধি হত এবং তাতে যজ্ঞ সম্বন্ধে বিশ্বাস দৃঢ় হত। তৃতীয়ত, পুরোহিতশ্রেণি যজ্ঞ নিষ্ফল হলে তার ব্যাখ্যা দিত, অন্য ভাবে অন্য যজ্ঞ করার বিধান দিত। সমাজে এই পরগাছা পুরোহিতশ্রেণির কামাইছিল যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হতে থাকুক, এর সঙ্গে তাদের জীবিকা ও সামাজিক প্রতিপত্তি দুই স্বার্থই সম্পৃক্ত ছিল।

তা সত্ত্বেও যে যজ্ঞ বারে বারে নিষ্ফল হত, মীমাংসাশাস্ত্রের ভাষ্যেও এ কথা আছে। অতএব সাধারণ নিস্ক্রিয় দর্শকের মনে সংশয় জগত ও দৃঢ় হত। এদেরই মধ্যে কিছু বুদ্ধিমান চিন্তাশীল মানুষ সমগ্র যজ্ঞক্রিয়া থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে যজ্ঞকে অস্বীকার করে নিজস্ব মত প্রতিষ্ঠা করত। তখন অন্যান্য সংশয়ীরা তার সহচারী হত। এমন বহু প্রস্থানের অনুসারীযাদের

পরস্পরের মধ্যে মতপার্থক্য ছিল, কিন্তু বেদ ও যজ্ঞের বিরোধিতায় যাদের মিল ছিল–তারা যজ্ঞ ছেড়ে নিজেদের মতের অনুশীলন করতেন। দুটি ব্যাপারে। এঁরা ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরোধিতা করতেন, বেদ ও যজ্ঞকে অস্বীকার করে এবং নিজেরা গার্হস্থ্য আশ্রম ত্যাগ করে ঘুরে বেড়ানোর ফলে গৃহীর করণীয় যজ্ঞগুলিও না করে। এ সব প্রস্থানের অনেকগুলিই ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে গেল, কিন্তু অনেকগুলিই থেকে গেল; তাদের মধ্যে প্রধান হল নিগ্রন্থ জ্ঞাতপুত্রের প্রবর্তিত জৈনধর্ম, গৌতম বুদ্ধের বৌদ্ধধর্ম এবং মস্করী গোশালের নিয়তিবাদ। এই সব বেদবিরোধীদের কথা বৌদ্ধগ্রন্থে বেশ খানিকটা পাওয়া যায়। এখানে জাতকগুলির ৫২৮ নং মহাবোধি জাতকে' ২৪ নং শ্লোকের পরে উচ্ছেদাবাদী' বলে সাধারণ ভাবে এদের সকলের কথার সারসংগ্রহ দেওয়া হয়েছে:

'দান নেই, যজ্ঞ নেই, হোম নেই, ভালমন্দ কর্মের ফলের পরিণাম নেই, মাতা নেই, পিতা নেই, ইহলোক নেই, পরলোক নেই–ন আথি দিল্লং, ন আথি ষিট্রঠং আথি হতং, ন আথি সকটদুককর্টকমনং ফলং বিপাকো, ন আথি মাতা ন আথি পিতা, ন আথি অয়ং লোকো ন আথি পরলোকে ।'

এখানে প্রথমেই কর্মকাণ্ডকে অর্থাৎ যজ্ঞ ও দীনদক্ষিণা, ইত্যাদি যজ্ঞসংশ্লিষ্ট তথাকথিত পুণ্যকর্মকে অস্বীকার করা হচ্ছে। তার পরে তত দিনে সমাজে যে মতবাদটি প্রতিষ্ঠালাভ করেছে সেই কর্মফলকে অস্বীকার করা হচ্ছে। সমাজে। অবশ্যকরণীয় সৎকর্মের মধ্যে পিতামাতার পরিচর্য নির্দিষ্ট ছিল, তাকেও অস্বীকার করা হচ্ছে, এবং শেষ অস্বীকার ইহলোক-পরলোক। ইহলোককে অস্বীকার করা যায় না। কারণ তা প্রত্যক্ষ, কিন্তু পরলোকের পরিপ্রেক্ষিতে যে ইহলোক, অর্থাৎ যেখানে জীবনের অন্ত ঘটলে আত্মা পরলোকে যায়। সেই ইহলোককে–পরলোকের সঙ্গে যুক্ত ইহলোককে, পরলোকের সঙ্গেই অস্বীকার করা হয়েছে। প্রথমেই ব্রাহ্মণ্যধর্মের ভিত্তি, যজ্ঞ ও দীনদক্ষিণাকে নির্ম্মফল বলা

হয়েছে এবং শেষ জীবনের অন্তে মানুষের স্বপ্ন যে পরলোক, তাকে অস্বীকার করা হয়েছে। লক্ষ্যণীয়, জাতকে এই মতবাদগুলিকে সামগ্রিক ভাবে উচ্ছেদাবাদী' বলা হচ্ছে; এরা উচ্ছেদ করছে বেদের ধর্মকে।

বুদ্ধের সময়েও সমাজের যজ্ঞানুষ্ঠান হত। প্রাচুর্যের মধ্যে লালিত বুদ্ধের যৌবনের তিনটি অভিজ্ঞতা তাকে বৈদিক ধর্মাচরণের প্রতি বিমুখ করে তুলল। যজ্ঞ সব কাম্যবস্তু দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়: সুখ, বিজয়, ধন, ঐশ্বর্যমানুষ ভোগ করবে তো শরীর দিয়েই? সেই শরীরের তিনটি সবচেয়ে বড় সংকট–ব্যাধি, জরা ও মৃত্যু— এগুলি নিবারণের তো কোনও বিধান বেদে নেই। তখনকার সমাজ জন্মান্তরে বিশ্বাস করত, অতএব জন্মান্তরেও মানুষকে এ তিনটি সংকটের সম্মুখীন হতে হবে? সংশয় জাগল সিদ্ধার্থের মনে: তা হলে, বেদের নির্দেশিত পথে যখন এ তিনটি মহাসংকটের কোনও আত্যন্তিক প্রতিবিধান নেই, তখন বেদের পথে স্থায়ী সুখের কোনও পথনির্দেশ নেই। বুদ্ধের সংশয়ের প্রায় অনুরূপ সংশয় ছিল মহাবীরের, এবং সম্ভবত অন্য বেদবিরোধী মতের প্রবক্তাদেরও।

শ্রেণি ও সংশয়

আমাদের মুখ্য আলোচ্য বিষয় বেদে সংশয় ও নাস্তিক্য, তবুও এই অবৈদিক প্রতিপক্ষদের নিয়ে আলোচনা করলাম দুটি কারণে। প্রথমত, এঁরাও বৈদিক যুগেরই সংশয়ী, দ্বিতীয়ত, এঁদের প্রতিবাদের যে-সুদূরপ্রসারী ফল হয়েছিল তা বেদের যুগকে অন্য প্রকারে, কিন্তু গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছিল। প্রথমত, তখন সমাজে লোকসংখ্যা কম ছিল, সেই পরিপ্রেক্ষিতে এতগুলি বিরোধী দল ও তাদের বেশ ভাল সংখ্যায় অনুগামী, এটা সমাজে একটা গুরুত্বপূর্ণ সংকটের

সৃষ্টি করেছিল। লোকে দেখল এত বিভিন্ন মতাবলম্বী মানুষরা সমাজে যজ্ঞ না। করেও তো দিব্যি খেয়ে-পরে বেঁচে আছে, এদের মড়কও লাগছে না, মাথার ওপরে বাজও পড়ছে না; কাজেই যজ্ঞ না করেও বেঁচে থাকা যায়। এদের সংখ্যা নিশ্চয়ই ক্রমে স্পর্কীত হচ্ছিল, তাই এদের অস্তিত্বকে একেবারে উপেক্ষা করাও যাচ্ছিল না। এর ফলে ব্রাহ্মণ্য সমাজে প্রথম যে-প্রতিক্রিয়া হল তা হল ব্রহ্মচর্য ও গার্হস্থ্য আশ্রমের পরে শাস্ত্রকারদের আরও দুটি (হয়তো প্রথমে তৃতীয়টিও পরে চতুর্থটি) আশ্রম সংযোজন। তারা বলল, পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত গার্হস্থ্য আশ্রম পালন করবার পরে বনে বাস করতে পা◌ের, তখন অগ্নিহোত্র-র মতো নেহাত স্বল্প উপকরণের ও স্বল্প সময়সাপেক্ষ ছোট ছোট হোমগুলি ছাড়া আর কোনও বড় যজ্ঞ করতে হবে না। এ আশ্রমকে তারা নাম দিল বানপ্রস্থ, বনে প্রস্থানের কাল। সাধারণ মানুষ দেখল গৃহীজীবনের অন্তে এক সময়ে মধ্য বয়সের সূচনাতেই যজ্ঞ থেকে তাদের ছুটি মিলবে। হয়তো কিছু লোকের তাতেও মন ভরেনি, তাই যোগ করতে হল চতুর্থ একটি আশ্রম সন্ন্যাস বা যতি। মনে রাখতে হবে, প্রাগার্য সমাজে বেদবিরোধী একটি দল ছিল 'যতি', যাদের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য সমাজের বিরোধ ছিল এ-কথা আগেও বলেছি। ঋগ্বেদে পড়ি 'ইন্দ্র যতিদের সা◌েলাবৃকদের কাছে দিয়েছিলেন।'(১) বৃক মানে নেকড়ে। সালা মানে বাড়ি, সালাবৃক সম্ভবত গৃহপালিত কোনও নেকড়ে বাঘের মতো কুকুর (wolfhound?), যারা এত হিংস্র যে অচিরে যতিদের ছিঁড়ে খুঁড়ে মেরে ফেলেছিল। সম্ভবত ঋষিরা নানা নামে বেদের সময় থেকেই ছিল। এই যতি বা সন্ন্যাস আশ্রম এই সব সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়কে ব্রাহ্মণ্য সমাজের অন্তর্ভুক্ত করল। হয়তো শাস্ত্রকারদের এমন আশা ছিল এতে দলে দলে বেদবিরোধী সম্প্রদায়ে যোগ খানিকটা কমবে, এবং সম্ভবত তাঁদের সে-আশা কতকটা পূর্ণও হয়েছিল। ব্রাহ্মণ্য সমাজের গঠনের মধ্যে বানপ্রস্থ ও ব্যতিকে স্বীকার করে ও-দুটিকে সংশয়ীদের ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়ার চেষ্টা করা হল।

সংশয় কি তাতে গেল? না, সেটা অন্য চেহারায় দেখা দিল। মানুষের প্রধান সন্দেহ দেবতায় ও যজ্ঞে। দেবতারা সংখ্যায় বাড়তে বাড়তে তেত্রিশেরও বেশি হয়েছিল; আঞ্চলিক প্রাগার্য দেবতা ক্রমেই আর্য দেবমণ্ডলী মধ্যে অনুপ্রবেশ করছিল। সুতরাং মানুষের কতকটা বিভ্রান্তি জন্মানো খুবই স্বাভাবিক। তা ছাড়া শেষের দিকে কিছু প্রায়-বিমূর্ত দেবতা দেখা দিচ্ছিলেন, তার আগের বিস্তর দেবতা তো ছিলেনই, ফলে শেষ দিকে দিগভ্রান্ত মানুষের সংশয় তো জাগবেই: কোন দেবতাকে হাব্য দেব? যে সব দেবতাকে যজ্ঞে হব্য দান করাটাই ছিল ধর্মাচরণ, তারা তো আছেনই, তাদের সঙ্গে জুড়ছেন নতুন সর্বাতিগ দেবতারা। এদের মধ্যে হবির্দান করব কাকে? প্রশ্নটা সমাজে অনুত্তরিতই রইল। কিন্তু যজ্ঞবিধির শেকড় টান লাগল। ফলে ওই সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়গুলির অবিশ্বাস ও জিজ্ঞাসা এবং ব্রাহ্মণ্য সমাজের মধ্যেই ক্রমবর্ধমান সংশয়–এ দুইয়ে মিলে ব্রাহ্মণ্য সমাজেরই অভ্যন্তরে নতুন একটি ধর্মধারা প্রবর্তিত হল।

সংহিতাব্রাহ্মণে যজ্ঞ নিয়ে যে-কর্মকাণ্ডের বিবরণ পাওয়া যায় নতুন ধারার মধ্যে তার প্রথম দিকের সাহিত্য আরণ্যক। এগুলি এবং এগুলির পূর্ববর্তী কিছু ব্রাহ্মণের শেষ দিকে একটা নতুন প্রবণতা হল যজ্ঞের রূপক ব্যাখ্যা দেওয়া। যেমন তৈত্তিরীয় আরণ্যক (৩:১)-এ বলা হয়েছে, 'ওম, বুদ্ধিই হল চমস, চিন্তা হল ঘৃত, বাক বেদি, কুশ ধ্যান, অগ্নি কামনা...' ইত্যাদি। এই ধরনের বহু কথা আরণ্যকে আছে। আরণ্যকসাহিত্য খুবই ক্ষীণকলেবর, মাত্র তিনটি: ঋগ্বেদের একটি ঐতরেয়, যজুর্বেদের দুটি, শাঙ্খায়ন (বা কৌষীতকি) আর তৈত্তিরীয়। প্রাণ এখানে খুব প্রাধান্য পেয়েছে। তাকে নানা দণ্ড, অগ্নি ও যজ্ঞীয় বস্তুর সঙ্গে একাত্ম করে দেখানো হয়েছে। স্বভাবতই মনে আসে, এর পেছনে কী তাগিদ কাজ করছিল? যজ্ঞ-অনুষ্ঠানের জন্য যজ্ঞয় বস্তুগুলির স্বরূপ নির্ণয়ের কোনও প্রয়োজন নেই, তবে কেন এই ধরনের সমীকরণ বারে বারে দেখা দিচ্ছে এখন?

স্পষ্টতই যজ্ঞ যখন তার অভিধাগত অর্থে নির্ম্মফল প্রতিপন্ন হয়েছে, তখনও তাকে সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্যে এই ভাবে তাকে ভিন্নতর ব্যাখ্যার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। আগে কয়েকশো বছর যজ্ঞ তার সাধারণ আক্ষরিক অর্থেই মানুষের কাছে চলিত ছিল, যজ্ঞ ও যজ্ঞফলে মানুষের কতকটা বিশ্বাস ছিল বলে অন্য রকম ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা ছিল না। এখন যজ্ঞের সার্থকতা নিয়ে জনমানসে সংশয় দেখা দেওয়ার ফলে সাধারণ শব্দার্থকে পেরিয়ে অন্য ভাবে দেখানো হচ্ছে। বলা হচ্ছে, ইন্দ্রিয়গোচর, বুদ্ধিগোচর যে-যজ্ঞগুলির অনুষ্ঠান করা হচ্ছিল সেগুলি শুধুমাত্র সেই অর্থেই পর্যবসিত নয়, তার এক গূঢ়তর অর্থই তাদের মর্মবস্তু। ব্রাহ্মণসাহিত্যেও মাঝে মাঝে যজ্ঞীয় বস্তুগুলির সঙ্গে অন্যান্য বস্তুর সমীকরণ আছে, কিন্তু সেখানে অন্যান্য বস্তু দার্শনিক হয়; বস্তুজগতের থেকেই তা অনেক বেশি সংকলিত এবং তাতে যজ্ঞ প্রচলিত অর্থে যজ্ঞই থাকছে। কিন্তু এমন একটা সময় নিশ্চয়ই এসেছিল যখন ওই অভিধাগত অর্থে মানুষ আর যজ্ঞকে মানতে পারছে না, অথচ পুরোহিততন্ত্র যজ্ঞকে সচল রাখতে চায়। সাধারণ মানুষের মনের মধ্যে যজ্ঞ সম্বন্ধে একটা দুর্বোধ্য সম্ভ্রমবোধ রয়ে গেছে, তাই সেইটেকে কাজে লাগিয়ে শাস্ত্রকাররা বলতে চাইলেন, 'যে-যজ্ঞ চোখে দেখছ, কানে শুনছ, প্রকৃত প্রস্তাবে যজ্ঞ তাকে অতিক্রম করে অন্য এক ভাবলোকে এক অতীন্দ্রিয় স্তরে সত্য।'

এ ব্যাখ্যার অন্তরালেও এক ধরনের সংশয় সক্রিয়। যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। অথচ তার থেকে প্রতিশ্রুত ফল যে পাওয়া যাচ্ছিল না তার প্রমাণ পাওয়া যায় যজ্ঞ নিয়েই যে দর্শনপ্রস্থান–জৈমিনির মীমাংসা, যা আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে গড়ে উঠেছিল প্রায় হাজার বছর পরে (খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে) তার ওপরে কুমারিলভট্ট ভাষ্য রচনা করেন। তাঁর বড় গদ্যগ্রন্থটি তন্ত্রবার্তিক আর ছোট ছন্দোবদ্ধ গ্রন্থটি শ্লোকবার্তিক। তন্ত্রবার্তিক-এর প্রথম অধ্যায়ে দ্বিতীয় পাদের তৃতীয় সূত্র বলছে, যদি (বৈদিক) শাস্ত্রাংশগুলি বর্তমানকালের

ঘটনা সম্বন্ধে বলছে এমন না। ধরা হয়, (কিন্তু ভবিষ্যতে যাতে ফল দেখা দেয়। এ জন্য বিধান নির্দেশ করছে ধরে নেওয়া হয়) তা হলে সেগুলি খণ্ডিত হয়। এটা এই কারণে যে, তেমন ফল কেউ দেখে না।' ওইখানেই চোদ্দো-সংখ্যক সূত্র বলে, 'যজ্ঞ থেকে সেই সব মহৎ ফল যে ফলবে এ কথা কে জানে?' শ্লোকবার্তিকের দশম অধ্যায়ের দ্বিতীয়-তৃতীয় পাদের পঞ্চম সূত্রটি বলে, চিত্রা, যাগ, ইত্যাদি সম্বন্ধে শাস্ত্রাংশগুলি যে বলে, সে সব থেকে পশুলাভি, ইত্যাদি ফল পাওয়া যাবে, তা মিথ্যা; কারণ যদিও সেগুলি (শাস্ত্রাংশগুলি) দৃশ্যমান ফল সম্বন্ধে বলে তবু বাস্তবে তেমন কোনও বস্তুই দেখা যায় না।' দর্শনটির একটি বৈশিষ্ট্য হল এতে মোক্ষের আলোচনা একেবারেই নেই; যজ্ঞ এবং ঐহিক যজ্ঞফলই এর বিষয়বস্তু। যজ্ঞকর্মকে অবলম্বন করে যে একটিমাত্র দর্শনপ্রস্থান গড়ে উঠেছে তা হল মীমাংসাদর্শন, তারই ভাষ্য করেছেন প্রখ্যাত পণ্ডিত কুমারিলভট্ট এবং এই ভাষ্য দ্ব্যর্থতাহীন ভাবে ঘোষণা করছে যে, যজ্ঞ যে সব ফলপ্রাপ্তির আশা দেয় বাস্তবে তা ঘটে না। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের মধ্যেই বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধারার অন্তর্গত শাস্ত্রই স্বীকার করছে যজ্ঞ থেকে যে-ফল পাওয়ার কথা তা পাওয়া যায় না।

খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতক থেকে বেদবিরোধী ও যজ্ঞবিরোধী যে সব মতবাদ, জৈন, বৌদ্ধ, আজীবিক, ইত্যাদির অভ্যুত্থান ঘটেছিল তার সবগুলিরই পিছনে এই ধরনের ব্যর্থতাবোধের অভিজ্ঞতা ছিল। মানুষের সব প্রয়োজন যদি যজ্ঞে মিটত তা হলে যজ্ঞ সম্বন্ধে সংশয়ের কোনও অবকাশই থাকত না। কিন্তু যজ্ঞ করে যখন গোধনপ্রাপ্তির আশা জাগে, তখন যজ্ঞের কিছুকাল পরেও যদি গোধন না পাওয়া যায়, তা হলে যে-কোনও মানুষের মনেই সংশয় জাগবে। ব্যাপক ভাবে এমন সংশয় সমাজে না থাকলে বেদে তার উল্লেখ রক্ষিত হত না। একাধিক উচ্চারণে যে-সন্দেহ ব্যক্ত হয়েছে তার ভিত্তিতেই মীমাংসাদর্শনের ওই সাহসী ঘোষণা। যজ্ঞ ও যজ্ঞফলের মধ্যে স্বল্প কিছুকালের

ব্যবধান থাকলে মানুষ ধৈর্য ধরে প্রতীক্ষাই করত, হতাশ বা সন্দিহান হত না; কিন্তু সুদীর্ঘকালের মধ্যেও যখন প্রতিশ্রুত যজ্ঞফলের দেখা মিলত না তখন অনিবার্য ভাবেই দেখা দিত সংশয়।

আরণ্যকে প্রথমবার স্পষ্ট করে মরণোত্তর জীবন সম্বন্ধে বেশ কিছু কথা আছে (ব্রাহ্মণসাহিত্যেই এর সূত্রপাত, তবে সেখানকার উল্লেখগুলি খুব স্পষ্টও নয়, বিস্তৃতও নয়)। শাখায়ন আরণ্যকে দেখি, মৃত্যুর পরে আত্মা পরলোকে গেলে তার কী রকম অভ্যর্থনা হয়: তার পাপ ও পুণ্য কর্ম তার প্রিয়জন ও বিদ্বেষভাজনদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়, তার পর সে ব্রহ্মার দিকে এগোয় (পথের ভূদৃশ্য, গাছপালা, নদী, এ সবের স্পষ্ট বিবরণ দেওয়া আছে)। ব্রহ্মা তাকে প্রশ্ন করেন, 'তুমি কে?' সে উত্তর দেয়। তখন ব্রহ্মা তাকে বলেন, 'তুমি যে আমিও সেই' এবং তাকে ব্রহ্মালোকে আমন্ত্রণ জানান। এ পর্যন্ত পরলোক সুখের স্থান; ঋগ্বেদে যম (যিনি তখনও মৃতদের অধিদেবতা, মৃত্যুর নন) পরলোকগত আত্মার দেখাশোনা করেন ও পূর্বাগতদের সঙ্গে তাকে আনন্দে রাখেন। এখানে ব্রহ্মা তাকে আহ্বান করে ব্রহ্মলোকে সমাদরে স্থান দেন। অর্থাৎ মৃত্যুর পর মানুষ এক ইচ্ছাপূরক অস্তিত্বের সন্ধান পায়, যেখানে আছে আনন্দ ও অভ্যর্থনা। নরকের কল্পনা তখনও আসেনি। সকলেই স্বর্গে স্থান পায়। জন্মান্তরের জন্যে প্রার্থনা আছে, 'চন্দ্রের মতো যেন আমি পুনর্জত হই'। (ঐতরেয় আরণ্যক ৫:১) জন্মান্তরের ক্ষয় বা মোক্ষের কোনও কল্পনা এখনও নেই। যদি কেউ অ-সৎকে (অবিদ্যমান) ব্রহ্মা বলে জানে, যদি কেউ সৎকে ব্রহ্মা বলে জানে...'' (তৈত্তিরীয় আরণ্যক ৯:১৯) অর্থাৎ অস্পষ্টতার দিকে, অনির্দেশ্যতার দিকে একটা প্রবণতা লক্ষ করা যায়।

পূর্বের যজ্ঞ ও দক্ষিণার সঙ্গে বুপাি্কস্তরে একটা আপস লক্ষ করা যায়। মনে রাখতে হবে যে, আরণ্যকের গ্রন্থগুলি অরণ্যে পাঠ করতে হত। তৈত্তিরীয়

আরণ্যকের একটা অংশের নাম কুবের সংহিতা'' (কুবের বৈদিক সাহিত্যে সদ্যসমাগত)। সেখানে কুবেরের উপাসনা অরণ্যে করার বিধান আছে, কারণ তা সমস্ত কামনা পূরণ করে; এর দক্ষিণা হয়, একটি গাভি, পিত্তল, ক্ষৌমবস্ত্র অথবা সূক্ষ্ম শূত্র বসন।।' (১:৩২:৩) আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতকে তৈত্তিরীয় আরণ্যক রচিত হয়। এ সময়ে দেশে অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যের অবস্থা বেশ ভাল, নানা ভাবে দেশে সম্পত্তি ও সমৃদ্ধি আসছে; কাজেই এ পটভূমিকায় কুবেরের উপাসনা প্রবর্তিত হওয়া স্বাভাবিক। যেটা চোখে পড়ে তা হল, আরণ্যকে বা অরণ্যে পাঠ করতে হবে ছত্রকে, সেখানে সম্পদ বৃদ্ধির জন্য কুবেরের উপাসনাও একটি পাঠ্য বিষয়। ঐতরেয় আরণ্যকে ঋষি কাবিষেয় বলছেন, 'কেন আমরা স্বাধ্যায় অভ্যাস করব, কেন যজ্ঞ করব? তার চেয়ে বরং বাককে প্রাণে বা প্রাণকে বাকে আহুতি দেব।' (৩:২:৬) এখানে লক্ষণীয় যে স্বাধ্যায় ব্রহ্মচর্যের এবং যজ্ঞ গার্হস্থ্য আশ্রমের, ঋষি এ দুটির উপযোগিতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলেছেন, এবং নিজেই সমাধান দিচ্ছেন: বাক স্বাধ্যায়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং আহুতি দেওয়া যজ্ঞকর্মের অন্তর্গত। তাই বাস্তবে ব্রহ্মচর্য পালন এবং যজ্ঞ করার রূপক বিকল্প দিচ্ছেন, যেটা মানুষ কেবল মনে মনেই করতে পারে। তা হলে কর্মকাণ্ড অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য ও গার্হস্থ্য আশ্রমে পালনীয় কর্তব্য এখন দুটো মানসিক প্রক্রিয়ার দ্বারাই সাধন করা যাবে। এই ভাবে কর্ম থেকে জ্ঞানে উত্তরণ ঘটছে।

মনে রাখতে হবে যে, ব্রহ্মচর্য ও গার্হস্থ্য ছিল সংহিতা ও ব্রাহ্মাণের ধর্মাচরণ। এবং এই পর্যায় সম্বন্ধে অনেক সাধারণ মানুষের মনে সংশয় দেখা দিয়েছে, অথচ সহসা এত শতাব্দীর আচরণকে বাতিল করা যাচ্ছে না; তাই রূপক আকারে সেগুলির অনুষ্ঠান করবার বিধান দেওয়া হচ্ছে। এখন লক্ষ করতে হবে, বিকল্পগুলি কী ধরনের: যজ্ঞ, যা কায়িক ভাবে বাস্তবে সম্পাদন করা হত তার বিকল্প প্রাণকে বাক-এ, এবং বাককে প্রাণে আহুতি দেওয়া, অর্থাৎ

প্রত্যক্ষ কর্মসাধ্য যজ্ঞের বিকল্প হল পরোক্ষ মানসক্রিয়া। উপকরণ দিয়ে, কায়িক প্রয়াস দিয়ে যা করবার কথা ছিল, সংহিতা ব্রাহ্মাণের সেই পর্বকে বলা হত কর্মকাণ্ড; মন, চিন্তা, ধ্যান, কল্পনা দিয়ে যে-প্রয়াস তার বিকল্প হিসেবে উপস্থাপিত হল এ বার তার নাম হল জ্ঞানকাণ্ড। মৃত্যু নিয়ে এখানেও যথেষ্ট উৎকণ্ঠা আছে। বরং তা বেড়েছে বলা যায়, মৃত্যুর পরেও মানুষের আবার মৃত্যু হয়, তার নিজের কর্মগুলি তাকে গ্রাস করে।' (তৈত্তিরীয় আরণ্যক ১:৮:৩)। তা হলে মরণোত্তর অবস্থা নিয়ে উৎকণ্ঠার সঙ্গে সংশয়ও আছে। পুনর্বার মৃত্যু একটা ভয়াবহ সম্ভাবনা। অতএব স্বভাবত এর থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার আগ্রহ আরণ্যকে প্রবল এবং এর আগ্রহ প্রবলতর হয় জ্ঞানকাণ্ডের শেষ ভাগ উপনিষদে।

বিশ্বচরাচর নিয়ে কৌতুহল ও সংশয়ও আরণ্যকে ব্যক্ত হয়েছে:

আকাশ কীসে আশ্রিত? সংবৎসরের গুঢ় রহস্যটি কী? দিন কোথায়, হে দেব, এই রাত্রিই-বা কোথায়? মাস ও ঋতুগুলি কোথায় বিধৃত? সলিলের নিবাস কোথায়? সে কোন সত্তা, যার মধ্যে এই দুটি (আকাশ ও পৃথিবী) আধৃত? আমি তোমাকে প্রশ্ন করি: মৃত্যুর পরে কী থাকে সে সম্বন্ধে... যম কোথায় পাপীকে নির্যাতন করে? (তৈত্তিরীয় আরণ্যক ১:৮:১-৪)

এখানে মরণোত্তর অবস্থা নিয়ে সংশয় অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে। আরও লক্ষণীয় যে, খুব আবছা ভাবে হলেও নরকের একটি কল্পনা এখানে আছে–নরকে যম পাপীকে শাস্তি দেয়, অত্যাচার করে। অর্থাৎ এখানেই প্রথম দেখছি, মৃতদের রাজা যম, পৃথিবীর রাজারা যেমন অপরাধী এবং/বা অসহায় প্রজাকে পীড়ন করে তেমন করেই যমও অপরাধীকে দণ্ড দেন। এ অংশে যে-প্রশ্নগুলি উচ্চারিত সেগুলির প্রথম প্রকাশ সংহিতাতেই; অতএব মনে হয়, যুগে যুগে এইসব সংশয় মানুষকে উত্তরোত্তর বিচলিত করেছে।

প্রজাপতির পুত্র আরুণি সুপর্ণেয় পিতার কাছে এসে প্রশ্ন করে, 'কাকে আপনারা শ্রেষ্ঠ (মহত্তম) বলেন?' পিতা উত্তর দিলেন, 'সত্য, তপঃ, সংযম, দান, ধর্ম এবং সন্ততি।' (তৈত্তিরীয় আরণ্যক ১০:৬৩:১)। এখানে কর্মকাণ্ডের পরে জ্ঞানকাণ্ডের যে-স্বকীয় বৈশিষ্ট্য তা স্পষ্ট ভাবে চোখে পড়ে; এ উত্তরগুলির অধিকাংশেরই কর্মকাণ্ডের সঙ্গে প্রত্যক্ষ কোনও যোগ নেই–সন্ততি ছাড়া। আরণ্যকে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে নৈতিকতা, জ্ঞানকাণ্ডে বিশেষ ভাবে গুরুত্ব দেখা যায়, তপ ও ধর্মের কারণ এখন দৈহিক প্রয়াসীসাধ্য যজ্ঞের চেয়ে মানসিক প্রচেষ্টসাধ্য জ্ঞানেরই তাৎপর্য বেশি।

এই যুগে দেখা গেল ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে প্রথম শ্রেণিবিভেদ। মানসিক শ্রম প্রাধান্য পেল কায়িক শ্রমের ওপরে, এ-ও আর-একটা বিভাজন। এই সঙ্গেই আর-একটা বিভাজন ঘটেছিল সমাজে: পাকাপাকি একটি পুরোহিত-শ্রেণির অভুত্থান। এরা পরোপজীবী, এই সঙ্গে ধর্ম বা শাস্ত্র হয়ে উঠল। প্রাথমিক ভাবে জ্ঞানলভ্য। যখন নগর সভ্যতা বিভক্ত হয়ে একটি পুরোহিত-শ্রেণিকে অন্তর্ভুক্ত করে যে-শ্রেণি চিন্তাজগতের বস্তুকে শাস্ত্রে বিধিবদ্ধ করে তখন তার ফল হয় ধর্মতত্ত্বের উদ্ভব।'(২) মানসিক শ্রম এক বিশেষ অর্থে পুরোহিতরা করে, তাই এই সময় থেকে পুরোহিত-সম্প্রদায়ও বিশেষ করে শ্রদ্ধা-সম্ভ্রমের পাত্র হয়ে উঠল। ব্রাহ্মণসাহিত্যের শেষ অংশ থেকে আরণ্যক উপনিষদ পর্যন্ত এই ধরনের আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা বিশেষ একটি মহিমায় মণ্ডিত হয়ে ওঠে। এই যুগে দেহ ও আত্মার পৃথক সত্তার স্বীকৃতিও নতুন একটি বিভাজন। আত্মা শব্দটি প্রথম দিকে দেহকেই বোঝাত, (জার্মান ভাষায় atmen মানে শ্বাস নেওয়া। ওই ধাতুর থেকে নিষ্পন্ন ইন্দো-ইউরোপীয় একটি শব্দ আত্মা)। কিন্তু পরে দেহাতিরিক্ত স্বতন্ত্র একটি সত্তাকে অভিহিত করল আত্মা শব্দ। এই বিভাজনটি এ যুগের একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বিভাজন। আত্মাই সত্য এবং গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হতে লাগল। এর পর

থেকে দেহ গৌণ, নশ্বর ও হীন বলে গণ্য হল, পুরোহিত শাস্ত্রকারদের সমস্ত ঝোকটা পড়ল আত্মার ওপরে। ফলে মানসিক শ্রমের তুলনায় কায়িক শ্রমের ন্যূনতা ও হীনতা সমর্থিত হল। সমাজে এ সময়ে, অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম থেকে ষষ্ঠ-পঞ্চম শতকের মধ্যে, লিপি, মুদ্রা, জ্যোতিষ ও বেদাঙ্গে আলোচিত নানা নতুন বিদ্যাচর্চার সূত্রপাত হয় এবং এর পশ্চাতে সমাজে ধীরে ধীরে মৌলিক কতকগুলি স্থায়ী পরিবর্তনও ঘটছিল। তার মধ্যে প্রধান একটি হল প্রাচীন গোষ্ঠী (tribe)গুলি ভেঙে প্রথমে কৌম (class) ও পরে কুলের (বৃহৎ একান্নাবতীর্ণ পরিবার, যেখানে তিন-চার প্রজন্ম একই বাড়িতে বাস করে) উদ্ভব। পিতৃতান্ত্রিক সমাজের প্রাচীন এককগুলি ক্রমশ কৃষিভূমি ও গোচারণভূমি নির্ভর ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত হচ্ছিল। এই সব প্রক্রিয়া যখন সমাজে চলছে তখন মানুষ তার আশপাশের জগৎকে যে ভাবে দেখত সে-দেখা বদলাতে লাগল। সমাজে এই যে নানা বিভাজন ঘটছিল এর একটা দৃঢ় ও স্থায়ী প্রতিক্রিয়া মানুষের মনোজগতে অনিবার্য ভাবেই ঘটছিল। ‘এতে প্রতিফলিত হচ্ছিল প্রকৃতি সম্বন্ধে মানুষের চেতনার একটা বিভাজন, যেটির উৎস. সমাজে অনুরূপ একটি বিভাজন।’(৩)

সারা পৃথিবীতেই এই যুগে মননের জগতে একটা প্রকাণ্ড তোলপাড় লক্ষ করা যায়। গ্রিস, মিশর, চিন, পারস্য, ভারতবর্ষ –সর্বত্রই এই যুগে পুরোনো চিন্তাধারায় একটা আমূল পরিবর্তন দেখা দিল, পূর্ব যুগের তুলনায় এ পরিবর্তনগুলি যেমন মৌলিক, তেমনই আপেক্ষিক ভাবে দ্রুত। বৃহৎ ভূমধ্যসাগরীয় মধ্যপ্রাচ্যে, চিন ও ভারতবর্ষে এটা দেখা গেল। ব্যাপারটা তুলনামূলক ভাবে দ্রুত ঘটলেও বাস্তবে আকস্মিক নয়। এটি নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল ওই বৃহৎ ভূখণ্ডে মানুষের ব্যবহারিক জীবনের অবগঠনে (infrastructure) যে সব মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছিল, মানুষের অধিগঠনে (superstructure) তারই প্রতিফলন হিসাবে। সমাজের মানুষ দেখেছে গোষ্ঠী ভেঙে কৌম হয়েছে; খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকের আগে থেকেই কৌম

ভেঙেছে, সৃষ্টি হয়েছে ‘কুল, বৃহৎ একাস্তবতী পরিবোর; অর্থাৎ সমাজের এককটি ক্রমেই ছোট হচ্ছে। শ্রী েতযাগ যখন চলিত ছিল তখন সমস্ত গোষ্ঠী এবং পরে বহু কৌম একত্রে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করত, গৃহত্যাগ হয় প্রতি পরিবারে, অর্থাৎ সেখানে পরিসর ছোট। বাণিজ্য, বিশেষত বহির্বাণিজ্যের প্রসারের সময়ে মুদ্রার প্রচলন হয়। আগে কেনাবেচা হত প্রধানত গাভি এবং অন্যান্য বস্তু ও দ্রব্যের বিনিময়ে, এখন মুদ্রা, লিপি প্রবর্তন হওয়ায় সব কিছুরই লিখিত হিসাব বা দলিল থাকে। এ সব কিছুরই গভীর ও স্থায়ী প্রতিক্রিয়া ঘটে সাধারণ মানুষের মনে। সংখ্যায়। তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ, অথচ তাদের অধিকাংশই গ্রাসাচ্ছাদনের বেশি কিছু পায় না, ফলে বিপদে-আপদে ধনী মহাজনের কাছে ঋণ নিতে বাধ্য হয়; সুদ দিতে হয়, না পারলে কঠোর শাস্তি। তাই অথর্ববেদে প্রার্থনা আছে: আমাকে এমন লোকে নিয়ে যাও মৃত্যুর পরে যেখানে খাতকের ওপর উৎপীড়ন নেই।

যে সমাজে ধনী-দরিদ্র শ্রেণিবিভাগ ঘটেছে সেখানে অধিকাংশ দরিদ্রের ওপরে ধনীর পীড়ন আছে। যেখানে মননশ্রমিক প্রভুত্ব করে কায়িক শ্রমিকের ওপরে, সেখানেও মুষ্টিমেয় কিছু লোকের প্রতাপের অধীন সংসারের বহুসংখ্যক লোক। আত্মা নিয়ে পুরোহিত-শাস্ত্রকাররা যখন আলোচনায় মগ্ন, তখন সাধারণ মানুষ দেহের পুষ্টি, ক্ষুধার খাদ্য, পরনের বস্ত্র, রোগের ওষুধ, বিপদের সমাধান, ঋণের বোঝা ও শোধ না করতে পারার যন্ত্রণা কমাতে পারছে না। এ জীবন তার পক্ষে ক্রমেই দুঃসহ হয়ে উঠছে।

এই আবহাওয়াতে, এই সময়ে দেশের বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে জন্মান্তরবাদ- কীব্রাহ্মণ্য, কী বৌদ্ধ, কী জৈন, কী আজীবিক সব ধর্মমতই জন্মান্তরকে স্বীকার করে নিয়েছে। সাধারণ মানুষের কাছে জীবন যতই মূল্যবান হোক, এই ঋণ-ব্যাধি-দারিদ্র্য-সংকুল জীবনের পুনরাবৃত্তি কেমন করে লোভনীয়

হবে? যমের সন্নিধানে পরলোকে পূর্বমৃতদের সঙ্গে আনন্দে থাকার পরিবর্তে আবার পৃথিবীতে এসে মালিকের মারধর, মহাজনের অত্যাচার, মনিবের গঞ্জনার সঙ্গে আবার আধাপেটা খাওয়া, অধিকাংশ অভাব না মেটা, রোগব্যাধিতে নিস্প্রতিকার যন্ত্রণা সহ্য করে তিলে তিলে অচরিতার্থ জীবনের অবসান–এ সম্ভাবনা কেন তাকে প্রলুব্ধ করবে? সমাজ সব দিকেই পালটাচ্ছিল এবং প্রত্যেক পরিবর্তনে নিচের তলার মানুষের জীবনযাত্রা ক্রমেই দুর্বিষহ হয়ে উঠছিল।

'সংহিতাব্রাহ্মণের যুগে যে জীবনের ছকে, সমাজের যে অবগঠনে মানুষ পরিচিত ছিল, উৎপাদনব্যবস্থা ও উৎপাদন সম্পর্কিত যে মানবিক সম্পর্কগুলির সম্বন্ধে তাদের যে বোধ ছিল সেগুলি প্রবল ভাবে আলোড়িত হল। ফলে চিন্তার জগতে প্রাচীন মূল্যবোধ ও প্রত্যয়গুলি আর পূর্বের মতো রইল না। গোষ্ঠী থেকে কৌম থেকে কুল–এ পরিবর্তনে সামাজিক একক ক্রমেই আয়তনে হ্রস্ব ও ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছিল। এর ফলে মানুষের অভ্যন্তরীণ একাকিত্বের বোধ বাড়ছিল। আরণ্যকেই পূজার প্রাথমিক চিহ্নগুলি পাওয়া যায়। আর পাওয়া যায় নানা নতুন দেবদেবীর নাম, যাঁরা পূর্বের যজ্ঞবিধির সঙ্গে সম্পূর্ণ অসম্পৃক্ত; আর্য-প্রাগার্য সংমিশ্রণের অনিবার্য ফল হল, দুটি দেবমণ্ডলীর পরস্পরের সম্মুখীন হওয়া এবং একটির মধ্যে অন্যটির ধীরে ধীরে অন্তলীন হয়ে যাওয়া। এরই ফলে ব্রাহ্মণ্য দেবমণ্ডলী খুব দ্রুত স্ফীত হয়ে উঠছিল, সৃষ্টি হল 'বিশ্বে দেবাঃ' সংজ্ঞা, উদিত হল প্রশ্ন: কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম। 'একটি সমাজের আদিমতম সাংবিধানিক সংগঠন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একাকী হয়ে পড়াটা মানুষকে সেই সব অভিজ্ঞতাতে অংশগ্রহণ করতে দেয় না। যেগুলি থেকে অতিলৌকিক বিশ্বাস উৎপন্ন হতে পারে বা সমর্থিত হতে পারে। মানুষ যে সব সংগঠনের সবটা অথবা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ জানতে বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, এটা ধরে নিলে তত্ত্বগত ভাবে কতকগুলি সামাজিক সংগঠনের বহু লক্ষণকে ধ্বংস করা হয় যা এ সংগঠনগুলিকে

একটা অতিলৌকিক মহিমা দান করে–এগুলির অদৃশ্যত্ব, অমরত্ব, ব্যাপ্তিত্ব, অজ্ঞাতত্ব, অলঙ্ঘ্যত্ব এবং উদ্দেশ্যকে সরাসরি প্রভাবিত করে (মানুষের) আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা।'(৪) এই উদ্ধৃতির রচনাকাররা যে-মূল কথাটি বলতে চান তা হল, সমাজ-সংগঠনের অর্থাৎ উৎপাদন, বণ্টন এবং এগুলির সঙ্গে সম্পৃক্ত যে-মানবিক সম্পর্কগুলি, তার ওপর থেকে যখন সমাজের সাধারণ মানুষের নিয়ন্ত্রণের অধিকার একেবারে চলে যায় তখন মানুষের মধ্যে এমন এক ধরনের বিচ্ছিন্নতাবোধ জন্মায় যাতে অতিলৌকিকে তার বিশ্বাস টলে যায়। মানুষ যে সমাজ-সংগঠনের মূল চরিত্রগুলি জানতে বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এ কথা মেনে নিলে সমাজের কিছু সংগঠনে–যেমনধর্মবিশ্বাস বা ধর্মাচরণে–যে একটা অতিলৌকিকের মহিমা আরোপিত আছে তা নষ্ট হয়ে যায়। এই অতিলৌকিকতা হল অদৃশ্যত্ব, ইত্যাদি। যে কালপর্বের আলোচনা হচ্ছিল, সেই সময়ে এই ধরনের বিশ্বাস টলে যাচ্ছিল; গোষ্ঠীর অভ্যন্তরে অবস্থানের যে সমবেত নিরাপত্তাবোধ তা কৌমে ও কুলে এসে ভেঙে গেল। মানুষ এক ধরনের একাকিস্তত্ব ও হতাশার সম্মুখীন হল, যার প্রতিকার তৎকালীন সমাজ-সংগঠনে ছিল না। সে সমাজে মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগী একটি শ্রেণিই প্রধান, যাদের বাড়তি সুবিধাগুলি আসছিল সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত রাখা থেকেই। এই সময়ে শ্রেণিবিভাজন ও পরে নগরায়ণে সমাজে যে বিন্যাস দেখা দিল তাতে সমাজের ওপরতলার মুষ্টিমেয় লোক নীচের তলার অগণ্য মানুষের ভাগ্যনিয়ন্তা হয়ে উঠল, ফলে সমাজের গতিপ্রকৃতি নিরূপণে বা নিয়ন্ত্রণে সাধারণ মানুষের আর কোনও যোগ বা অধিকার রইল না। এ দিকে নানা কারণে–যেগুলি আলোচনা করা হল–সাধারণ মানুষের জীবন কষ্টকর ও নানা ভাবে আপৎসংকুল হয়ে উঠল। তখন সমাজের সব স্তরেই জন্মান্তরবাদ প্রবল ভাবে গৃহীত, ফলে হতাশা। ভবিষ্যৎ জন্মান্তর সম্বন্ধে অনীহা খুব স্বাভাবিক ভাবেই প্রকাশ পেল। সমাজের ওপরতলায় যারা চাষি-মজুরের মালিক, নিজেরা কায়িক শ্রম করে না। কিন্তু কায়িক শ্রমে উৎপাদিত উদ্বৃত্ত,

প্রাচুর্য ও সুখ ভোগ করে তাদের পক্ষে জন্মান্তর কাতক্ষণীয়। ফলে সে-মহলে জন্মান্তরবাদ যে সাদরে গৃহীত হবে তা তো খুবই স্বাভাবিক; কিন্তু জীবনের অর্থ যাদের কাছে আধাপেটা খেয়ে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করেও নানা কারণে ওপরওয়ালার কাছে নিগ্রহ ভোগ করা তাদের কাছে জন্মান্তর যে বিভীষিকারূপে দেখা দেবে। তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

এ ছিল অনিবার্য কিন্তু ধীরগতির এক প্রক্রিয়া, '...প্রাথমিক এক প্রকৃতিনিষ্ঠ সমন্বয়ের মনোভাব, যাতে মানুষের অন্তরাত্মা তখনও প্রবল ভাবে পৃথিবীবিরোধী মনোভাব থেকে চুড়ান্তভাবে বিশ্ববিদ্বেষী, দেহবিদ্বেষী অবস্থানে পৌঁছোয়নি এবং সে-অবস্থান থেকে স্বভাবত দ্বৈততা ও নৈরাশ্যে পৌঁছোয়নি, (কিন্তু) ধীরগতিতে সেই জ্ঞানমার্গের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে...।'(৫) এই অংশে দুটো শব্দ লক্ষ করা প্রয়োজন: বিশ্ববিদ্বেষী ও দেহবিদ্বেষী। বিশ্ব, যা তাদের সামাজিক সত্তার কাছে প্রকৃতির রূপে প্রতিভাত হত, তার প্রকাশ কতকগুলি প্রাকৃতিক বিপর্যয়, যার বিরুদ্ধে সাধারণ দরিদ্র মানুষ সম্পূর্ণ অসহায়: খরা, অজন্মা, প্লাবন, অকালাবর্ষণ, অতিবৃষ্টি, বন্যা, ভূমিকম্প এ সবে সকলেরই ক্ষতি, কিন্তু গরিব মানুষ এ সবে সর্বস্বান্ত হয়। তাই বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধে সম্ভ্রম বিস্ময়ের চেয়ে এর থেকে সম্ভাব্য বিপদ ও আতঙ্কতেই মানুষ বিপর্যস্ত হয় বেশি। দ্বিতীয় শব্দটি, দেহবিদ্বেষী। প্রথমত, মানুষ মোটাদাগের দুঃখকষ্টগুলি দেহ দিয়েই অনুভব করে, তাই দেহ এদের কাছে দুঃখভোগের আধারমাত্র। (লক্ষণীয়, সংস্কৃতে দেহবাচক শব্দগুলির মধ্যেই একটা হতাশা অন্তর্নিহিত: দিহ্যতে, কষ্ট পায়; (দেহ) চীয়তে, চিতায় চয়ন করা হয়; (কায়) শীর্যতে, শীর্ণ হয়; তা ছাড়া ব্রাহ্মণসাহিত্যের শেষ অংশ থেকে দেহাতিরিক্ত আত্মা সম্বন্ধে একটি ধারণা উদিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গুরুত্বে দেহ গৌণ হয়ে যাচ্ছে, আত্মাই হয়ে উঠছে মুখ্য। অতএব এ সময়ে দেহবিদ্বেষ খুবই স্বাভাবিক। যারা তত্ত্ব

প্রতিপাদন করেছিলেন, দেহ এবং দেহ দিয়ে ভোগ্য সমস্ত আরাম ও বিলাস তাঁদের আয়ত্তের মধ্যে। কাজেই আত্মার প্রাধান্য স্বীকার করলে তাঁদের কোনও ক্ষতি নেই, ভোগ্যবস্তু তাঁদের হাতছাড়া হবে না এবং জন্মান্তরে ওই সব ভোগ করার সম্ভাবনা থাকায় তাঁদের দেহবিদ্বেষ ঘোষণা করার কোনও দরকার ছিল না। কিন্তু তত্ত্বটা শুনছে যারা, তাদের তিক্ত অভিজ্ঞতা তাদের এমনই দেহবিমুখ করে রেখেছে। কাজেই আত্মা থাক বা না থাক, দেহ যে কষ্টভোগের আধার। এ নিয়ে তাদের কোনও দ্বিমত নেই। আত্মার তত্ত্বটা মনন দিয়ে বুঝবার; তা এত সূক্ষ্ম যে সাধারণ মানুষ সহজে বোঝে না, বুঝলেও যে আত্মা কোনও আশু প্রয়োজন সিদ্ধ করে না, যন্ত্রণা লাঘব করে না, তা-ই যদি জীবের শ্রেষ্ঠ সত্তা হয়ও, তা হলে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার তাতে কোনও হেরফের হয় না। ক্ষুধাতৃষ্ণা, রোগব্যাধি, কশাঘাত ও নানা রকম অত্যাচার, যা গরিব মানুষের জীবনের নিত্যসঙ্গী একে তো আত্মা ভোগ করে না, করে দেহ, অতএব তেমন এক ক্লেশবোধবিনিমুক্ত আত্মা থাক বা না থাক তাতে এদের কিছু এসে যায় না।

এই পরিস্থিতিতে বিগত তিন-চারশো বছর ধরেই মানুষের জীবনবোধে বেশ-কিছু আমূল পরিবর্তন ঘটছিল, সাহিত্যে তার প্রতিফলন অবশ্যম্ভাবী এবং তা হয়েওছিল। ঋগ্বেদে, যেখানে, একশো বছর এই পৃথিবীতে সুখী হয়ে বঁচবার এবং উদীয়মান সূর্যকে দীর্ঘকাল ধরে দেখবার জন্যে প্রার্থনা, ঐহিক সুখসমৃদ্ধি, স্বাস্থ্য, পশু, ধন, খাদ্য, শস্য ও দীর্ঘপরমায়ুর জন্যে শত শত প্রার্থনা, সেখানে স্পষ্টতই মানুষের দৃষ্টি ঐহিক, জীবনমুখী। সংহিতাব্রাহ্মাণের কর্মকাণ্ডের শেষ দিকেই যখন মানুষের চেতনায় জন্মান্তরতত্ত্ব কায়েম হয়ে গেল, তখন স্বভাবতই মানুষ জীবনের মূল্যায়ন করতে উদ্যত হল নতুন করে: পৃথিবীতে দীর্ঘকাল বঁচাটা কাম্য কি না। প্রশ্ন উঠল, বিকল্প কী? প্রথমত, ঋগ্বেদেই মানুষের ইচ্ছাপূরক কল্পনা মৃত্যুর পর একটি মোটামুটি সুখকর

অবস্থান যম ও পূর্বে মৃতদের সান্নিধ্যে সৃষ্টি করেছিল। সেটাতে এক ধরনের সান্ত্বনা ছিল, কারণ সেখানেও ঐহিক সুখভোগের অনুবৃত্তি থাকবে এমন আশ্বাস ছিল। কিন্তু তখনই দুটি সংশয় দেখা দিয়েছে: প্রথমত, ইহলোক থেকে পরলোকে যাওয়া সহজ নয়মনুষ্যল্লোকান্নাস্মাল্লোকাৎস্বেতবামিতাঙ্গু'; দ্বিতীয়ত, কেতাজানে যে ওই লোকে(=পরলোকে) কিছু আছে বা নেই–কো হি তদ্বেন্দ যদমুন্মিল্লোকেহস্তি বা ন বেতি।' (তৈত্তিরীয় আরণ্যক ৬:১:১:১)। এ ছাড়াও পরলোক নিয়ে নানা সন্দেহ ছিল; এটা আমরা পরে দেখতে পাব।

কিন্তু এ সংশয়ের থেকে দুটি সিদ্ধান্ত হয়। প্রথমত, পরলোকের অস্তিত্ব এবং সেখানে গিয়ে সুখে থাকা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। দ্বিতীয়ত, তা হলে ইহলোকেই একমাত্র জীবন। অতএব এখানেই যথাসম্ভব জীবনকে ভোগ করা উচিত। কিন্তু মুশকিল হল, শতকরা নব্বইজন লোকের পক্ষে ইহলোকের এই জীবনটাও মোটেই সুখের বা ভোগের নয়। ভোগের বাসনা থাকলেও তার উপকরণগুলি একে একে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছিল, কাজেই বাসনা ও তার পূরণের মধ্যে ব্যবধান যতই দুস্তর হতে লাগল, সাধারণ মানুষের অবস্থা ততই ত্রিশঙ্কুর মতো হয়ে উঠতে লাগল। ইহলোকে সুখ নেই, চাইলেও পাওয়া যাবে না; সুখকর পরলোকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনও নিশ্চয়তা নেই। এমন অবস্থায় শাস্ত্রকাররা তাদের মোক্ষম অস্ত্রটি নির্মাণ করলেন: জন্মান্তরবাদ। এই তত্ত্ব বলল, ইহলোকে আচরিতার্থ বাসনা অনেক রইল, স্বর্গে গিয়ে পাবে কি না তার কোনও নিশ্চয়তা নেই, বেশ তো পরজন্মে ওই সব অপূর্ণ বাসনা পূরণ কোরো। সাধারণ মানুষের কাছে। এ সমাধানও কোনও যথার্থ সমাধান যে নয় সেটা সহজেই বোঝা যায়। প্রথমত, যে সংশয়ের বশে সুখের পরলোক সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনও প্রমাণই মেলে না, সেই সংশয়ের বশে পরজন্ম সম্বন্ধেও কোনও যথার্থ প্রমাণ পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়ত, যদি ধরেও নিই, মৃত্যুর পরে মানুষ আবার জন্মায়, তা হলেও

সেটা তো এ জীবনেরই পুনরাবৃত্তি হবে, কে জানে যে সেখানে আচরিতার্থ বাসনাগুলির পূরণ হবে? আবার যে সেখানে এই রকম দারিদ্র্যাদীর্ণ, রোগক্লিষ্ট, নিরাপত্তাহীন, অত্যাচার্যপীড়িত জীবনযাপন করতে হবে না সে বিষয়ে নিশ্চয়তা কী? সে-ক্ষেত্রে এক জীবনের যন্ত্রণাভোগ এই জীবনের সঙ্গেই শেষ হয়ে যাক, আর তার পুনরাবৃত্তিতে প্রয়োজন নেই।

মুশকিল হল, পুনর্জন্মতত্ত্ব যখন সমাজে প্রবর্তিত হল তখন সাধারণ মানুষ কী চায় না-চায় তা নিয়ে তো তত্ত্বের হেরফের ঘটানো চলে না। তা হলে, ব্যাপারটা দাঁড়াল এই রকম যে, মানুষ চাক বা না-চাক তাকে আবার জন্মাতে হবে। এ অবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ চাইবে বারংবার এ যন্ত্রণাভোগের জীবনের পুনরাবর্তন নিবারণ করা, পুনর্জন্মের শৃঙ্খল ছিন্ন করা। ঋগ্বেদ থেকে মননের জগতে প্রকাণ্ড বিবর্তন ঘটেছে: 'সুখিনঃ স্যাম শরদঃ শতম— একশো শরৎ (= বর্ষ) সুখে থাকিব, থেকে মৃত্যুর পর সুখের স্বর্গে যমের তত্ত্বাবধানে পূর্বপুরুষদের সঙ্গে সুখে বাস করা' এবং 'এ জীবনের অপূর্ণ বাসনা পরজন্মে পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা' পর্যন্ত। কিন্তু সাধারণ মানুষের সাধারণ বুদ্ধিই এর ফাকটা ধরে ফেলেছিল: পরজন্ম যে এ জন্মের চেয়ে সুখের হবে এমন দৃঢ় আশ্বাস কে দিতে পারে? অতএব উচ্চবর্ণের প্রতিষ্ঠাপন্ন ধনীর কাছে যা কাম্য অগণ্য দুঃখী মানুষের কাছে তা পরিহার্য মনে হবেই।

এই মানসিক আবহাওয়ার মধ্যে জ্ঞানকাণ্ডের উদ্ভব–আরণ্যক ও উপনিষদে। আরণ্যকে যজ্ঞকে রূপক ব্যাখ্যা দিয়ে সমর্থন করার চেষ্টা ও প্রবণতা আছে। যজ্ঞ শুধু যে ধনী, রাজন্য যজমানের ও ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের পক্ষে অপরিহার্য ছিল, তা নয়, সাধারণ মানুষও তো যজ্ঞ ছাড়া ইষ্টসিদ্ধির কোনও উপায় জানত না। বাস্তব জীবনে যেমন একটা উপায় ব্যর্থ হলে মানুষ ইষ্টসিদ্ধির জন্যে অন্য একটা বিকল্প উদ্ভাবন করে, সে যুগে ঠিক তেমনই যজ্ঞের বিকল্প

ও প্রকারভেদ। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় জানাচ্ছেন, 'প্রাচীন গোষ্ঠীগত সমাজবিধান ধ্বংস হওয়ার পরে তার থেকে উৎপন্ন একটি নতুন সামাজিক বিধানকে ব্রাহ্মণসাহিত্যের শাস্ত্রকাররা যজ্ঞের এই সব খুঁটিনাটি দিয়ে সমর্থন করবার চেষ্টা করেছিলেন।'(৬) এতে যজ্ঞ সমর্থিত হলেও তা মানুষের ইষ্টসিদ্ধির অভ্রান্ত উপায় বলে গৃহীত হল না। মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধের সমকালীন ধর্মগোষ্ঠীগুলির সঙ্গে দু-তিন শতক পর থেকেই যুক্ত হচ্ছিল মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক, বৈভাষিক মতের বৌদ্ধ প্রস্থান, দিগম্বর জৈনরা, বার্হস্পত্য এবং চার্বক ও তার অনুগামী অন্যান্য লোকায়তিক প্রস্থান। এরা বলত, নাস্তি যজ্ঞফলং নাস্তি পরলোকঃ—যজ্ঞে ফল হয় না, পরলোক নেই।' সাধারণ ভাবে এদের বলা হত পাষণ্ড, ঈশ্বরনাস্তিত্ববাদী বা বেদাপ্রামাণ্যবাদী অর্থাৎ ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং বেদের প্রামাণ্যতায় অবিশ্বাসী। এদের সন্দেহ বৈদিক যজ্ঞের উপযোগিতায় ও পরলোকে। যে-বেদ বিভিন্ন সংকট থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যে নানা যজ্ঞের বিধান দিয়েছে, মানুষ যখন বিধিপূর্বক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে সে সংকট থেকে ত্রাণ পায়নি তখন সে শুধু যজ্ঞেই বিশ্বাস হারায়নি, যে-বেদ যজ্ঞের নির্দেশ দিয়েছে সেই বেদেই বিশ্বাস হারিয়েছে। আর বিশ্বাস হারিয়েছে পরলোকে। জন্মস্তরে বিশ্বাস করতে বলছে শাস্ত্রকাররা, কিন্তু যে-বিশ্বাসের সঙ্গে বর্তমানের চেয়ে সুখের কোনও ভবিষ্যৎকে বিশ্বাস করা যাচ্ছে না, জনসাধারণের ওপরে শাস্ত্রকারদের চাপিয়ে দেওয়া সে বিশ্বাসে মানুষ কোনও সান্ত্বনা বা মানসিক আশ্রয় খুঁজে পাচ্ছে না। বিশ্বাস করলে পরজন্মে এই দুঃখময় জীবনের অনুবর্তন—সে একটা ত্রাস, একটা আতঙ্ক।

———————-

১. ইন্দ্রো যতীন সালাবৃকেভো আদাৎ। তৈত্তিরীয় সং (৬:২:৭); তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ; (৭:২৬); তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ (৮.১.৪)

(২) When urban society is differentiated to include also a priestly class which dogmatizes the concepts the result is the theological phase. –Mogens Bronsted, 'The Transformations of the concept gate in literature'. p. 73

(৩). It reflects a cleavage between man's consciousness of nature, which springs… from a corresponding cleavage in society.'–George Thomson, Vol II, p. 133

(8) 'Isolation and alienation from a society's primordial and constitutional structures prevent one from having experiences from which beliefs in the supernatural can arise or gain support. To assume that humans can know and control all, or the most important aspects of such structures, is to destroy, in principle, many of the features which give certain social organisations a supernatural aura–their properties of invisibility, immortality, pervasiveness, unknownness, inescapability, and their control over conduct thortagh what seems to be the direct indirection of purpose, '–Guy & Swanson, p. 88)

(৫) '…a gradual passing from an initial naturistic-harmonistic attitude where the human soul is not yet violently, opposed to the world, to a final anti-cosmic and anti-somatic and as such dualistic and pessimistic which is peculiar to gnosis.'-Corranda Pensa, The Field of Indian Religions, p. 107

(৬) ‘Ritual trivialities) in terms of these the authors of the Brahmans also try to validate a new social norm that emerges on the runs of the ancient tribal one. –DP Chatterjee, p. 12

জিজ্ঞাসা ও সংশয়

এই পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ মানুষের চাওয়ার চেহারা বদলে গেল। বর্তমান জীবনের অভিজ্ঞতা সুখের নয়, কাজেই একশো বছর বাঁচা মানে একশো বছর মালিক-মহাজনের কাছে লাথিঝাঁটা খাওয়া। সে-বাসনা সাধারণ মানুষের কেন হবে? তাই স্বভাবতই সে চাইবে এ যন্ত্রণা এ জন্মেই শেষ হোক। জন্মান্তর যদি থাকেও তবু তা কাম্য নয়, তার থেকে ছুটি পাওয়াই কাম্য। এই পরিস্থিতিতে শাস্ত্রকাররা প্রতিকার বাতলে দিল: ছুটি চাও? মুক্তি, মোক্ষ? তা তো পেতেই পার যদি বাস্তব জীবনে ধ্যানে একাগ্র ভাবে অনুভব করতে পাের, যে তুমি নিজেকে যা অনুভব করছি সে আসল তুমি নও। আসল তুমি ব্রহ্মস্বরূপ। এইটি উপলব্ধি করলেই জন্মান্তর থেকে ছুটি।’ লক্ষণীয়, এ যুগে বৌদ্ধ, জৈন, ব্রাহ্মাণ্য, আজীবিক সকলেই মোক্ষের বিধান দিচ্ছে। আজীবিক বলছে, তোমার করবার কিছু নেই, যাই কর না কেনচুরাশি লক্ষ বার তোমাকে জন্মাতে হবে। সে সব জন্মে পাপাই কর আর পুণ্যই কর, চুরাশি লক্ষ বারের পরে আপনা-আপনিই জন্মমৃত্যুর শৃঙ্খল খসে যাবে। জৈন, বৌদ্ধরা ধ্যানে, মননে নৈতিক জীবনযাপনের নির্দেশ দিয়েছে, সেগুলি যথাযথ ভাবে পালন করলে নির্বাণ বা মুক্তি মিলবে।

তা হলে কর্মকাণ্ড থেকে জ্ঞানকাণ্ডে এসে দেখছি জীবনের উদ্দেশ্য এবং সে উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় দুই-ই বদলে গেছে। এটা অনিবার্যই ছিল। এই পৃথিবীতে দীর্ঘকাল সুখে, স্বাস্থ্যে, সমৃদ্ধিতে বেঁচে থাকার পথে যা বিঘ্ন তা মোচন করার জন্য উদ্ভাবিত হয়েছিল কর্মকাণ্ড অর্থাৎ যজ্ঞ। পরবর্তীকালে উদ্ভাবিত জ্যোতিষ্টোম, ইত্যাদি কিছু কিছু ছোটখাটো যজ্ঞের ফল হচ্ছে স্বর্গলাভ, এমন কথা থাকলেও সে সব যজ্ঞ কখনও প্রাধান্য পায়নি। সুখে দীর্ঘকাল পৃথিবীতে থাকার জন্যেই সব যজ্ঞ। ঋগ্বেদ-যজুর্বেদের প্রথম অংশে এই ছিল জীবনের লক্ষ্য। আমরা দেখেছি, এ যুগের মানুষের মনে নানা সংশয় ছিল, দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যে ইন্দ্র তিনি যে আসলে নেই, এমন কথাও ঋষিরা স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন। যজ্ঞ, নৈবেদ্য, প্রক্রিয়া এ সব নিয়ে সৃষ্টি, দেবতাদের অস্তিত্ব এ সব নিয়ে বহু প্রশ্ন প্রথম শ-তিনেক বছরের মধ্যেই উচ্চারিত হয়েছে। তবু এ ছিল সমাজের আভ্যন্তরীণ সংশয়, সমাজের মধ্যেই অন্তর্নিহিত। কিন্তু সংশয় সংক্রামক: শ-তিনেক বছরের মধ্যেই এ সংশয় যে ছড়িয়ে পড়েছিল তার প্রমাণ হল খ্রিস্টপূর্বসপ্তম শতকের মধ্যেই বহুসংশয়ী মানুষ সমাজের বিধিবন্ধন উপেক্ষা করে বাইরে চলে গিয়ে নানা মত ও দল তৈরি করে। এবং সংশয় সংক্রামক বলেই এ সব দলে সমমতাবলম্বী লোক বহু সংখ্যায় যোগ দিয়েছিল। যজ্ঞ করতে হয় না, ফলমূল সংগ্রহ করে, ভিক্ষা করে দিনাতিপাত করত এরা, বেদের প্রামাণ্যতা, যজ্ঞের উপযোগিতা, পরলোক, ইত্যাদি নিয়ে এরা সন্দিহান ছিল, যদিও জন্মস্তরে এদের বিশ্বাস ছিল। যজ্ঞ করে। পরজন্মের জীবনটাকে সুখিতর বা পূর্ণতর করবার কোনও আশ্বাস নেই বলে যজ্ঞে এরা আরও বেশি উদাসীন হয়ে পড়েছিল। তা ছাড়া যজ্ঞ করে যা পাওয়ার কথা তাও কদাচিৎ, কাকতালীয়বৎ মেলে। ফলে সমগ্র কর্মকাণ্ডে এদের অনীহা। তবু এরা বেঁচে রইল; সর্পাঘাতে মরল না, বজ্রপাতেও না। এবং, মূলত এদের এই ভাল ভাবে বেঁচে থাকাটাই ব্রাহ্মণ্য সমাজের প্রতি একটা প্রতিস্পর্ধা, যার উদ্ভব কিন্তু সন্দেহে।

সমাজে তখন দু-ধরনের ধর্মাচরণ চলিত ছিল, বেদনিষ্ঠ এবং বেদবিরোধী। এ দুটি মতের অন্তর্নিহিত বিরোধে একটা আন্তি (tension) তৈরি হয়েছিল: দু-দিকে দুটি সম্ভাবনা, এবং দুটিই সমান কার্যকর, দুটি মতের লোকেরাই বেঁচেবর্তে আছে। এই দোলাচলতা সত্ত্বেও যজ্ঞ আরও বেশ কয়েক শতাব্দী চলেছিল। কারণ প্রথম সংকট মোচনের ওই একটি সর্বজনগ্রাহ্য পন্থাই মানুষ জানত এবং বেশ কয়েক শতাব্দী ধরে তার অনুষ্ঠান করতে তারা অভ্যস্ত। দ্বিতীয়ত, যেমন সংকটের সংখ্যা ও প্রকারভেদের সংখ্যা বাড়ছিল তেমনই পুরোহিতদের উদ্ভাবিত যজ্ঞের সংখ্যা ও প্রকারভেদও বাড়ছিল, কাজেই ব্রাহ্মণ্যবাদের অন্তর্ভুক্ত মানুষ প্রাচীন যজ্ঞ নির্ম্মফল হলে নতুন যজ্ঞ সফল হতে পারে এমন আশা করার একটা ভিত্তি খুঁজে পাচ্ছিল, ফলে যজ্ঞানুষ্ঠান অব্যাহত ছিল। তা ছাড়া ধনী যজমানের সমাজে আত্মপ্রচারের ও আত্মপ্রতিষ্ঠার একটা উপায় ছিল ধুমধাম করে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা। সাধারণ মানুষ সর্বদেশে সর্বকালে জাঁকজমক ও ধুমধামে আকৃষ্ট ও অভিভূত হয়। অতএব, বৈদিক যুগের শেষ পর্বে যখন দেশে উৎপাদন ও বাণিজ্য এবং বিদেশের সঙ্গে বহির্বাণিজ্যে সম্পদ বাড়ছিল এবং রাজা, রাজন্য, ক্ষত্রিয় এবং বণিক বৈশ্যের হাতে সম্পত্তি পুঞ্জীভূত হচ্ছিল তখন সম্পত্তিমানের নিত্যসঙ্গী ধননাশের আশঙ্কা কিম্বা অকালে প্রাণ হারানোর, বিদেশে বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা ও ত্রাস বাড়ছিল। অতএব এ সব সংকট থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যে পুরোহিতরা নিয়মিত নিত্যনতুন যজ্ঞ উদ্ভাবন করে চলেছিল। তাতে ফল হোক বা না হোক, সাময়িক একটা নিরাপত্তাবোধ আসে, কল্পিত দৈব অভিভাবকের হাতে আসন্ন বিপদ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার দায়িত্ব সম্পন্ন করার একটা নিশ্চিন্ততা পাওয়া যায়–সেও একটা ফল, যার জন্য যজ্ঞবিধির পরমায়ু দীর্ঘায়িত হয়েছিল, যদিও তার বিশ্বাসের ভিত্তি টলে গিয়েছিল অনেক আগেই।

খ্রিস্টপূর্বসপ্তমশতকের অনেক আগেই আর্য-প্রাগার্য অন্তর্বিবাহের ফলে যেমিশ্রজনগোষ্ঠীর উদ্ভব হয় তার মধ্যে যজ্ঞের পাশাপাশি প্রাগার্যদের মধ্যে চালু পূজাও ধীরে ধীরে স্থান পেয়েছিল। প্রাগার্যদের মধ্যে প্রচলিত উপাসনা দু-ভাবে আর্যধর্মে অনুপ্রবিষ্ট হয়। প্রথমত, বেশ-কিছু আঞ্চলিক প্রাগার্য দেবতা শেষ দিকের যজ্ঞে আর্য দেবমণ্ডলীতে স্থান পায়। এরা পূর্বতন আর্য দেবতার পাশাপাশি রইল এবং আর্যপ্রণালীতে অনুষ্ঠিত যজ্ঞে হব্য পেতে লাগল। অর্থাৎ এরা বিধিমতে আর্য দেবগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। দ্বিতীয়ত, আর্য যজ্ঞের পাশাপাশি প্রাগার্য পূজাপদ্ধতিও সমাজেস্থান পেল এবং দীর্ঘকাল ধরে এ দুটি উপাসনা-পদ্ধতি যুগপৎ চালু ছিল। যজ্ঞে পদ্ধতিগত ভাবে যে সব সন্দেহ ছিল পূজায় তার একটা বিকল্প সমাধান দেখা দিল, কিন্তু পূজাও তো নিয়মিত ফল দেয় না, তাই জনমনে সন্দেহের ক্ষেত্র আরও প্রশস্ত হল।

এই যুগে, খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতকের শেষ ভাগ থেকে ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত, দেশের ধর্মীয় বাতাবরণ অত্যন্ত অস্বচ্ছ, জটিল ও সংশয়সংকুল। বর্ণবিভক্ত সমাজ তো খ্রিস্টপূর্ব দশম শতক থেকেই ছিল; যজুর্বেদের সময় থেকে ধীরে ধীরে বর্ণের স্থানে দেখা দিল জাতি–বর্ণ ছিল চারটি, জাতি হল অগণ্য। বৃত্তিভেদে এবং অন্তর্বিবাহে এগুলি চক্রবৃদ্ধিহারে বাড়ছিল, আর তার সঙ্গে খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতক পর্যন্ত গ্রিক, পারদ, পহ্লব, কুষাণ, শক, জুন, প্রভৃতি নানা বিজাতীয় আক্রমণকারীদের সমাজে স্থান দিতে হওয়ায় সমস্ত পরিস্থিতিটা অনেক জটিল ও পরিবর্তনশীল হয়ে রইল। জাতিভেদ সম্বন্ধে একটা অনুচ্চারিত সংশয় নিশ্চয়ই জনমনে প্রবল ভাবেই বিদ্যমান ছিল, সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়কে অনিবার্য গতিতে অবদমিত ও অবনমিত করা হচ্ছিল শুধু ব্রাহ্মণ ও রাজন্যের মহিমা বৃদ্ধি করার জন্যে। সম্পদশালী কৃষক ও ধনী বণিক হিসাবে সমাজে কিছু বৈশ্য বিত্ত-কৌলীন্য অর্জন করেছিল। বাকি নির্ধন বৈশ্য হয়ে সমাজে ক্রমেই নেমে যাচ্ছিল।

শূদ্র চাষও করত, শিল্পদ্রব্য উৎপাদন করত, গোপালন করত এবং ধনীর গৃহদাসও ছিল, কিন্তু তার গুণ, যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও সমাজে তার স্থান ছিল সকলের পায়ের তলায়। এখানে সমাজব্যবস্থার অন্তর্নিহিত নৈতিক অবিচার সম্বন্ধে শূদ্র সন্দিহান না হয়েই পারে না। আর শুধু কি শূদ্র? বিনাযোগ্যতায় সমাজে প্রাচুর্য ও সমাদর ভোগ করত যারা তারাই কি মনে মনে বুঝত না যে এ ব্যবস্থা অন্যায়ের ওপরে প্রতিষ্ঠিত। শূদ্রের স্থান এমন নীচে এবং সাধারণ ভাবে অসংগঠিত ছিল বলেই সমবেত ভাবে প্রতিবাদ করার সামর্থ্য তার ছিল না। তাই জাতিভেদের নৈতিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে শূদ্রের সংশয় বা প্রতিবাদ তেমন ভাবে উচ্চারিত হতে পারেনি। তা হলে আমরা কীসের ভিত্তিতে অনুমান করছি যে সামাজিক ন্যায়বিধানে বঞ্চিত শূদ্র সন্দেহ করত, প্রতিবাদ করত? আমাদের এ অনুমানের যথেষ্ট দৃঢ় ভিত্তি আছে: প্রথমত সাহিত্যে গুহক, শম্বুক, ইত্যাদি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত দু-চারটি নজির আছে। আর আছে শাস্ত্রের অন্যায় বিধান, শূদ্র সম্বন্ধে যা যুগের গতিতে কঠোরতর এবং নিষ্ঠুরতর হয়ে উঠেছিল–সেটা এতটাই যে মনুতে শূদ্র ঊনমানব, নৃত্যুনতম মানবিক অধিকারে বঞ্চিত উচ্চ ত্রিবর্ণের পদতলে পিষ্ট এক জীব। আরও প্রমাণ আছে, ধর্মগ্রন্থে অপরাধী শূদ্রের অমানবিক দণ্ডবিধানে। বেদ পাঠ করলে শূদ্রের জিভটা টেনে উপড়ে ফেলা হবে, কানে বেদের ধ্বনি প্রবেশ করলে সিসা গলিয়ে কানে ঢেলে দিতে হবে। তাহলে কিছু কিছু শূদ্র বেদের নির্দেশ সন্দেহ পোষণ করত এবং বেদবিরুদ্ধ আচরণ করত, যেমন শম্বুক তপস্যা করেছিল। সব শাস্ত্রের কারাগারেই বন্দির নিস্ত্রমণের ফাঁক থাকে, বন্দি বহু যন্ত্রণায় সে-ফাকটা তৈরি করে বেরোবার জন্যে। অর্থাৎ কারাবিধির ধর্মীয়তায়, উপযোগিতায় তার বিশ্বাস নেই, সন্দেহ আছে এবং সন্দেহের বশেই সে প্রতিবাদী আচরণ করে।

এই যেখানে সমাজ, সেখানে যজ্ঞানুষ্ঠানরূপ ধর্মাচরণের বিশ্বাসের পাশাপাশি ছিল নানা বিষয়ে সংশয়াচ্ছন্ন বহু মানুষের মন। দীর্ঘকাল ধরে অনুষ্ঠিত

একটি নির্দিষ্ট ধর্মপ্রণালীর পাশাপাশি সংশয় থাকলে এ দুয়ের আততি থেকে উদ্ভূত হয় অবিশ্বাস।'(১) বেদের উত্তরার্ধে এ অবিশ্বাস নানা আকারে প্রকাশ পেয়েছে, সংশয়ের উক্তিতে এবং বিকল্প ধর্মাচরণে। এ ছাড়াও প্রাগার্যবিশ্বাসগুলো দেবতা এবং অনুষ্ঠানকে আত্মসাৎ করার ফলে সন্ন্যাসী সম্প্রদায়কে প্রকারান্তরে স্বীকৃতি জানানো হয় বানপ্রস্থ ও যাতি বলে দুটি আশ্রমকে অন্তর্ভুক্ত করে। এই অন্তর্ভুক্তি, আরণ্যকে যজ্ঞের রূপক ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা এবং কর্মকাণ্ড থেকে ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিত ভাবে জ্ঞানকাণ্ডের দিকে অগ্রসরণেও এ অবিশ্বাসের প্রকাশ। এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ: কর্মকাণ্ডের অসম্পূর্ণতা, অনুপযোগিতা ও ব্যর্থতাকে স্বীকার করে নেওয়া। আবার বলছি, জ্ঞানকাণ্ড যখন প্রবল আকারে সমাজে প্রচলিত তখনও কিন্তু যজ্ঞানুষ্ঠান সমানে চলছে, এর কারণ আগেই আলোচনা করেছি। মানুষের ইতিহাসে অধিগঠন (superstructure) কখনও রাতারাতি পালটায় না, যদিও যুদ্ধ, সংঘর্ষ বিপ্লব এবং রাতারাতি ক্ষমতার হস্তান্তরে অবগঠন, অন্তত আপাতদৃষ্টিতে রাতারাতি পালটাতে পারে। অধিগঠন নির্মিত হতে সময় লাগে, পরিবর্তিত হতেও সময় লাগে। আমাদের কাজ হচ্ছে তার বোকাটা কোন দিকে সেইটো অনুধাবন করা। তাই জ্ঞানকাণ্ডের যুগে খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম থেকে তৃতীয় শতকের মধ্যে জনমানসের না হলেও সমাজবিধাতা পুরোহিত শাস্ত্রকারদের প্রবর্তিত ধর্মাচরণের ঝোকটা যে যজ্ঞ-অনুষ্ঠান থেকে সরে জ্ঞান ও মননের দিকে পড়েছে–এ কথা নিঃসংশয়েই বলা যায়। ঘটনাটা একদিনে এবং সহজে ঘটেনি, পথে পথে বিছিয়ে এসেছে। মানসিক ভাবে বহু রক্তাক্ত ইতিহাস। কিন্তু সেটা অনিবার্য ভাবে ঘটেছে।

জ্ঞানকাণ্ডের পটভূমিকা রচিত হল আর্যাবর্তের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমের গাঙ্গেয় উপত্যকা পর্যন্ত। দীর্ঘ পাঁচ শতকের অভিযাত্রা বহির্জগতে এবং মনোজগতে; এর ফলে মননজগতে যেমন পুর্বানুবৃত্তির মতো অনেক প্রাচীন উপাদান রইল তেমনই প্রাচীনকালে যা অভাবনীয় ছিল এমন

বহু লক্ষণ ও উপাদানও দেখা দিল। দুই অংশই বাস্তবে সহাবস্থান করলেও বেঁকটা নতুন উপাদান ও নতুন লক্ষ্যে। মনে রাখতে হবে যে, ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রকাররা সমগ্র বেদকেই অর্থাৎ সংহিতা-ব্রাহ্মণ-আরণ্যক-উপনিষৎ চারটি অংশকেই অপৌরুষেয় বলছে, অর্থাৎ এই পুরো শাস্ত্রসম্ভার সবটাই দৈব আদেশ বা প্রকাশ, মানুষের রচনা নয়। আজ আমরা জানি, এর সবটাই মানুষের রচনা, কিন্তু যে প্রশ্ন উদ্যত হয়ে ওঠে তা হল বেদ বলতে আমরা যে যজ্ঞনির্ভর ধর্মাচরণ বুঝি তার শাস্ত্র তো সংহিতা ব্রাহ্মণ, সেই পর্যন্তকে অপৌরুষেয় বললেই তো হত; যে অংশ ধীরে ধীরে অন্তত তত্ত্বগত ভাবে যজ্ঞকে অস্বীকার করছে সেই আরণ্যক উপনিষদকেও অপৌরুষেয় বলার কী দরকার ছিল? দরকার সত্যিই ছিল: বহু আয়াসে, কঠোর প্রযত্নে আর্যসমাজ বহু বিরোধী মতবাদকে খণ্ডন করে আত্মসাৎ করে, আগন্তুক ধর্মমতাকেও অধিগ্রহণ করে সমাজে একটি সংহতি নির্মাণের চেষ্টা করে চলেছিল। তাই প্রাগার্য দেবদেবী, উপাসনা-পদ্ধতিকে ভেতরে টেনে নেওয়া, বেদবিরোধী প্রস্থানের সন্ন্যাসী সম্প্রদায়কে বানপ্রস্থ ও ব্যতি নামে আশ্রমধর্মের অন্তর্ভুক্ত করা, যজ্ঞকে রূপক ব্যাখ্যা দিয়ে গ্রহণযোগ্য ও আচরণীয় করে তোলা এবং উপনিষদের প্রশ্ন ও অবিশ্বাসকে সম্মানিত ঋষি প্রবক্তাদের মুখে বসিয়ে সেগুলিকে সামাজিক ও ধর্মীয় সম্ভ্রম দেওয়া ইত্যাদি কারণে সম্পূর্ণ ইহমুখীন সংহিতা-ব্রাহ্মণের ধর্মে আপাত ভাবে হলেও ঐহিকতাবিদ্বেষ দেখা দিল। এখানে জন্মান্তরতত্ত্ব দিয়ে তার একটা ব্যাখ্যা দেওয়া, এবং যেহেতু বহু পূর্ব থেকেই মৃত্যু ও মরণোত্তর অবস্থা নিয়ে জনমানসে প্রবল সংশয় উচ্চারিত হয়েছিল, তাই জন্মান্তরবাদের মধ্যে দিয়ে মৃত্যুর আত্যন্তিকতা অস্বীকার করা হল। এই ভাবে আত্মসাৎ করা, ব্যাখ্যা দিয়ে সমর্থন প্রলম্বিত করা, বাহিরকে নিজসীমার অন্তর্ভুক্ত করা–এই প্রক্রিয়াটা চলেছিল অন্তর্জগতের একটা মরণাস্তিক সংগ্রামের রূপে। কাল, সমাজের বিবর্তন, অনিবার্য সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থা ও সম্পর্ক, সংশয়ে দীর্ণ মানুষ যাকে ক্রমান্বয়ে বাতিল করে

পেছনে ফেলে যেতে চেয়েছে, যার থেকে ক্রমাগত সরে সরে যেতে চেয়েছে, অনিবার্য পরিবর্তনকে অনুবর্তন বলে ব্যাখ্যা না করলে সমাজ তাকে গ্রহণ করবে কেন? এবং এ ব্যাখ্যাকে দৈব প্রকাশ, অপৌরুষেয় আখ্যা না দিলে মানুষ তাকে মানবে কেন? না মানলে বহু বিচিত্র জনগোষ্ঠীর, মতবাদের, ধর্মবোধের ও আচরণের সমাহারে গঠিত এই-যে সমাজ ও তার ধর্ম, সে তো অতি সহজেই বহু বিরুদ্ধ মতবাদের সম্মুখীন হয়ে স্খলিত হয়ে পড়ে যেত, চূর্ণ হত তার অধিগঠন। তাই পুরো আপসের, মেনে নেওয়ার, মানিয়ে নেওয়ার সুদীর্ঘ ইতিহাসটাকেই অপৌরুষেয় বলে অভিহিত করা হয়েছে এবং এ প্রক্রিয়ার যা অভিলষিত ফল ছিল, সামাজিক সংহতি রক্ষা, তা পূর্ণভাবে না হলেও বহুলাংশে সিদ্ধ হয়েছে। এই হল সমাজ-কলেবারের ইতিহাস; এর অভ্যন্তরে মর্মকীটের মতো ছিল বহু সংশয়, সন্দেহ, উচ্চারিত এবং অনুচ্চারিত অবিশ্বাস। দ্বিতীয় পর্বে এ সব অন্য একটি মাত্রা পায়, কারণ তখন বহু বেদবিরোধী প্রস্থান স্বতন্ত্র ভাবে সমাজে বিদ্যমান।

জন্মান্তরবাদের উদ্ভব ও বিকাশের পিছনে মৃত্যুভয় ও পরলোক সম্বন্ধে অজ্ঞানের একটা ভূমিকা ছিল। ব্রাহ্মণসাহিত্য থেকেই এটা লক্ষ করা যায়। শতপথ ব্রাহ্মণে পড়ি, যজ্ঞের জন্যে আনা একটা দুগ্ধবতী গাভীকে বাঘে নিয়ে গেলে যজমান রাজা পুরোহিত, খণ্ডিক ও ঔদগীরিক তার প্রায়শ্চিত্ত কী জানতে চান। পুরোহিত ভাবলেন, বলে দিই প্রজারা রাজার অনুগত হবে। আর পরলোকে আমি সম্মানের আসনে থাকব। না বললে এর বিপরীতটা হবে। শেষ পর্যন্ত তিনি বলে দেওয়াই ঠিক করলেন, 'কারণ ওপারে বহু রাত্রি'। (১১:৪:৪:৫) এখানে দুটো কথা লক্ষ্য করা দরকার: মরণোত্তর অস্তিত্ব দীর্ঘ (বা চির)-স্থায়ী এবং পুরোহিত দিনের কথা ভাবেননি, রাত্রির কথাই ভেবেছেন। ঋগ্বেদেও পরলোক সম্বন্ধে ধারণা ছিল সেটা একটা নিরালোক, নিরানন্দ লোক। এবং যেহেতু তখনও পরজন্মের কল্পনা দেখা দেয়নি তাই সেইটেই

তাদের কাছে ছিল চিরদিনের আভাস। তাই এক অর্থে জন্মান্তরবাদ এই নিরাবসান দুঃখলোক থেকে পরিত্রাণ হিসেবে দেখা দিল। একেবারে অজ্ঞাত দুঃসময়মণ্ডিত জগতের চেয়ে পরিচিত এই সুখদুঃখের জগৎ অনেকের কাছেই কাম্য মনে হল। বোঝা যায়, মরণোত্তর জীবন নিয়ে ত্রাস বা আশঙ্কা মানুষকে এক অনিশ্চায়ের অস্থিরতার মধ্যে রেখেছিল। '...ব্যক্তিগত অমরত্ব তার পূর্বতন বিপরীত অবস্থান (আত্মার অমরত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হল। এ সম্বন্ধে দার্শনিক ব্যাখ্যার পরে ...যন্তীয় ধর্মানুষ্ঠান থেকে পরজন্মের ধারণা উদ্ভূত হয় না।'(২)

এ ছাড়াও জীবন, সমাজ, ঔৎপাতিক সংকট, রোগব্যাধি, প্রভৃতি নিয়ে কিছু কিছু প্রশ্ন তো ছিলই; যজ্ঞ, তার উপকরণ প্রণালী এবং দেবতাদের অস্তিত্ব, চরিত্র, মনোভাব এ সব নিয়েও বহু প্রশ্ন উদ্যত ছিল। প্রশ্ন ও সংশয় সম্বন্ধে সমাজে বিভিন্ন ধরনের মনোভাব চলিত ছিল। স্পষ্টত, সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ক্ষমতা কারোরই ছিল না, তাই মাঝে মাঝেই প্রশ্ন সম্বন্ধে ঋষিদের অসহিষ্ণুতা দেখা যায়। কয়েক জন ব্রাহ্মণ যাজ্ঞবল্ক্যকে কিছু প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, 'যে দেবতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করা যায় না, তার সম্বন্ধে প্রশ্ন কোরো না; অমুক তিথিতে তোমার মৃত্যু হবে, এবং তোমার অস্থিগুলি তোমার বাড়িতে পৌঁছবে না।' (জৈমিনীয় উপনিষদব্রাহ্মণ; ১:৬:৩) অস্থিচয়নের উপযোগিতায় যে সমাজ বিশ্বাস করে, সেখানে এটি একটি গুরুতর অভিশাপ। এর কারণ কী? দুজ্ঞেয় দেবতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করা। তা হলে প্রশ্ন সম্বন্ধে একটা অসহিষ্ণুতা ছিল, সম্ভবত মানুষ ক্রমেই বেশি বেশি প্রশ্ন করছে তখন, এবং বহু প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাচ্ছে না।

প্রশ্নোপনিষদের শুরুতেই একগুচ্ছ প্রশ্ন, ভিন্ন ভিন্ন লোকের মুখে; এরা এলেন আচার্য পিপ্পলাদের কাছে পরব্রহ্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা নিয়ে। মনে রাখতে হবে, এই জিজ্ঞাসাটিই নতুন এবং পরব্রহ্মা সম্বন্ধে ধারণাও এর আগে ছিল না। আগে

যজ্ঞে বহু সংখ্যায় দেবতার উপাসনা হত, তার মধ্যে পরব্রহ্মা ছিলেন না। এই জিজ্ঞাসু (সুকেশা, সত্যকাম, সৌর্যায়নী, কৌশল্য, ভাগবি ও কবন্ধী)দের পিপ্পলাদ বললেন, তোমরা এক বৎসর তপস্যা, ব্রহ্মচর্য ও শ্রদ্ধায় অতিবাহিত করো। তার পরে এসো। এখানে দুটো ব্যাপার চোখে পড়ে, এরা সকলেই মনস্বী তবু ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্যে এদের ঋষিত্ব বা মনীষা যথেষ্ট বলে বিবেচনা করা হল না, এটা বিশেষ ধরনের জ্ঞান, তাই এর জন্যে চাই বিশেষ ধরনের প্রস্তুতি। কী সে প্রস্তুতি? ব্রহ্মচর্য আশ্রম নয়, সংযম, শ্রদ্ধা ও তপস্যা। এটাও নতুন। কর্মকাণ্ডে ধর্মাচরণ ছিল যজ্ঞ, তার উপকরণ ও প্রকরণ দুই-ই পরিচিত, তার অভীপ্সিত ফল ছিল ঐহিক সুখ, দীর্ঘ জীবন। এখন উদ্দেশ্য ব্রহ্মজ্ঞান, উপায় মনন, তপস্যা।

সংবৎসর তপস্যায় অতিবাহিত করে কবন্ধী এসে প্রশ্ন করলেন: 'প্রজা কোথা থেকে জাত হয়?—-কুতো হা বা ইমাঃ প্রজাঃ প্রজা়য়ন্ত ইতি।' (প্রশ্নোপনিষদ ১১:১:৩) উত্তরে পিপ্পলাদ বললেন, 'প্রজাপতি প্রজা কামনা করলেন, তিনি তপশ্চরণ করলেন, তিনি তপস্যা করে মিথুন এবং ধন ও প্রাণ উৎপন্ন করলেন; এরা (মিথুন) আমার বহুবিধ প্রজা উৎপন্ন করবে।'(৩) সেই সংহিতা যুগের প্রশ্ন: প্রজা কোথা থেকে এল; উত্তর, মিথুন থেকে, এবং মিথুন। এল তপস্যা থেকে; তপস্যাকে ধর্মজগতে প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে এই ভাবে সৃষ্টির মূলতত্ত্ব হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। এর পরে ভার্গব প্রশ্ন করলেন, 'ভগবান ক'জন দেবতা প্রজাকে ধারণ করেন? কারা শরীরকে প্রকাশিত করেন? এদের মধ্যে বরিষ্ঠ (শ্রেষ্ঠ) কে?'(৪) উত্তরে পিপ্পলাদ বলেন, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, বাক, মন, চক্ষু, শ্রোত্রএঁরা প্রকাশ্যে বলেন, 'আমরা এই শরীরকে দৃঢ়তর করে বিশেষ ভাবে ধারণ করব। তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রাণ। তাদের মধ্যে বরিষ্ঠ প্রাণ।'(৫) এখানে যে প্রশ্ন তাও অনেক পুরোনো, উত্তরেও খুব নতুন কিছু বলা হল না: পঞ্চভূত, বাক, মন, চক্ষু ও কর্ণ, অর্থাৎ

পঞ্চভূতের সঙ্গে মানুষের বিশিষ্ট দুটি উপাদান–বাক্য ও মন–এবং প্রধান দুটি জ্ঞানেন্দ্রিয় চক্ষু ও কর্ণ এরা সৃষ্টি করেছেন মানুষকে।

লক্ষ্যণীয়, প্রশ্ন ছিল, কোন দেবতারা প্রজাকে ধারণ করে? উত্তরে যাদের নাম করা হল তাঁরা কেউই দেবতা নন, শ্রেষ্ঠ হল প্রাণ; প্রচলিত অর্থে প্রাণও দেবতা নয়। এর আগে সংহিতায় ইন্দ্র থেকে আরম্ভ করে বহু দেবতাকে স্রষ্টা বলা হয়েছে। সে দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এটি পৃথক, এখানে মানুষের দেহমানের উপাদানগুলিকেই সৃষ্টিকর্তা বলা হয়েছে। অর্থাৎ উপাদানগুলিই বিপরিণত হয়ে মানুষের দেহমান নির্মাণ করেছে, কিন্তু মানুষের মধ্যে এ সব থাকলেও যেহেতু সে মানুষ হত না, তাই বলা হয়েছে প্রাণই শ্রেষ্ঠ। এ উপলব্ধি বেশ সাধারণ পর্যায়ের এবং একটি বস্তুবাদী অবস্থানকেই সূচিত করে। যদিও এই প্রশ্নের বাকি অংশে নানা ভাবে প্রাণের গরিম্যাকীর্তন করা হয়েছে, যেমন আগের প্রশ্নের উত্তরেও রয়ি' (== ধন) ও প্রাণের সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে বলা আছে। তৃতীয় প্রশ্ন করলেন কৌশল্য:

'ভগবন, প্রাণ কোথা থেকে জাত হয়? কেমন করে তা এই শরীরে আসে। নিজেকে বিভক্ত (বিচ্ছিন্ন) করে কেমন করেই বা চলে যায়? কীভাবে উৎক্রান্ত হয়? বাহ্য ও অধ্যাত্ম শরীরেদ্রিয়গুলিকে কীভাবে ধারণ করে?'

উত্তর এল:

'তুমি অতিপ্রশ্ন (গভীর বা দুজ্ঞেয় প্রশ্ন) করছি। তুমি ব্রহ্মজ্ঞানীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তাই তোমাকে বলব। আত্মা থেকেই প্রাণ জাত হয়। মানুষের যেমন ছায়া তেমনই পুরুষে প্রাণ ব্যাপ্ত। মানস সংকল্প থেকে এই শরীরে আসে।'(৬)

এখানে প্রশ্নগুলি মৌলিক; আগের অংশে প্রাণের ভূমিকার প্রাধান্য ঘোষিত হয়েছে, এ প্রশ্নে সেই প্রাণের উৎপত্তি এবং নিস্ক্রান্তি সম্বন্ধে প্রশ্ন, বাহ্য এবং আন্তর পদার্থ প্রাণ কেমন ভাবে ধারণ করে সে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা। উত্তরে স্বাভাবিক ভাবেই প্রাণকে অতিক্রম করে আত্মায় পৌঁছতে হল এবং এইখানে ভাববাদের আশ্রয় নেওয়া হল, মানুষের যেমন ছায়া, তেমনই আত্মা; মনের কামনা থেকেই জীব সৃষ্টি এবং তার দ্বারাই সৃষ্টিকালেই আত্মা জীবে অনুপ্রবিষ্ট হয়। পরে দেহ থেকে আত্মা কী ক্রমে বিনিগত হয়। সে সম্বন্ধে আলোচনা আছে। যেটা সহজেই চোখে পড়ে তা হল, উপমাটির দৈন্য; ছায়া মানুষের শরীরের ভেতরে থাকে না, থাকে বাইরে। আত্মাও কিতাই? সেটা অভিপ্রেত অর্থনয়, তাই এই উত্তর প্রশ্নের মূল বিবক্ষিত বস্তুটিকে এড়িয়ে গেছে। কেন? কারণ আগে যেমন আলোচনা করেছি, এই যুগে প্রথম চেষ্টা করা হচ্ছেদেহব্যাতিরিক্ত হিসেবে আত্মাকে দেখাতে। চেষ্টা সফল হয়নি, কারণ ছায়ার উপমাতে আত্মা দেহের একেবারে বাইরেই রয়ে গেল, তাকে দেহের মধ্যে ঢোকানোই গেল না। অর্থাৎ দেহ-আত্মার বিভাজনটি এখনও ভাল করে মানুষের, এমনকী ঋষিদের চেতনাতেও স্থান পায়নি।

চতুর্থ প্রশ্ন সৌর্যায়নীর:

ভগবন, এই পুরুষে কারা নিদ্রা যায়? কারা স্বপ্ন দেখে? কারা জেগে থাকে? কোন সেই দেব যিনি স্বপ্ন দেখেন। এই সুখকর হয়? কীসের (বা কার) মধ্যে সব কিছু সংপ্রতিষ্ঠিত থাকে?'

তাঁকে উত্তর দিলেন:

‘গার্গ, অস্তগামী সূর্যের সমস্ত কিরণ তেজোমণ্ডলে একীভূত হয়। বারবার সূর্যোদয়কালে প্রসারিত হয়, এই ভাবে সেই সব পরম দেব মনে একীভূত হয়।’(৭)

প্রশ্ন ছিল, পুরুষ নিজেই ঘুমোয়,–স্বপ্ন দেখে, না তার অন্তঃস্থ কেউ? দেহের সুখ কে ভোগ করে? কার মধ্যে মানুষের সব অভিজ্ঞতা আশ্রিত থাকে? লক্ষ করা যায় যে, এ সব প্রশ্নের কোনও সরাসরি উত্তর দেওয়া হয়নি। সুখের অনুভূতি কার হয় তারও উত্তর নেই। অস্তগামী সূর্যের রশ্মিসমূহ সন্ধ্যায় গুটিয়ে আসে, প্রভাতে প্রকীর্ণ হয়। তেমন ভাবেই সেই সব পরম দেব মানুষের মনে একীভূত হন। এর মধ্যে নিদ্রা, জাগরণ, স্বপ্ন, সুখবোধের আধার কী, তার কোনও উত্তর নেই। অস্পষ্ট ভাবে বলা আছে সেই সব পরম দেবরা মানুষের মনে একীভুত হন; বস্তুত এটা উত্তর নয়। বরং আর-একটা প্রশ্নের বীজ; পরম দেব কারা, কেন তাঁরা মানুষের মনের মধ্যে একীভূত হন? অন্য নানা দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনা করা হয়েছে, কিন্তু মূল প্রশ্নটি অনুত্তরিতই রয়ে গেল। এখানে যেটা চোখে পড়ে তা হল, মানুষ তার দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাগুলি নিয়ে, তার পরিপার্শ্ব নিয়ে ভাবছে, প্রশ্ন করছে, উত্তর মিলুক বা না-ই মিলুক। শেষ প্রশ্ন করে সত্যকাম: ‘যে ব্যক্তি মৃত্যুকাল পর্যন্ত প্রণবমন্ত্রের উপাসনা করে, সে কোন লোক জয় করে?’ উত্তরে পিপ্পলাদ বললেন, সত্যুকাম, পরব্রহ্মা ও অপরব্রহ্মা হল ওঙ্কার বা প্রণব, অতএব বিদ্বান এই দুটির মধ্যে একটি ব্রহ্মের আশ্রয় পান।’(৮) যে মানুষ সারা জীবন প্রণবমন্ত্রের উপাসনা করে সে মৃত্যুর পরে কোন লোকে স্থান পায়, এই ছিল প্রশ্ন। প্রশ্নটি প্রণিধান করে দেখবার মতো, কারণ ইতোমধ্যেই প্রণব মন্ত্র এমন মহিমা অর্জন করেছে যে তার দ্বারা মৃত্যুর পরে সুবিধা হওয়ার আশা রাখে মানুষ। একটি মন্ত্র অন্য হাজার হাজার মন্ত্রকে ছাপিয়ে আধ্যাত্মিক প্রাধান্য অর্জন করেছে। কিন্তু এ প্রার্থনায় জীবনভর নিবিষ্ট থাকবার জন্যে মৃত্যুর পর কিছু ফল পাওয়ার প্রত্যাশা ছিল। এখানে প্রশ্ন হচ্ছে, কী সেই ফল? উত্তরে পিপ্পলাদ যা বলছেন তা পরে

বিশদ ভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে–মৃত্যুর পরে দুটি মাত্র সম্ভাব্য পরিণতি, প্রথম পিতৃযান, অর্থাৎ পুনর্জন্ম, দ্বিতীয় দেবযান বা পরমাত্মা দর্শন; প্রথমটি পুনর্জন্মের পথ, দ্বিতীয়টি কৈবল্যপ্রাপ্তির। অবশ্য দ্বিতীয়টি সম্বন্ধে কোনও স্পষ্ট উক্তি নেই, তবে দুটি বিকল্পের মধ্যে একটি যখন পুনর্জন্ম অন্যটি স্বভাবতই পুনর্জন্ম না। হওয়ার অবস্থা মনে করা যায়। কিন্তু এখানে প্রশ্নটি তাৎপর্যপূর্ণ: যজ্ঞ নয়, শুধুমাত্র প্রণম বা ওংকার মন্ত্রের উপাসনা এবং এই একটি অক্ষরকে এক-অক্ষর, দ্বি-অক্ষর, ত্রি-অক্ষর এই তিন ভাবে বোঝার সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে। এর মধ্যে সহজ বুদ্ধির অগম্য, রহস্যগুঢ় একটি তত্ত্বের কথা আভাসিত।

মাণ্ডুক্য উপনিষদের পুরো আগম-প্রকরণে প্রণব অর্থাৎ ওম শব্দটিকে ভেঙে অ-উ-ম ধরে নিয়ে এ অক্ষরগুলির প্রত্যেকটির মধ্যে গুঢ় তত্ত্বের মাহাত্ম্য আরোপ করে শব্দটিকে একই সঙ্গে দুর্বোধ্য ও উচ্চমার্গের একটি ভাবসত্তা হিসেবে আনা হয়েছে। সামবেদের সংহিতায় স্তোভ নামে হা-উ, হোঁই, হোয়ি, হা-বু, ইত্যাদি, বা হিঙ্কার, ওংকার এ সব সমবেত ভাবে উচ্চারিত ধ্বনিকে অতিলৌকিক মহিমায় মণ্ডিত করবার যে চেষ্টা, প্রণবেও তাই। ইহুদিরা যেমন ‘আমেনকে অন্য ভাবে মাহাত্ম্য দেয়, তেমনই সংস্কৃতে পরবর্তী সাহিত্যে আমরা স্পষ্ট দেখি ওম-এর অর্থ ‘হাঁ’। যেমন বাঢ়ম। আমেনও তাই। অর্থাৎ পুরোহিত যে মন্ত্র উচ্চারণ করলেন উপস্থিত জনগোষ্ঠী তাতে সমর্থন জানোত হ্যা বা ওম বলে। যজ্ঞের আনুষ্ঠানিক পটভূমিকা থেকে তুলে এনে কর্মকাণ্ডে যখন প্রণবকে আধ্যাত্মিক তাৎপর্যে মণ্ডিত করার চেষ্টা চলছে, তখন স্বভাবতই মানুষের মনে প্রশ্ন জাগবে, ওম শব্দটি তো যজ্ঞে জনতার সমর্থনীসূচক ধ্বনিমাত্র, তাকে এত আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত করা কেন? আগম প্রকরণে ও অন্যত্র ওম নিয়ে বিস্তৃত রহস্যগভীর ব্যাখ্যার চেষ্টা এই উদ্যত প্রশ্নেরই উত্তরমাত্র। মনে রাখতে হবে, কর্মকাণ্ডে ওম যজ্ঞক্রিয়ার অঙ্গ ছিল,

সেটা লোকে সহজে গ্রহণ করতে পেরেছিল, কিন্তু জ্ঞানকাণ্ডে যজ্ঞের বিকল্প হচ্ছে মনন। যে মননে আত্মব্রহ্মা একাত্মতা প্রতিপন্ন হয়, অর্থাৎ কর্ম থেকে বিনিমুক্ত শব্দে পরিণত হল। ওম; যজ্ঞ একে আর মহিমা দেয় না, তবে কীসে আসবে। এর গুরুত্ব? একে অতিলৌকিক রহস্যে মণ্ডিত করা সে বিকল্প প্রক্রিয়া। ব্রাহ্মণসাহিত্য থেকে শুরু করে উপনিষদেও একটি কথা প্রায়ই শোনা যায়, 'পরোক্ষপ্রিয়া বৈ দেবাঃ'–দেবতারা পরোক্ষ ভাষণ অর্থাৎ অস্বচ্ছ ভাষাই পছন্দ করেন, তাই তাদের কথাতে রহস্য আরোপ করা ও অলৌকিক অর্থের আভাস দেওয়া খুবই সহজ।

ঐতরেয় উপনিষদে একটি প্রশ্নমালা দিয়ে শুরু হয় তৃতীয় অধ্যায়: 'কে তিনি যাকে আমরা আত্মা বলে উপাসনা করি, কে সেই আত্মা যার দ্বারা লোকে বুপ দেখে শব্দ শোনে, গন্ধ আঘ্রাণ করে, বাক্য রলে, স্বাদু, অস্বাদুকে বোঝে?(৯) এর উত্তর হল, 'এই যে ক্রুদয়, এই যে মন (এরাই)–যাদেতদ্বন্দয়ং মনশ্চেতৎ।' (৩:১:২) এখানে প্রশ্ন ছিল, ইন্দ্রিয়গুলি যে সব কর্ম করে তা কোন আত্মার নিয়োগে? অন্য ভাবে বললে ইন্দ্রিয়কর্মগুলির সঙ্গে আত্মার সম্বন্ধ কী? উত্তরে আত্মার উল্লেখ না করেই বলা হয় ইন্দ্রিয়কর্মগুলি সাধন করে হৃদয় ও মন, এবং এ উত্তর বিজ্ঞানসম্মত, কিন্তু এর মধ্যে আত্মার স্থান নেই; অথচ এ উপনিষদের শেষ হচ্ছে এই বলে, 'তিনি (বামদেব) উক্ত চৈতন্যস্বরূপ আত্মার দ্বারা এই জগৎ অতিক্রম করে ওই স্বর্গলোকে সব কামনা লাভ করে অমৃত হয়েছিলেন।'(১০) আগেরটির সঙ্গে এ কথার বিশেষ কোনও সংগতি নেই; হৃদয় ও মন তো আত্মা নয়, তারাই ইন্দ্রিয়াকর্মের প্রবর্তক। অথচ বামদেব চৈতন্যরূপ আত্মার দ্বারা এই পৃথিবী অতিক্রম করে স্বর্গে গেলেন ও সেখানে তাঁর সর্বকামনা চরিতার্থ হল, অর্থাৎ আত্মাই স্বগের সোপান এবং পরলোকে কামনা চরিতার্থ হয় আত্মার দ্বারাই।

তৈত্তিরীয় উপনিষদের শীক্ষাবল্লীতে আচার্যশিষ্যের একটি সংশয়ের কথা নিজেই তুলেছেন, ‘যদি তোমার করণীয় কর্ম বা আচরণ সম্বন্ধে কোনও সংশয় জাগে, (তা হলে) সদসৎ-বিচারক্ষম তরুণ ধামিক যে পণ্ডিতরা আছেন তাদের মতো আচরণ কোরো।’(১১) সংশয়ের সম্ভাবনা এখানে ধর্ম সম্বন্ধে নয়, আচরণ সম্বন্ধে, এবং সমাধানও ধর্মীয় নয়, নৈতিক। সমস্ত তৈত্তিরীয় উপনিষদেই নীতি একটি মুখ্য আলোচ্য বস্তু এবং এটাও লক্ষ্যণীয়, কারণ কর্মকাণ্ডে নীতি অপ্রাসঙ্গিক। আরও লক্ষ্যণীয় যে নীতির প্রশ্নে উত্তরটা ধর্মগ্রন্থ বা বেদ থেকে আসছে না: সমাবর্তনে অবভৃথস্নানের পর বেদপাঠাথী ব্রহ্মচারী যখন পাঠ সমাপ্ত করে গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করতে চলেছে তখন তাকে যে-উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এরই ঠিক আগে সেই কথাই আবার বলা হয়েছে, ‘যে সব কাজ অনিন্দনীয় তা-ই আচরণ কোরো, তা-ই সেবনীয়; যা আমাদের (আচার্যদের) সুচরিত, সেগুলিই অনুষ্ঠান কোরো, অন্যগুলির (অনুসরণ) কোরো না।’(১২)উপদেশে দু’বার বলা হল, যা আচার্যদের ভাল আচরণ নয়, তার অনুসরণ কোরো না। তার পর এল সংশয়ের কথা, অর্থাৎ এর পরেও যদি ব্রহ্মচারীর মনে আচরণ সম্বন্ধে সংশয় আসে তা হলে–শাস্ত্রের কোনও নির্দেশ নেই, আচার্যদের সুচরিত অনুসরণ করারই অনুজ্ঞা। কেমন আচার্য? যাঁরা পণ্ডিত, সচ্চরিত্র, অরুক্ষ (অর্থাৎ কোমলস্বভাব)–তেমন আচার্যরা অনুরূপ সংশয়িত ক্ষেত্রে যেমন আচরণ করেছেন সেইটিই আদর্শ। নীতির সংশয়ে পূর্বাচার্যদের সদাচরণই নিরিখ। এ শাস্ত্র সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের; সমাজে নানা পরিবর্তন, পরিবারে ও মানুষে-মানুষে সম্পর্কে এবং যজ্ঞ-পরবর্তী চিন্তার প্রসারে, সন্ন্যাসী সম্প্রদায়গুলির প্রাদুর্ভাবে আচরণের নিরিখ সম্বন্ধে সংশয়ের উদয় হওয়া স্বাভাবিক। তাই এই ধরনের নীতিগত সংশয়ের কথা শুনতে পাচ্ছি।

কোনোপনিষদের প্রথমেই প্রশ্ন, ‘কেন’ শব্দ দিয়ে সে প্রশ্ন শুরু, সেই থেকেই উপনিষদের

নামকরণ। প্রথম প্রশ্ন হল:

মন কার ইচ্ছায় প্রেরিত (চলিত) হয়? শ্রেষ্ঠ প্রাণ কার দ্বারা নিযুক্ত হয়ে চলে? মানুষ কার ইচ্ছায় প্রণোদিত হয়ে বাক্য উচ্চারণ করে? চক্ষু ও কর্ণকে কোন দেবতা তাদের

কর্মে নিযুক্ত করে?’(১৩)

প্রশ্নগুলি এক কথায় বললে, ‘ইন্দ্রিয়দের কর্মপ্রেরণা কোথা থেকে আসে?’ উত্তরে বলা হচ্ছে:

যিনি কর্ণের কর্ণ মনের মন, বাক্যের বাক্য, প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু স্বরূপ। এই জন্য পণ্ডিতরা ইন্দ্রিয়গুলিকে আত্মা মনে করেন না বলে মৃত্যুর পর অমৃতত্ব লাভ করেন। (১৪)

এটি এবং এর অনুরূপ বহু অংশ কর্মকাণ্ড থেকে জ্ঞানকাণ্ডে উত্তরণের একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ লক্ষণ: এখানে প্রশ্নটি খুবই স্বাভাবিক, ইন্দ্রিয়গুলি যে কাজ করে তা কি স্বয়ংক্রিয় ভাবে না। অন্য কোনও শক্তি এগুলিকে অলক্ষ্য থেকে পরিচালনা করে? দার্শনিক ভাষায় বললে দেহ কি দৈহিক ক্রিয়া নিজে সম্পাদন করে না তার অতিরিক্ত কোনও শক্তি দেহকে নিয়ন্ত্রণ করে? উত্তরটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ চক্ষু, কর্ণ, বাকশক্তির ওপারে, এমনকী প্রাণ ও মনেরও ওপারে থেকে যিনি এগুলিকে প্রবর্তিত করেন, সে-ই আত্মাকে যে সর্বশ্রেষ্ঠ চালক হিসেবে এবং দেহের নিয়ন্তা হিসেবে স্বীকার করে, সে-ই মৃত্যুর পরে অমৃতত্ব লাভ করে। এখানে প্রশ্নটি পুরাতন, আমরা দেখেছি আগেও ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে প্রশ্ন

সেই সংহিতা ব্রাহ্মাণের যুগ থেকেই আছে। উত্তরটিতে এক ঢিলে দুই পাখি মারা হল: ওই পুরাতন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হল, আবার জ্ঞানকাণ্ডের একটি বিশিষ্ট প্রতিপাদ্যকেও–দেহ-দেহী বিভাজন—প্রতিষ্ঠিত করা হল।

আগেই আলোচনা করা হয়েছে, ষোড়শ মহাজনপদের উত্থানের পরে সমাজে নানা রকম বিভাজন দেখা দিয়েছে: ধনিক-শ্রমিক, কায়িক শ্রম, মানসিক শ্রম, ইত্যাদি। এ সবেরই আনুষঙ্গিক দার্শনিক তত্ত্বের দিকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে-তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠিত হল তা হল দেহ ও আত্মার বিভাজন। আজ বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা জানি যে ইন্দ্রিয়ের প্রাথমিক প্রবর্তনা আসে স্নায়ুমণ্ডলী থেকে এবং স্নায়ুমণ্ডলী নিয়ন্ত্রিত হয় মন দ্বারা, যে-মন ইন্দ্রিয়-সমাবেশের অব্যতিক্রমী ফল। কিন্তু তা হলে তো দেহ-ব্যাতিরিক্ত আত্মাকে স্বীকার করা হয় না, এবং তা না হলে জন্মান্তর, অমরত্ব, মোক্ষ এ সব প্রতিপাদন করা যায় না, কারণ জন্মান্তর বা স্বর্গভোগ বা মোক্ষলাভ করবে কে? আত্মা চাই তো তার জন্যে। মনে রাখতে হবে, সংহিতাব্রিাহ্মাণেও মরণোত্তর স্বর্গ যমের তত্ত্বাবধানে সুখে থাকা, এ সব বলা হয়েছিল। কিন্তু সেগুলো ইচ্ছাপূরক ভাবনার প্রকাশ, তার মধ্যে কোনও তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়নি, হওয়ার প্রয়োজনও ছিল না এবং উপায়ও ছিল না। এখন জ্ঞানকাণ্ডে আত্মাই সর্বেসর্বা, এবং তা ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন। দেহের ধ্বংসের পরেও তাই তাকে বেঁচে থাকতে হবে, স্বর্গ, অমৃতত্ব বা মোক্ষ পাওয়ার জন্যে। অতএব তাকে দেহবিনিমুক্ত হতে হবে। এখন থেকে আত্মা দেহী, দেহ পঞ্চভূতের সমাহার। দেহের ক্রিয়াকর্ম নিয়ন্ত্রণ করে প্রাণ বা মন নয়, আত্মা; কারণ প্রাণ-মনের অবসান ঘটে মৃত্যুতে, মরণোত্তর অস্তিত্ব থাকে শুধু আত্মারই। এখানে যেটি প্রশ্নোত্তরের আকারে দেখা গেল, সমগ্র উপনিষদসাহিত্যের আধাআধি জুড়ে আছে তারই বিস্তারিত বিবরণ, তার লক্ষণ, দেহ থেকে তার সর্বতো ভাবে ভিন্নতা, তার মরণোত্তর অস্তিত্ব এবং ব্রহ্ম-স্বরূপতা।

ছন্দোগ্য উপনিষদের প্রথমেই দেখি তিন জন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ সামবেদ সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত। ছন্দোগ্য উপনিষদটি সামবেদেরই অন্তর্গত, তাই এদের প্রস্তাব খুবই সংগত। এদের মধ্যে একজন অন্যদের আলোচনা করতে বললেন, তিনি শুনবেন। এদের একজন অপরকে

প্রশ্ন করলেন:

–সামের আশ্রয় কী?
–স্বর
–স্বরের আশ্রয়?
–প্রাণ।
–প্রাণের...?
–অন্ন।
–অন্নের...?
–জল।
–জলের...?
–ওই স্বর্গলোক।
–স্বর্গলোকের...?
–সামকে কেউ স্বর্গলোকের ওপারে অন্য আশ্রয়ে নিয়ে যেতে পারে না, যেহেতু স্বর্গরূপে সামের স্তব করা হয়, তাই আমরা সামকে স্বগে প্রতিষ্ঠিত বলেই জানি।।(১৫)

শুনে তৃতীয় জন বললেন, 'আপনার সাম অপ্রতিষ্ঠিত থেকে গেল— অপ্রতিষ্ঠিতং বৈ কিল তো দালভ্য— সাম।' (১:৮৬) তখন তৃতীয় জন প্রশ্ন করলেন, 'এই লোকের আশ্রয় কী?? বললেন, 'আকাশ। পৃথিবীর স্থাবর জঙ্গম

সব কিছুই আকাশ থেকেই উৎপন্ন হয় এবং আকাশেই বিলীন হয়।'(১৬) যেটা চোখে পড়ে তা হল, এই যে ব্যাপারটা শুরু হল সামগানের আশ্রয় কী তা নিয়ে এবং উত্তরও খুব স্বাভাবিক ভাবেই 'স্বর' বলা হল, তেমনই সহজ স্বরের আশ্রয় প্রাণ, প্রাণের অন্ন, অন্নের জল এবং জলের আকাশ। পরের অংশটা অপ্রত্যাশিত, আকাশ থেকেই সব কিছু উৎপন্ন হয়, এবং আকাশেই সব কিছু বিলীন হয়। আকাশ থেকে সব কিছু উৎপন্ন হয়, এমন কথা অন্যত্র প্রায় নেই। উপনিষদে। বরং জল থেকে, স্বেদ থেকে, কামনা থেকে, দ্বিধাকৃত মিথুন থেকে, ইচ্ছা থেকে সৃষ্টির উদ্ভবের কথা নানা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে; এখানে শোনা গেল, আকাশ থেকে সব কিছু উৎপন্ন হয়েছে। হয়তো ছন্দোগ্য সামবেদের উপনিষদ বলে ও সামবেদে সুরের অতএব স্বরের প্রাধান্য বলে এবং সুর-স্বর বায়ুতে আশ্রিত ও বায়ু আকাশে আশ্রিত বলেই আকাশকে সৃষ্টির এবং বিলায়েরও কারণ হিসেবে বলা হল। এবং এখানে সুর আকাশের বায়ুতে মিলিয়ে যায় বলেই সামবেদী জিজ্ঞাসু আকাশকে এত প্রাধান্য দিলেন। এখানে লক্ষ্যণীয়, প্রশ্নগুলির পারম্পর্য এবং আপাত-নিরন্তরতা। কোনও উত্তরই চূড়ান্ত বলে যেন স্বীকার করা হচ্ছে না, এবং মূল প্রশ্নটি হল আধার নিয়ে। মানুষ দৃশ্য-জগৎকে বুঝতে চাইছে আধার-আধুতি সম্বন্ধে। সামবেদীর কাছে যে-আধার চূড়ান্ত, সেই আকাশে এসে প্রশ্ন ক্ষান্ত হল। প্রশ্নের পরম্পরা একটি অতৃপ্ত জ্ঞানান্বেষাকেই সূচিত করছে, এ দুটি এ যুগের একটি বৈশিষ্ট্য। সংহিতাব্রাহ্মণ মিলিয়ে যে-কর্মকাণ্ড তা ব্রাহ্মণ-অংশে যজ্ঞকর্মের অসংখ্য অনুপুঙ্খ নিয়ে অসংখ্য প্রশ্ন আছে; কিন্তু উত্তরগুলি কোনওটিই যথার্থ উত্তর নয়, একটা ব্যাখ্যাবিমুখ রহস্য দিয়েই উত্তর দেওয়া হয়েছে।

ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে শ্বেতকেতুকে পাঞ্চালরাজ প্রবাহণ প্রশ্ন করলেন, 'তোমার পিতার কাছে শিক্ষা পেয়েছ তো?' শ্বেতকেতু বললেন, পেয়েছেন; তখন প্রবাহণ প্রশ্ন করলেন:

—প্রাণীরা এই পৃথিবী থেকে ঊর্ধ্বে কোথায় যায় তা জান?
—শ্বেতকেতু বললেন, না, ভগবান!
–কেমন করে তারা ফেরে জান কি?
–না, ভগবান!
—দেবযান ও পিতৃযান নামের পথ দুটি কোথায় বিচ্ছিন্ন হয়েছে, জান?
–না, ভগবন।
–চন্দ্রলোক কেন ভরে ওঠে না, জান?
–না, ভগবন।
–পঞ্চম আহুতিটি দেওয়া হলে জল কেন পুরুষ বলে অভিহিত হয়, জান কি?
—না, ভগবন। (১৭)

এর পরে শ্বেতকেতু পিতার কাছে গিয়ে অনুযোগ করলেন তাকে অসম্পূর্ণ শিক্ষা দেওয়ার জন্যে, যার ফলে তিনি প্রবাহণের প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে পারেননি। তখন পিতা গৌতম পুত্রের সঙ্গে প্রবাহণের কাছে শিক্ষার্থী হয়ে এলেন। প্রবাহণ প্রথমে তাঁদের ধন দান করতে চাইলেন। গৌতম প্রত্যাখ্যান করলেন, তিনি ওই প্রশ্নগুলির উত্তরই চাইলেন। তখন প্রবাহণ। তাদের দীর্ঘকাল বাস করতে বললেন। তার পরে বললেন, 'এই বিদ্যা আপনার পূর্বে ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রবেশ করেনি–ইয়ং ন প্রাক ত্বত্তঃ পুরা বিদ্যা ব্রাহ্মাণান গচ্ছতি।' (৫:৩:৭) এখানে কয়েকটি ব্যাপার প্রণিধান করে দেখা উচিত: পিতাপুত্র যে সব উত্তর জানিবার জন্যে প্রবাহণের কাছে প্রার্থী হয়ে এসেছিলেন, প্রবাহণ প্রথমে তাদের উত্তরের বিনিময়ে ধন দিতে চাইলেন। তাঁরা প্রত্যাখ্যান করলে পর। প্রথমে দীর্ঘকাল তাদের ওখানেই অপেক্ষা করতে বললেন। এতে ওই বিদ্যার মহত্ত্বই সূচিত হল। দ্বিতীয়ত, প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়ার আগে একটা খবর দিলেন: এ বিদ্যা এর আগে কোনও ব্রাহ্মাণের কাছে যায়নি, অর্থাৎ এটি ক্ষত্রিয়ের নিজস্ব বিদ্যা।

এবার লক্ষ করে দেখা যাক, প্রশ্নগুলি কী। মনে রাখতে হবে, প্রশ্নগুলি ব্রাহ্মাণের ছিল না, ক্ষত্রিয় প্রবাহণই শ্বেতকেতুর মাধ্যমে প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করেছিলেন ব্রাহ্মণদের; তাঁরা উত্তর দিতে না পারলে তিনিই উত্তর দিলেন। প্রাণীরা এ পৃথিবী থেকে কোথায় যায়— মরণোত্তর অবস্থানের প্রশ্ন; কেমন করে তারা ফেরে–জন্মান্তর সম্বন্ধে প্রশ্ন; পিতৃযানে চন্দ্রের পথ ঘুরে আত্মা পুনর্জন্ম গ্রহণ করে, দেবযানে তারা সূর্যে পৌঁছে মোক্ষ লাভ করে; পুনর্জন্মই বেশি লোকের হয় বলে চন্দ্রের ভরে ওঠার প্রশ্ন ওঠে এবং পঞ্চম আহুতির পরে গর্ভস্থ সন্তানের বৃদ্ধি ঘটে, সে পুরুষ সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করে। পঞ্চম প্রশ্নটি যজ্ঞসংক্রান্ত এবং উত্তর কতকটা রহস্যগুঢ়। বাকি চারটি প্রশ্নই মরণোত্তর অবস্থা নিয়ে এবং বৈদিক সমাজের মানুষ দীর্ঘকাল ধরে এই সব সংশয়ে আক্রান্ত। নতুনের মধ্যে এই যুগে সমাজে জন্মান্তর স্বীকৃত একটি তত্ত্ব, তাই মানুষ কেমন করে পরলোক থেকে পৃথিবীতে ফেরে এবং পুনর্জন্মের পথ ও মোক্ষের পথ কোথায় পরস্পরবিচ্ছিন্ন হয়েছে। এ সব নতুন প্রশ্ন, পুনর্জন্ম মানলে এগুলির সম্মুখীন হতে হয়। পুনর্জন্ম মানলেও এ কথা সকলে স্বীকার করত যে, মোক্ষ অর্জন করা দুঃসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ, ফলে কম লোকই মোক্ষ লাভ করে। অধিকাংশই পুনর্জন্মের পথে চন্দ্রে পোঁছায়, তাই প্রশ্ন, চন্দ্র ভরে ওঠে না কেন।

সমাজে মরণোত্তর অবস্থিতি নিয়ে সংশয় সুদীর্ঘকাল ধরেই ছিল, জন্মান্তরবাদ আসবার পরে নতুন কিছু সম্ভাবনা দেখা দিল এবং সে সম্পর্কে নতুন কিছু সংশয় দেখা দিল যেগুলি এ যুগের বিশিষ্ট প্রশ্ন। সমাধানগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় বস্তুত সেগুলি সমাধানই নয়। কল্পিত পিতৃযান ও দেবযান এবং কল্পিত তাদের বিচ্ছেদ, ফলে চাঁদ ভরে ওঠার প্রশ্নও যেমন অবাস্তব, সমাধানও তেমনই অবাস্তব। কিন্তু যে-ব্যাপারটার গুরুত্ব আছে তা হল এগুলি অধিকাংশই যুগোচিত প্রশ্ন।

সংহিতায় এবং ব্রাহ্মাণেও যে-সংশয় ছিল, তা হল পরলোক আছে কি না, এবং সেখানে যাওয়ার ভাল নিরাপদ রাস্তা আছে কি না। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে যম সম্বন্ধে পরপর কাটি সুক্তে স্বর্গে পরলোকগত আত্মারা যমের তত্ত্বাবধানে সুখে থাকে এমন একটা ইচ্ছাপূরক কল্পনায় নির্মিত স্বর্গলোকের খবর পাই; কিন্তু ওই যুগেই রচিত ব্রাহ্মাণে সংশয়ের কথা আছেপরলোক আছে কি না সে-বিষয়ে, সেখানে নিরাপদে যাওয়া যায় কি না সে-বিষয়েও। যারা তাদের শ্রেষ্ঠ দেবতা ইন্দ্রের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সংশয়কে দ্বিধাহীন ভাবে উচ্চারণ করেছে এবং বলেছে, 'ইন্দ্র নেই, তারা সেই একই যুক্তিতে অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাবে পরলোক সম্বন্ধে যে সংশয় প্রকাশ করবে। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। লক্ষ্য করার ব্যাপার হল, প্রশ্নকর্তা ও উত্তরদাতা ক্ষত্রিয় এবং 'এসব প্রশ্নের উত্তর কোনও ব্রাহ্মণ পূর্বে জানোনি' এই কথাটা।

যখন মনে রাখি যে, ক্ষত্রিয় যুদ্ধ করত, বণিকবাহিনীর সহযাত্রী রক্ষক হিসেবে দূরদূরান্তে যেত, তখন বুঝি, অকালমৃত্যুর সম্ভাবনা ক্ষত্রিয়ের যেমন ছিল অন্য কারও তেমন থাকার কথা নয়। অতএব, মৃত্যুর পরে মানুষের কী হয়, এ সম্বন্ধে সংশয় ক্ষত্রিয়কে যে ভাবে বিচলিত করবে, অন্যকে তেমন নয়। তাই ক্ষত্রিয় প্রবাহণ ব্রাহ্মণদের বলছেন, এ বিদ্যা পূর্বে কোনও ব্রাহ্মণের কাছে যায়নি। এ সব প্রশ্নও ব্রাহ্মাণের শাস্তিকে তেমন করে ব্যাহত করেনি, যেমন করে করেছে ক্ষত্রিয়কে। শাস্ত্র ও তত্ত্ব নির্মাণ করেছে প্রধানত ব্রাহ্মণ, তাই পিতৃযান ও দেবযান নিয়ে তত্ত্বগুলো ব্রাহ্মণরা জানত এবং ধীরে ধীরে এগুলি সমাজের অন্য স্তরেও ছড়িয়ে পড়ে; কিন্তু তত্ত্বগুলি জটিল, তাই শাস্ত্রকারদের গোষ্ঠীর মধ্যেই মূলত আবদ্ধ ছিল। এ ক্ষেত্রে প্রশ্নগুলিরই তাৎপর্যবেশি কারণ এগুলির মধ্যে মানুষের কিছু মৌলিক দুশ্চিন্তার চিহ্ন ধরা আছে। এবং যথাযথ উত্তর না থাকায় বুঝতে পারি যে প্রশ্নগুলি রয়েই গেল।

এই সময়কার নতুন যে-বিষয়টি সমস্ত সমাজের ধর্মধারণায় আমূল নাড়াচাড়া দিয়েছিল তা হল আত্মা ও ব্রহ্মা। ছন্দোগ্য উপনিষদে পড়ি, প্রাচীনশাল, সত্যযজ্ঞ, ইন্দ্রদ্যুম্ন, জন, বুড়িল এই পাঁচ জন ধনী বেদজ্ঞ একত্র হয়ে মীমাংসা করতে চাইলেন, 'আত্মা কে, ব্রহ্মা কী— কো না আত্মা কিং ব্রহ্মেতি।' (৫:১১:১)। তারা পরামর্শ করে অরুণের পুত্র উদ্যালকের কাছে যাওয়া স্থির করলেন, কারণ বৈশ্বানর আত্মাকে জানেন। আরুণির মনে হল, তিনি এদের সব প্রশ্নের উত্তর হয়তো দিতে পারবেন না, তাই তিনি এদেরকে নিয়ে কেকয়রাজ অশ্বপতির কাছে গেলেন। অশ্বাপতি এদের প্রচুর ধন দিতে চাইলে এরা গ্রহণে অসম্মত হলেন, শুধু বৈশ্বানর আত্মা সম্বন্ধে তাদের প্রশ্নের উত্তরই চাইলেন। তখন অশ্বাপতি পরদিন উত্তর দিতে সত্যস্বীকার করলে এরা উপনয়ন-প্রার্থীর মতো তার কাছে গেলেন; তিনি উপনয়ন না দিয়েই তাদের একে একে প্রশ্ন করলেন, তারা আত্মা বলে কার উপাসনা করেন? একে একে উত্তর এল দুলোক, আদিত্য, বায়ু, আকাশ, জল ও পৃথিবী। রাজা একে একে প্রত্যেকের উত্তর ত্রুটিযুক্ত ও অসম্পূর্ণ বললেন এবং বললেন, তার কাছে না এলে এঁদের কারও মাথা খসে যেত, কারও চোখ অন্ধ হত, প্রাণহানি ঘটত, দেহ খণ্ডিত হত, মুত্রাশয় বিদীর্ণ হত, পা-দুটি শীর্ণ হয়ে যেত। (৫:১২:১,২-১৩:১,২, ১৪:১, ২; ১৫:১,২; ১৬:১,২; ১৭:১,২) সকলের প্রশ্নের উত্তরে অশ্বপতি বললেন, প্রত্যেকের দেখার দোষ হল। খণ্ডিত ভাবে আত্মাকে দেখা, যিনি বৈশ্বানর আত্মাকে সর্বলোকে সর্বভুতে উপাসনা করেন। তিনি এ সকলের মধ্যে অন্ন আহার করেন। (৫:১৮:১)

একবার সনৎকুমারের সঙ্গে নারদের কথা হচ্ছিল, সনৎকুমার বললেন, 'যে কেউ মনকে ব্রহ্মা বলে উপাসনা করে, সে, মনের গতি যতদূর পর্যন্ত ততদূর পর্যন্ত স্বেচ্ছাগতি লাভ করে। অর্থাৎ ইচ্ছেমতো যাতায়াত করতে পারে।' তখন নারদ বললেন, 'ভগবন, মনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কিছু থাকলে আমাকে ত বলুন।'

সনৎকুমার বলে গেলেন সংকল্প মন থেকে শ্রেষ্ঠ; চিত্ত সংকল্প থেকে, ধ্যান চিত্ত থেকে, বিজ্ঞান ধ্যান থেকে শ্রেষ্ঠ; বল বিজ্ঞান থেকে, অন্ন বল থেকে, জল অন্ন থেকে শ্রেষ্ঠ; তেজ জল থেকে, আকাশ তেজ থেকে, স্মৃতি আকাশ থেকে শ্রেষ্ঠ; আশা স্মৃতি থেকে এবং প্রাণ আশা থেকে শ্রেষ্ঠ। (৭:৩-৭:১৫) আলোচনার শুরুতে বলা আছে বাক–যার মধ্যে সমস্ত বেদ ও সমস্ত বিদ্যা আছে–তার থেকে মন শ্রেষ্ঠ। তার পরে মন কী কী থেকে শ্রেষ্ঠ এই পরম্পরায় প্রাণ পর্যন্ত পৌঁছোল। তখনকার সমাজে মানুষ প্রকৃতি, মানবদেহ মানবমন ও তার বিভিন্ন অবস্থাকে একটা পরিচ্ছন্ন সুপরিনির্ষ্ঠিত আকল্পের মধ্যে স্থাপন করে বুঝে নিতে চাইছিল। তাই এগুলিকে আপেক্ষিক গুণ ও মান অনুসারে সাজাতে চেষ্টা করছিল। কারণ বিশ্বচরাচরে এদের স্থান, গুণ ও মান নিয়ে তাদের মনে প্রশ্ন ছিল।

এক সময়ে দেবতা ও অসুররা আত্মার সন্ধান করতে চাইলেন। কারণ তা হলে কাম্যবস্তু লাভ করা যাবে।

‘তখন দেবতাদের মধ্যে থেকে ইন্দ্র আর অসুরদের মধ্যে থেকে বিরোচন সন্ন্যাস নিলেন। এবং একে অন্যকে না জানিয়ে সমিধা হাতে নিয়ে প্রজাপতির কাছে গেলেন। তারা বত্রিশ বছর ব্রহ্মচর্য পালন করার পর গেলে প্রজাপতি জিজ্ঞাসা করলেন তারা কী উদ্দেশ্যে এসেছেন। তাঁরা বললেন যে-আত্মায় পাপ, জরা, মৃত্যু, শোক, ক্ষুধা, পিপাসা নেই, যিনি সত্যকাম ও সত্যসংকল্প তারই সন্ধান করা উচিত। আপনার মত হল, যিনি আত্মার পরিচয় পেয়ে তাকে উপলব্ধি করেন। তিনি সমস্ত লোক ও কাম্যবস্তু পান। আমরা সেই আত্মাকে জানিবার ইচ্ছায় ব্রহ্মচর্য পালন করেছি। ...প্রজাপতি বললেন, জলপূর্ণ পাত্রে যার প্রতিবিম্ব পড়ে তিনিই আত্মা। তিনি তাঁদের উত্তম বস্ত্রীলংকারে সজ্জিত হয়ে একটি জলপূর্ণ পাত্রের দিকে তাকাতে বললেন ও প্রশ্ন করলেন তাঁরা কী দেখছেন। তাঁরা বললেন সুসজ্জিত পুরুষের প্রতিবিম্ব

দেখছেন। প্রজাপতি বললেন ইনিই অমৃত ও অভয় আত্মা, ইনিই ব্রহ্মা। দুজনে শান্তচিত্তে ফিরে গেলেন। প্রজাপতি মন্তব্য করলেন, এরা আত্মাকে না জেনে চলে যাচ্ছে, এমন লোকেরা পরাভূত হয়। বিরোচন গিয়ে অসুরদের বললেন, ইহলোকে এই আত্মা (= দেহ)-কেই উপাসনা ও সেবা করা উচিত, তা হলেই ইহলোক ও পরলোক দুই-ই লাভ করা যায়।'

প্রজাপতি বললেন, 'এ-ই হল আসুরী উপনিষৎ, এরই ভ্রমে লোকে মৃতদেহকে উত্তম বস্ত্র-অলংকারে সাজায়, মনে করে ওই সজাতেই পরলোক জয় করা যাবে। ... ইন্দ্র কিন্তু আবার ফিরে এলেন। প্রজাপতির প্রশ্নের উত্তরে বললেন, এ তো দেহকেই আত্মা জ্ঞান করা, দেহ তো ধ্বংস হয়, সেটা তো আত্মার ধর্ম নয়।' প্রজাপতি স্বীকার করলেন, বললেন, 'ঠিকই। তুমি আরও বত্রিশ বছর এখানে তপস্যা করো।' এর পরে প্রজাপতি বললেন, 'স্বপ্নে যাকে দেখা যায় সে-ই আত্মা।' ইন্দ্র তাতেও তুষ্ট হলেন না। প্রজাপতির নির্দেশে আরও বত্রিশ বছর তপস্যার পরে প্রজাপতি বললেন যিনি সুষুপ্ত তিনিই আত্মা, এতেও ইন্দ্র তুষ্ট না হতে প্রজাপতি আরও পাঁচ বছর পরে তাঁকে বললেন, শরীর মরণশীল, যিনি শরীর ধারণ করেন তিনি শোক দুঃখ ও মৃত্যুর অধীন। শরীর আত্মা নয়, কিন্তু আত্মার আধার; যিনি অশরীর, সুখদুঃখ মৃত্যু তাকে স্পর্শ করে না। (দেহস্থ) যিনি মনে করেন 'আমি চিন্তা করি তিনিই আত্মা' (৮:৭-৮:১২) এই অংশে দেহ ও আত্মার ভেদ খুব স্পষ্ট করে বোঝানো হয়েছে। মনে হয়, দেহাত্মবাদী চার্ব্বকপহী লোকায়তিক কিছু মতবাদ তখন সমাজে চলিত ছিল এবং আত্মা কী সে-বিষয়ে নানা ধরনের সংশয়ও লোকের মনে উদিত হত:

দর্পণে যাকে দেখা যায় সে-ই কি আত্মা?
জলে যার প্রতিবিম্ব পড়ে সে-ই আত্মা?
স্বপ্নে যে দেখা দেয়, সে-ই আত্মা?
স্বপ্নহীন গভীর নিদ্রা যার, সে-ই কি আত্মা?

দেহব্যাতিরিক্ত আত্মার কল্পনা এ যুগেই প্রথম, তাই তার যথার্থ সত্তা নিয়ে স্বভাবতই জনমনে নানা সংশয়। এ আত্মার সঙ্গে পরলোক ও জন্মান্তর জড়িত, কাজেই এর মৃত্যুতে এর শেষ হলে চলে না। বিষয়টি বিতর্কিত বলে জিজ্ঞাসুইন্দ্র, যিনি দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যাঁর প্রশ্ন করছেন, এর জিজ্ঞাসা অল্পে বা মাঝপথে তৃপ্তি হয় না। যেমন অসুরশ্রেষ্ঠ বিরোচনের হয়েছিল। এতে তত্ত্বটির উৎকর্ষও প্রতিপন্ন হল, আরও বেশি করে হল প্রজাপতি বারবার ইন্দ্রকে নিয়ে বহু বছর ব্রহ্মচর্য পালন করিয়ে নিয়েছিলেন বলে। এতে বোঝানো হল যে এ তত্ত্ব সাধারণ মানুষের বুদ্ধির কাছে অগম্য এবং সহজে এ জ্ঞান লাভ করা যায় না।

_____

(১) '(Disbelief.) may spring from the tension between asceptical mund and a religious heart.'-Kirkegaard, p. 3

(২) '. . . the idea of personal immorality has only been divorced from the prececiding one (i.e., the non-death of the soul) after a philosophical elaboration,, a concept of another life does not have its origin in the Institution of sacrifice.'– Herbert and Mauss, p. 64

৩. প্রজাকামো হৈ বৈ প্রজাপতিঃ, সি তপোহাতপাত, সি তপসস্তপ্ত সি মিথুনমুৎপাদয়ত রায়িঞ্চ প্রাণঞ্চেতি। এতৌ সে বহুধা প্রজাঃ করিষ্যত ইতি। প্র. উ. (১:৪)

৪. ভগবন, কত্যেব দেবা। প্রজাং বিধারয়ন্তে? কতর এতৎ প্রকাশয়ন্তে? কঃ পুনরেষাং বরিষ্ঠ? (২:১)

৫. আকাশো হা বা এষ দেবো বায়ুরগ্নিরাপঃ পৃথিবী বাঙমনশচক্ষুঃ শ্রোত্রঞ্চ। তে প্রকাশ্যাভিবদন্তি বয়মেতাদ্বাণবষ্টভৎ বিধারয়ামঃ।...বরিষ্ঠঃ প্রাণঃ। প্র. উ. (২:২৩)

(৬) ভগবানু, কুত এষ। প্রাণো জায়তে? কথামায়াত্যস্মিথুরীর আত্মনেং প্রবিভাজ্য কথং প্রতিষ্ঠতো? কোনোৎক্রমতে? কথং বাহামভিধাত্তে? কথমধ্যাত্মমিতি।. তস্মৈ স হোবাচ–অতিপ্রাশন পুচ্ছসি, ব্রহ্মিষ্ঠোহসীতি, তস্মাত্তেহহং ব্রবীমি। আত্মান এয প্রাণো জায়তে। যথৈষা পুরুষোচ্ছায়া এতস্মিন্নেতদাততং মনোকৃতেনায়াত্যস্মিথুরীরে। প্র. উ. (৩.১-৩)

(৭) ভগবান্নেতস্মিন পুরুষে কানি স্বপন্তি? কানাস্মিন জাগ্রতি? কতর এষ দেবঃ স্বপ্নান পশ্যতি? কস্যেতৎ সুখং ভবতি? কস্মিয়ু সর্বে সপ্রতিষ্ঠিত ভবভীতি। তস্মৈ স হোবাচ–যথা গার্গা! মরীচায়োহর্কস্যাস্তং গচ্ছতঃ সর্ব এতস্মিাংস্তেজোমণ্ডল একীভবত্তি। তাঃ পুনরুদয়তঃ প্রচারান্তি; এবং হ বৈ সর্ব্বং তৎ। পরে দেবে একীভবতি। প্র. উ. (৪:১-২)

(৮) স যোহি বৈ তদ্ভগবান মানুষ্যেষু প্রায়ণাস্তমোঙ্কারমভিধ্যায়ীত। কতমং বাব সতেন লোক্যং জয়তীতি তস্মৈ স। হোবাচ। এতদ্বৈ সত্যকাম পরঞ্চাপরঞ্চ ব্রহ্মা যাদোস্কারঃ। তস্মাদ বিদ্ধানেতেনৈবায়তনেনৈকতারমন্বেতি।

(৯) কেহয়মাত্মেতি বয়মুপাস্মহে কাতরঃ সা আত্মা যেন বা বুপিং পশ্যতি যেন বা শব্দং শৃণোতি যেন বা

গন্ধামাজিঘ্রতি যেন বাচং ব্যাকর্যোতি যেন বা স্বাদু চাস্বাদু বিজানাতি। ঐ, উ, (৩:১:১)

(১০) সি এতেন প্রজ্ঞেনাত্মনাস্মাল্লোকান্দ উৎক্রম্য অমুষ্মিন স্বর্গে লোকে সর্বান কামান আপ্ত অমৃতঃ সমভাবৎ। ঐ.উ. (৩.১.৩)

(১১) অথ যদি তে কর্মবিচিকিৎসা বৃত্তবিচিকিৎসা বা স্যাৎ। যে তত্র ব্রাহ্মাণাঃ সম্মর্শিনঃ। যুক্ত আযুক্তা। অলুক্ষণ ধর্মকামঃ সুঃ যথা তে বর্তেরন। তথা তত্র বর্তেথাঃ! তৈ. উ. (১:৩-৪)

(১২) যান্যানবদ্যানি কর্মণি। তানি সেবিতব্যানি। নো ইতরাণি। যান্যস্মাকং সুচরিতানি। তিনি ত্বয়োপাস্যানি। নো ইতরাণি।। তৈ, উ, (১:২:২)

(১৩) কেনেবিতং পততি প্রেবিতং মনঃ কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ। কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি।। কে. উ. (১.১)

১৪. শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ, বাচো হা বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ। চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরা প্রেত্যাস্মাল্লোকদমৃত ভবস্তি। কে. উ. (১:২)

১৫. কা সামো গতিরিতি স্বর ইতি হোবাচ স্বরস্য কা গতিরিতি প্রাণ ইতি হোবাচ প্রাণস্য কা গতিরিত্যান্নমিতি হোবাচ আন্নাস্যক গতিরিত্যাপ ইতি হোবাচ। অপাংক গতিরিত্যসৌ লোকইতি হোবাচমুষ্য লোকস্য কা গতিরিতি ন স্বর্গং লোকমতিনয়েন্দতি হোবাচ স্বর্গং বিয়ং লোকং সামভি সংস্থাপিয়ামঃ স্বর্গসংস্তাবং হি সামেতি। ছা. উ. (১:৮:৪,৫)

১৬. অস্য লোকস্য কা গতিরিত্যাকাশ ইতি হোবাচ সর্বণি হ'বাইমানি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎপদ্যস্ত আকাশং প্রত্যস্তং যান্তি। (১.৯.১)

১৭. বেখ যদিতোহধি প্রজাঃ প্রযন্তীতিন ভগব। ইতি বেখ যথা পুনরাবর্তন্তইতিন ভগব। ইতি বেখ পথোর্দেবযানস্য পিতৃষাণস্য চ ব্যাবর্তন ইতিন ভগাব ইতি। বেখ যথাসৌ লোকো ন সম্পূর্যত ইতিন ভগাব ইতি বেখ যথা পঞ্চম্যাকুতাবাদঃ পুরুষবাচসো ভবন্তীতি নৈব ভগব। ইতি। ছা. উ. (৫:৩:২৩)

অজানা উত্তর

এ যুগে একটা ঘটনা বারবার চোখে পড়ে। কিছু জিজ্ঞাসু লোক বিজ্ঞতর প্রবীণ তাত্বিক বা আচার্যের কাছে যাচ্ছেন, আত্মা বা ব্রহ্ম অথবা এ দুই বিষয়ে প্রশ্ন নিয়ে। কর্মকাণ্ডে কিছু প্রশ্নের আলোচনা ছিল যজ্ঞের প্রণালী নিয়ে, কখনও-বা অভীষ্ট ফল নিয়ে। জিজ্ঞাসা ছিল দেবতাদের সম্বন্ধে, কিন্তু তখন আত্মা বা ব্রহ্ম ধর্মজগতে কোনও গুরুত্বপূর্ণ সত্তা বলে স্বীকৃত ছিল না। মরণোত্তর অবস্থা সম্বন্ধে ধারণা ছিল অস্পষ্ট, জন্মান্তরবাদ তখনও দেখা দেয়নি। এই সব নতুন তত্ত্বের উদ্ভব ও বিকাশের যুগে তাই জিজ্ঞাসাগুলি অন্য চেহারায় উপস্থিত হয়ে সমাধান দাবি করল। এ সমাধানের দায় জ্ঞানজ্যেষ্ঠ ধর্মতত্ত্ববিদদের। কাজেই মানুষ তাঁদের কাছে আসতে লাগল। মঠ বা আশ্রমের গ্রন্থাগার, পাঠকক্ষ বা সাধারণ্যে অনুষ্ঠিত আলোচনা ও ভাষ্যের ওপরে প্রতিষ্ঠিত আস্য বা লিখিত কোনও বাস্তব দর্শনের বিকাশের অনুকুল এমন কোনও প্রতিষ্ঠানিক সহকারিত্ব তখন সহজলভ্য ছিল না। (১)

গ্রন্থাগার বা পাঠাগার ছিল না, কিন্তু ধীরে ধীরে বিকল্প এক প্রণালীতে দার্শনিক তত্ত্বগুলি অস্পষ্ট ভাবে এবং মাঝে মাঝে পরস্পরবিরোধী উপাদান

নিয়েও সংহত হচ্ছিল। এই প্রণালীতে একটি ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল, তার নাম ‘ব্রহ্মোদ্য’–ব্রহ্মবিষয়ে আলোচনা ও বিতর্ক সভা, কখনও পরিকল্পিত ভাবে আয়োজিত, কখনও-বা তাৎক্ষণিক প্রেরণায় অনুষ্ঠিত। ব্রহ্ম ও আত্মা যেহেতু এ যুগের নতুন তত্ত্ব, এবং এ দুটির সমানার্থতা যেহেতু তখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিপাদ্য এবং পূর্ববর্তীর্ণ ধর্মসাহিত্য–সংহিতা-ব্রাহ্মণ-আরণ্যক–যেহেতু এগুলি নিয়ে আলোচনা করেনি। তাই এ চর্চার ঐকান্তিকতা আরও বেশি চোখে পড়ে। চিন্তাশীল সকল মানুষই হয়তো তখন কমবেশি ব্রহ্মবিষয়ে অবহিত, কেউ কেউ বিচলিতও। তাদের কারও কারও কাছে এ দুটি তত্ত্বের স্বরূপ ও এদের সম্পর্কের নিষ্পত্তি জীবনের পক্ষে আত্যন্তিক জিজ্ঞাসার রূপ পরিগ্রহ করেছিল। খুব বেশি আনুষ্ঠানিক ব্রহ্মোদ্যের সন্ধান পাওয়া যায় না, তবে অনেকগুলি উপাখ্যানে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কিছু অনুসন্ধিৎসু মানুষের বিজ্ঞতর ব্রহ্মজ্ঞানীর কাছে আলোচনা করতে যাওয়ার কথা শুনি। আবার ছন্দোগ্যোপনিষদে অন্য ধরনের একটি কাহিনিতে দেখি ক্ষত্রিয় রাজা জনকের কৌতুহল হল, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের মধ্যে সবচেয়ে অগ্রসর কে তা নির্ণয় করার। এক হাজার গাভির দুটি দুটি শিংয়ে দশ দশ পাদ সোনা বেঁধে রেখে তিনি ঘোষণা করলেন ব্রহ্মজ্ঞানীদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ তিনিই স্বর্ণশৃঙ্গ গাভিগুলি পাবেন। সমবেত ব্রাহ্মণদের বললেনও, আপনাদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞানী। তিনিই এগুলি পাবেন। এটি প্রচলিত পদ্ধতিতে একটি ব্রহ্মোদ্যের প্রস্তুতি: ব্রাহ্মণরা পরস্পরের সঙ্গে তর্কবিতর্ক করবেন, শ্রেষ্ঠত্ব নিষ্পন্ন হলে দান দেওয়া হবে। ঘটনোটা ঘটল একটু অন্য ভাবে, কারণ যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর শিষ্যদের বললেন, গাভিগুলিকে তাঁর আশ্রমে নিয়ে যেতে। এতে সমবেত ব্রাহ্মণরা আপত্তি করলেন, ব্রহ্মজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ যে ‘ব্রহ্মিষ্ঠ’ তাঁকে আমরা প্রণাম করি। আমরা তো সব গোকাম (গাভিরা কামনাতেই সমবেত)।(২) তখন সমবেত ব্রাহ্মণরা একে একে যজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করতে লাগলেন এবং যথাসম্ভব উত্তরও পেলেন। ফলে যাজ্ঞবল্ক্যই যে ব্রহ্মিষ্ঠ তা এই প্রলম্বিত ব্রহ্মোদ্যে

প্রমাণিত হল। লক্ষ্য করলে দেখা যায় যজ্ঞে যেমন দক্ষিণা ছিল, ব্রহ্মোদ্যেও প্রায়ই দক্ষিণা মিলত। কর্মকাণ্ডে যজ্ঞক্রিয়ার পারিশ্রমিক হল দক্ষিণ আর ব্রহ্মোদ্যে জ্ঞানের পুরস্কার দক্ষিণা।

প্রতিদ্বন্দ্বী অন্য ব্রহ্মজ্ঞানী বা ব্রহ্মজিজ্ঞাসুরাই একে একে যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করলেন, যাজ্ঞবল্ক্য উত্তরও দিলেন, কিন্তু উত্তরগুলিকে সব সময়ে প্রশ্নের নিরসনের পক্ষে যথার্থ বা যথেষ্ট মনে হত না।

প্রথমে অশ্বল প্রশ্ন করলেন, 'সব কিছুই যেহেতু মৃত্যু দ্বারা আবৃত, তখন যজমান কোন উপায়ে মৃত্যুকে অতিক্রম করবেন?–যদিদং সর্বং মৃত্যুনাভিপন্নং কেন যজমানো মৃত্যোরাপ্তিমতিমুচ্যেত।' (ছা. উ. ৩:১:৩)

যজ্ঞবল্ক্য বললেন, যজমানের বাক্‌ই হোতা। এইবাক অগ্নিদেবতা এবং অগ্নিই হোতা, এই অগ্নিই মুক্তি ও অতিমুক্তির উপায়–হোত্রাত্বিজাইগ্নিনা বাচা বাথৈ যজ্ঞস্য হোতা তদ যেয়ং বাক সোেহয়মগ্নিঃ সা হোতা স মুক্তিঃ সাহিতিমুক্তিাঃ।।' (৩:১:৩)

অগ্নির দ্বারা কী ভাবে মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায় তার কোনও ইঙ্গিত দেওয়া নেই। যজমান, হোতা, বাক, অগ্নি সবই যজ্ঞে বহু পূর্ব থেকেই ছিল, কিন্তু মৃত্যুও ছিল, তাকে অতিক্রম করার পথ জানা ছিল না বলেই অশ্বলের প্রশ্ন। যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তর মৃত্যুর মতো প্রকাণ্ড সমস্যার সমাধানের যথার্থ সমাধান নয়।

অশ্বল তাই প্রশ্ন করেন, 'এই অন্তরিক্ষ যখন নিরবলম্বন মনে হচ্ছে, তখন যজমান কী আশ্রয় করে স্বর্গলোক লাভ করবেন?–যদিদমন্তরিক্ষমনারম্বণমিব কেনাক্রমণেন যজমানঃ স্বর্গং লোকমাত্রমত।' (ছা, উ. ৩:১:৬)।

উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, ‘ঋত্বিক-রূপ ব্রহ্মা ও মানরূপ চন্দ্রদেবের দ্বারা। ওই চন্দ্রই মুক্তি, ওই মুক্তিই অতিমুক্তি।’ এর পরের ক’টি ঋকে স্তুতি করবেন হোতা, অধ্বর্যু করকম আহুতি দেবেন, ব্রহ্মা ক’জন দেবতার দ্বারা যজ্ঞকে রক্ষা করবেন, উদগীতা কত রকম স্তোত্র গান করবেন, অশ্বল। এই সব প্রশ্ন করেন এবং যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দেন। সঙ্গে সঙ্গে এইগুলির দ্বারা যথাক্রমে পৃথিবীর সব প্রাণী, দেবলোক, অনন্তলোক, পৃথিবীলোক, অন্তরিক্ষলোক ও দ্যুলোক জয় করা যায় তা-ও বলবেন। দেখা যায়, মৃত্যু অতিক্রম করা যে-প্রশ্নটি তখনকার এবং চিরকালই–সব মানুষকে চিন্তাকুল করে রেখেছে তার কোনও পর্যাপ্ত উত্তর এতে নেই। স্তুতি, আকুতি এবং যজ্ঞরক্ষায় দেবতাদের নিয়োগ, এ সব তো পূর্ব হতেই চলিত ছিল, তাতে মৃত্যুকে অতিক্রম করার কোনও সম্ভাবনা ছিল না বলেই অশ্বলের প্রশ্ন। এর পরে জরৎকারব আর্তভাগ প্রশ্ন করেন, ‘এই সমস্তই যখন মৃত্যুর অন্ন তখন কোন সেই দেবতা, মৃত্যু যাঁর অন্ন?’ উত্তর, ‘অগ্নিই মৃত্যু, অগ্নি জলের অন্ন, যিনি এমন জানেন তিনি পুনস্মৃত্যু জয় করেন।’(৩)

এর আগে আর্তভাগ যজ্ঞের আটটি ‘গ্রহ’ (আহুতি গ্রহণ) সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে যাজ্ঞবল্ক্য যথাক্রমে প্রাণ, বাক, জিহ্বা, চক্ষু, শোত্র, মন, হস্ত ও ত্বককে ওই গ্রহের সমর্থক বললেন। চোখে পড়ে, যেহেতু যজ্ঞই তখনও প্রধান ও প্রচলিত ধর্মাচরণ তাই যজ্ঞীয় উপাদানগুলিকে মানুষের বাহ্য ও অন্তরিন্দ্রিয়ের সঙ্গে একাত্ম করে দেখিয়ে যজ্ঞের গ্রহণযোগ্যতা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চলছে। তার পর আর্তভাগ মৃত্যু সম্বন্ধে প্রশ্নটি করেন এবং উত্তরে একটি খুব লক্ষ্যণীয় কথা হল, পুনর্মৃত্যু; যে-সমাজে পুনর্জন্মের কল্পনাটি গৃহীত হয়েছে সেখানে মৃত্যুকে উত্তরণ করার প্রসঙ্গে পুনর্মৃত্যু জয় করাটাকে একটা পরমার্থ বলা হচ্ছে। মৃত্যু যন্ত্রণা মানুষ দেখেছে, বারেবারে সে-যন্ত্রণার সম্মুখীন হওয়া ভয়াবহ দুর্ভাগ্য, এবং পুনর্মৃত্যুর পরেই তো পুনর্জন্ম, কাজেই পরিত্রাণ নেই ধারাবাহিক

জন্মমৃত্যুর পুনরাবর্তন থেকে। এই পরিপ্রেক্ষিতে পুনর্মৃত্যু উত্তরণ করার প্রলোভন খুবই বড় প্রলোভন।

এর পর ভুজ্যু লাহ্যায়নি যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করেন, 'পারিক্ষিতারা কোথায় গিয়েছেন?–ক্ব পারিক্ষিতা অভিবান্নিতি।' (৩:৩:১) পারিক্ষিতরা রাজচক্রবতী ও অশ্বমেধ-যজ্ঞকারী ছিলেন। উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, 'অশ্বমেধাবাজীরা যেখানে যান। তারা সেখানে গেছেন।' 'সে কোথায়', প্রশ্ন করলে যাজ্ঞবল্ক্য অনেক ঘুরপথে গান্ধর্ববায়ুলোকের উল্লেখ করেন। লক্ষ্য করি, যাজ্ঞবল্ক্য যে-উত্তর দিলেন সে তার নিজস্ব মত মাত্র। তার কোনও প্রমাণ নেই, এবং তা আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানের সঙ্গে কোনও ভাবেই যুক্ত নয়। এর পরে চাক্রায়ণ প্রশ্ন করেন:

—যিনি সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম, যিনি সর্বান্তর আত্মা তাঁর বিষয়ে আমাকে বিশেষ করে বলুন।

–সর্বান্তর ইনিই আপনার আত্মা।

—যাজ্ঞবল্ক্য, কোন্ আত্মা সর্বান্তর?

–যিনি প্রাণের দ্বারা প্রাণক্রিয়া, অপানের দ্বারা অপানক্রিয়া, ব্যানের দ্বারা ব্যানক্রিয়া, উদানের দ্বারা উদানক্রিয়া করেন, সর্বান্তর তিনিই আপনার আত্মা।

–এ তো বিপরীত নির্দেশ।

–দৃষ্টির দ্রষ্টাকে, শ্রবণের শ্রোতাকে, মনোবৃত্তির মননকারীকে, বুদ্ধির বোদ্ধাকে কেউ জানতে পারে না; সর্বান্তর ইনিই আপনার আত্মা, ইনি ছাড়া আর সব কিছুই ধ্বংসশীল। (ছা. উ. ৩.৪.১-২)

এখানেও আত্মার স্বরূপ-সত্তা সম্পর্কে প্রশ্নের বাস্তব উত্তর হল, দেহের মধ্যে থেকে যিনি দেহমানের সকল ক্রিয়ার যথার্থ কর্তা তিনিই আত্মা। এখানেও ওই দেহব্যাতিরিক্ত আত্মা নামের এক সত্তাকে প্রতিষ্ঠা করার বিশেষ চেষ্টা। এবং বেশ চোখে পড়ে যে এ তত্ত্বকে নানা ভাবে বিশদরূপে ব্যাখ্যা করতে হচ্ছে, কারণ সমাজমানসে এর পূর্বে আত্মার অর্থ ছিল দেহ, তাই এখন নতুন যে আত্মাকে উপস্থাপিত করা হচ্ছে সে দেহব্যাতিরিক্ত বলে সাধারণ মানুষের ধারণার বাইরে, তাই বিভিন্ন দৈহিক ও মানস ক্রিয়ার থেকে স্বতন্ত্র বলে উল্লেখ করে বোঝানো হচ্ছে যে, এ এক অন্য আত্মা। এর ভিন্নত্ব, পৃথকত্ব ভাল ভাবে প্রতিষ্ঠিত না হলে একে ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন বলা যাবে কেমন করে?

কহোল এবার প্রশ্ন করলেন, ওই একই প্রশ্ন:
—কোনটি সর্বান্তর আত্মা?
—ক্ষুধা, পিপাসা, শোকমোহ, জরামৃত্যুর অতীত যিনি, যিনি পুত্র, বিত্ত ও লোককামনা থেকে মুক্ত হয়ে ভিক্ষাচার্য গ্রহণ করেছেন তিনিই আত্মবিদ্যা লাভ করেন, সেই বলে বলীয়ান হয়ে মননশীল হন। মনন ও মননহীনতার পার্থক্য সম্যক ভাবে জেনে তিনি ব্রাহ্মণ হবেন।
–সে ব্রাহ্মাণের আচরণ কেমন হবে?
–তাঁর আচার যেমনই হোক তিনি ব্রাহ্মণই, এর বাইরে সব কিছু বিনাশশীল। (ছা. উ. ৩:৫:১)। এখানে দু-তিনটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য, প্রথমত সব রকম কামনাকে জয় করা ব্রহ্মবিদ্যার একটি প্রাকৃশর্ত, তার পরে মননকে আশ্রয় করে ভিক্ষাটন করাও চাই। স্বভাবতই মনে পড়ে, এ যুগে জৈন, বৌদ্ধ, আজীবিক এবং আরও বহু চিন্তাশীল ব্যক্তির প্রস্থান যারা অবলম্বন করেছিল তারা সকলে আগে থেকেই এক ধরনের বিশ্বাসে এই ধরনের জীবনই যাপন করছিল। কাজেই এখানে ব্রাহ্মণী' কথাটির ওপরে একটা বাড়তি জোর দেওয়া হয়েছে। ওই প্রস্থানের লোকেরা নিজেদের ব্রাহ্মণ বলত না, এখন শুনছি। তার

আচরণ যেমনই হোক না কেন সে-ই খাঁটি ব্রাহ্মণ। উপনয়ন, ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য নিয়ে যে-ব্রাহ্মাণের সংজ্ঞা ছিল তার ওপরে নতুন এক সংজ্ঞা দেওয়া হচ্ছে ব্রাহ্মাণ্যের: সর্বকামনাত্যাগী মননশীল, ভিক্ষাজীবী। অর্থাৎ, যে-সমাজব্যবস্থায় থেকে নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যে উৎপাদনকর্ম থেকে বিরত হয়, মননের গাম্ভীর্য রক্ষা করতে যে-পরান্নজীবী প্রব্রজ্যাশীল। এ প্রব্রজ্যা চতুরাশ্রমের ব্রহ্মচর্য নয়, গার্হস্থ্যও নয়, এ হল ওই বেদবিরোধী প্রস্থানগুলির তুল্য একটি জীবনযাত্রার আকল্প, যার দ্বারা ব্রাহ্মণ্য সংস্থার মধ্যেও নতুন ব্রহ্মবাদী, আত্মবাদীরও স্থান হয়। এই ভাবে নির্মিত হচ্ছে, বানপ্রস্থ ও ব্যতি আশ্রম। এবং একে গুরুত্ব দেওয়ার জন্যে বলা হচ্ছে সেই বিখ্যাত কথাটি ‘অত্যোহন্যদার্তম’–এর বাইরে সব কিছুই দুঃখের, কারণ তা ধ্বংসশীল।

এর পরে গার্গী প্রশ্ন করলেন। এর মানে এই ব্রহ্মোদ্যে জনকের দেওয়া স্বর্ণশৃঙ্গ গাভিগুলির প্রার্থিনী হয়ে তর্কে জয় করবার আশায় এই একটি ব্রহ্মবাদিনী নারীই উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন :

–এ সমস্তই যখন জলে ওতপ্রোত, তখন জলের আধার কী?

–বায়ু।

–তার?

—অন্তরিক্ষলোকসমূহ।

–তাদের?

–গন্ধর্বলোক, সেটি আদিত্যলোকে, সেটি চন্দ্রলোকে, সেটি নক্ষত্রলোকে, সেটি দেবালোকে, সেটি ইন্দ্রলোকে, সেটি প্রজাপতিলোকে, সেটি ব্রহ্মলোকে।

–সেটি?

যাজ্ঞবল্ক্যের অসহিষ্ণু উত্তর ‘যে দেবতা প্রশ্নের অতীত আপনি তাঁর সম্বন্ধে প্রশ্ন করছেন।’

আরও অনেকে যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করেছিলেন। কিন্তু একমাত্র গার্গীকেই যাজ্ঞবল্ক্য ধমকে বলেছিলেন, ‘তোমার মাথা খসে পড়বে। যদি আর বেশি প্রশ্ন করা’।(৪) সে কি গার্গী নারী বলে? যাজ্ঞবল্ক্যকে কোণঠাসা করেছিলেন বলে? না যে-দেবতা প্রশ্নের অতীত তার বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন বলে? কিন্তু গার্গীর শেষ প্রশ্নের উত্তর তো ব্রহ্মে গিয়ে ঠেকে এবং এটা তো ব্রহ্মিষ্ঠ নির্ণয়ের আয়োজন। তবে যাজ্ঞবল্ক্যের এই তিরস্কারের অর্থ কি এই যে, গার্গীকে তিনি ব্রহ্মবিষয়ে জ্ঞানের অধিকারিণী মনে করেননি? অথচ তাঁর স্ত্রী মৈত্রেয়ীও নারী, তাঁকে যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মজ্ঞান দিয়েছিলেন। যে-কারণেই হোক, অন্য কোনও জিজ্ঞাসুকেই যাজ্ঞবল্ক্য এ ভাবে ভর্ৎসনা করেননি, অথচ গার্গী ক্রমান্বয়ে আধারের আধার জানতে চাইছিলেন, প্রশ্নগুলি অর্বাচীনের মতোও ছিল না, অসংগতিও ছিল না। এ কথা নিশ্চিত করেই বলা যায় যে, সমাজের বহু তত্ত্বজিজ্ঞাসুর প্রশ্নই গার্গী করেছিলেন।

পরের প্রশ্নকর্তা উদ্দালক আরুণি। বললেন, ‘মদ্রে পতঞ্চল কাপ্যের বাড়িতে ভূতগ্রস্ত’(৫) তাঁর স্ত্রীকে প্রশ্ন করেন: কোন সূত্রে ইহজীবন, পরজীবন ও সর্বভূত সংগ্রথিত আছে?’ তিনি জানেন না বললেন। ‘যে অন্তর্যামী অভ্যন্তরে থেকে ইহজীবন, পরজীবন ও সর্বভুতকে নিয়মিত করেন?’ ‘না’ আরুণি পতঞ্চল কাপ্য ও শিষ্যদের বললেন, ‘যে এসব জানে সে ব্রহ্মা, ভূত, আত্মা এবং সবকিছুকেই জানে। যাজ্ঞবল্ক্য, সেই অন্তর্যামীকে না জেনে এই ব্রহ্মগবীগুলি যদি নিয়ে যান তো আপনার মাথা খসে পড়বে।’ যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, তিনি সবই জানেন। আরুণি বললেন, ‘জানি, জানি, সকলেই বলতে পারে, আপনি যেমন জানেন প্রকাশ করে বলুন।’ যাজ্ঞবল্ক্য একে একে বললেন:

‘যে দেবতা পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, দুলোক, আদিত্য, দিক, চন্দ্রতারকা, আকাশ, তমঃ, তেজ, সর্বভূত, প্রাণ, বাক, চক্ষু, শ্রোত্র, মন, বিজ্ঞান, রেতঃ-তে থাকেন। অথচ এরা যাকে জানে না। তিনিই অন্তর্যামী। অমৃত ও আপনার আত্মা। তিনি অদৃষ্ট হয়েও দ্রষ্টা, অশ্রুত শ্রোতা, মননের আবিষয় হয়েও মন্তা, অবিজ্ঞাত বিজ্ঞাতা, তিনি ভিন্ন দ্রষ্টা ইত্যাদি নেই। অন্তর্যামী ও অমৃত ইনিই আপনার আত্মা; এর বাইরে সবকিছুই বিধ্বংসী।’

এতে উদ্দালক আরুণি নীরব হলেন।

এর পরে গার্গী আবার প্রশ্ন করলেন। তার আগে সমবেত ব্রাহ্মণদের বললেন, আমি একে দুটি প্রশ্ন করব, সে-দুটি প্রশ্নের উত্তর যদি ইনি দিতে পারেন তা হলে ইনি আপনাদের কাছে অপ্রতিরোধ্য হবেন। অর্থাৎ ব্রহ্মিষ্ঠ বলে প্রমাণিত হবেন। প্রথম প্রশ্ন হল: যা দুর্লোকের ঊর্ধ্বে, পৃথিবীর নীচে, যা এ দুয়ের মধ্যবর্ত, যা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই যে সব কথা পণ্ডিতেরা বলে থাকেন তা কার মধ্যে ওতপ্রোত?’

উত্তর; ‘আকাশ’।

দ্বিতীয় প্রশ্ন: ‘আকাশ কীসে ওতপ্রোত?’

উত্তর: ব্রাহ্মজ্ঞরা এঁকে অক্ষর’ (= যার ক্ষরণ অর্থাৎ বিনাশ নেই) বলেন। তিনি স্কুল, অণু, হ্রস্ব, দীর্ঘ, লোহিত, স্নেহ, ছায়া, তমঃ, বায়ু, আকাশ, সঙ্গ, রস, গন্ধ নন, তার চক্ষু, শ্রোত্র, বাক, মন, তেজ, প্রাণ, মুখ, পরিমাণ, অবকাশ, বাহ্য কিছুই নেই। তিনি কাউকে ভক্ষণ করেন না, তাঁকে কেউ ভক্ষণ করে না। এই অক্ষরের শাসনে দ্যুলোক ভূলোক বিধৃত, তাঁরই শাসনে নিমেষ, মুহূর্ত, দিবারাত্র, পক্ষ, মাস, ঋতু ও সংবৎসর সকলই বিধৃত; শ্বেত পর্বতগুলি থেকে

নির্গত পূর্ব-পশ্চিম দিকে প্রবাহিত নদীগুলি নিজের নিজের পথে যাচ্ছে। এর শাসনে পণ্ডিতেরা দাতাদের প্রশংসা করেন, দেবতারা যজমানের অধীনে থাকেন ও পিতৃগণ তাঁদের উদ্দেশে প্রদত্ত দাবীর্হোমের ওপরে ভরসা করেন। এই অক্ষরকে না জেনে কেউ যদি বহু হাজার যজ্ঞ করে। তবুও সে বিনষ্ট হয়। যে এই অক্ষরকে না জেনে ইহলোক ছেড়ে যায় সে বড়ো দুর্ভাগ। যিনি এঁকে জেনে ইহলোক ত্যাগ করেন তিনি ব্রাহ্মণ।'

গার্গী অন্যান্য ব্রাহ্মণদের যাজ্ঞবল্ক্যকে নমস্কার করে চলে যেতে বললেন। (ছা, উ. ৩.৮.১-১২)

তার পর শাকল্যের প্রশ্ন:

–দেবতাদের সংখ্যা কত?

–তিনশো তিন হাজার তিন।

–দেবতারা ঠিক ক-জন?
–তেত্রিশ
–যাজ্ঞবল্ক্য, ঠিক ক-জন?
—ছয়।
–ভালো, দেবতারা আসলে ক-জন?
–'তিন' 'দুই' 'দেড়' 'এক'।
–সেই তিন হাজার তিনশো তিন জন কারা?
—যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, 'দেবতারা তেত্রিশ-অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, ইন্দ্র আর প্রজাপতি।' (ছা. উ. ৩:৯:১-২)

লক্ষণীয়, এটা প্রশ্নের যথার্থ উত্তর নয়। শাকল্যের আরও কিছু প্রশ্নের পর যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, 'শাকল্য, এই ব্রাহ্মণরা কি আপনাকে অঙ্গার দহনের যন্ত্রে পরিণত করেছেন?' (অর্থাৎ দহনের তাপ ভোগ করার জন্যই কি আপনি এঁদের মুখপাত্র?)। এতে ক্রুদ্ধ শাকল্য বললেন, 'কেমন আপনার ব্রহ্মজ্ঞান যে কুরু, পঞ্চাল দেশের এই ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধে আপনি অবজ্ঞা প্রকাশ করেন?' যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, 'আমি দেবতা ও দিকগুলিকে জানি।' আরও কিছু আলোচনার পর যাজ্ঞবল্ক্য শাকল্যকে প্রশ্ন করে বললেন, 'আপনি যদি এ প্রশ্নের উত্তর না। দিতে পারেন তো আপনার মাথা খসে পড়বে।' শাকল্য উত্তরটা জানতেন না, সত্যিই তার মাথা খসে পড়ল, ফলে অন্যরা আর কোনও প্রশ্ন করলেন না। তিনি ব্রাহ্মণদের প্রশ্ন করলে কেউ আর উত্তরও দিলেন না। তখন তিনি নিজেই কিছু তত্ত্বকথা বলে আলোচনা শেষ করলেন। (ছা, উ, ৩:৯:১৯-২৭)

এখানে একটি সুদীর্ঘ ব্রহ্মোদ্যের বিবরণ পেলাম, যার শুরুতে এমন বেশ-কিছু প্রশ্ন আছে যা তৎকালীন সমাজের চিন্তাশীল মানুষের মনে উদিত হত। বহিঃপ্রকৃতি, মানুষের বহিরিন্দ্রিয়, অন্তরিন্দ্রিয়, বিশ্বজাগতিক সত্তা, কাল ও কল্পিত কিছু কিছু লোক বা পৃথিবী, যা এতাবৎকাল শাস্ত্রে উল্লিখিত হয়ে মানুষের পরিচিত ছিল, সেগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক অর্থাৎ আধার ও আধেয়ত্ব নিয়ে মানুষের কিছু স্বাভাবিক প্রশ্ন এতে স্থান পেয়েছে। সহজেই লক্ষ করা যায় যে, সব উত্তরই উত্তর নয়, অনেক উত্তরকে বক্তা স্বেচ্ছায় আপাতদুর্বোধ্য করে রেখে পরে তার অন্য সমাধান দিচ্ছেন (যেমন দেবতাদের সংখ্যা)। অন্যত্র আধারা-আধেয়ত্ব নিয়েও কল্পিত, অপ্রমাণ্য উত্তরও দেওয়া হচ্ছে, পৃথিবীর বাইরে মহাকাশে কল্পিত ভুবন নির্মাণ করে, যার প্রত্যক্ষ বা বুদ্ধিগ্রাহ্য কোনও প্রমাণ নেই। এ ছাড়াও যা চোখে পড়ে তা হল, প্রেতগ্রস্ত ব্যক্তির উক্তি বিশ্বাস করে বা শ্রদ্ধাসহকারে গ্রহণ করে তা নিয়েও আলোচনা।

অর্থাৎ যুক্তির জগতে অনায়াসে অতিপ্রাকৃতের অনুপ্রবেশ ঘটছে, এতে ওই বড় বড় ব্রহ্মজ্ঞরা কেউ বিচলিতও হচ্ছেন না। অর্থাৎ সমস্ত আলোচনাটা যুক্তির স্তরেও ঘটছে না, ব্যঙ্গবিদ্রূপও আছে, অপমানবোধ এবং শাপিও আছে। একজন মাত্র নারী, ব্রহ্মবাদিনী গার্গীকে যাজ্ঞবল্ক্য অপমান করলেও কেউ কোনও প্রতিবাদ করেনি। এবং সমবেত ব্রহ্মবিদরা শেষ পর্যন্ত যাতে প্রশ্ন করা থেকে ক্ষান্ত হলেন তা কোনও জ্ঞানের উক্তি বা সদযুক্তি নয়, একটি অতিপ্রাকৃত ঘটনা: শাকল্য যাজ্ঞবল্ক্যের একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেননি বলে তাঁর মাথা খসে পড়ল। ওই প্রসঙ্গে লেখা আছে, 'চোরেরা অন্য বস্তু মনে করে তাঁর অস্থিগুলি অপহরণ করল।'(৬) এখানে অন্তর্নিহিত একটি অপমানও রয়েছে; মৃতব্যক্তির অন্ত্যেষ্টি হল না, অস্থিচয়ন হল না, চোরেরা অস্থি চুরি করে নিয়ে গেল। অর্থাৎ তৎকালীন বিশ্বাস অনুসারে শাকল্যের পারলৌকিক সদগতিও হল না। শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মাকে অক্ষর (~ = অবিনাশী)–দেহ-মন, মহাবিশ্ব, কাল ও সকল দেবতার উন্ধের্ব একটি সর্বোত্তম সত্তা–বলে প্রতিষ্ঠিত করা হল।

ঘোষণা বা আয়োজন করে অনুষ্ঠিত না হলেও ব্রহ্মোদ্য হতে পারত। সেখানে ব্রহ্মা-বিষয়ে আলোচনা বা বিতর্ক হত, কখনও-বা দুজনের মধ্যে। এবং, অন্যান্য ব্রহ্মবিদের মতও তার মধ্যে উপস্থাপিত হত। এই রকম একটি আলোচনার কথা বৃহদারণ্যক উপনিষদে পাই। বিদেহরাজ জনক রাজসভায় বসে আছেন, সেখানে যাজ্ঞবল্ক্য আসতে রাজা জিজ্ঞেস করলেন, 'কী মনে করে— পশুর জন্যে না সূক্ষ্ম (আত্মা)-বিষয়ে?'

–দুটোরই জন্যে।

—আপনার কোনও আচার্য আপনাকে যা বলেছেন, তা আমাকে বলুন।

–জিহ্ব শৈলিনি আমাকে বলেছেন, ‘বাকই ব্রহ্ম’।

–মাতৃমান পিতৃমান আচার্যবান মানুষের যেমন বলা উচিত শৈলিনি আপনাকে তেমনই বলেছেন, কিন্তু সেই ব্রহ্মের শরীর ও আশ্রয় কী তা কি বলেছেন?

–না।

–এ হল ব্রহ্মের একপাদ (এই এক চতুর্থাংশ)।

–আপনি আমাকে বলুন।

তখন যাজ্ঞবল্ক্য বাক, প্রজ্ঞা, চতুর্বেদ, ইতিহাসপুরাণ, বিদ্যা, রহস্যবিদ্যা, শ্লোক, সূত্র, ব্যাখ্য, যাগ, হোম, অন্নজল দানের ফল ইহপরজন্ম ও সমস্ত প্রাণীকেই যে বাক দ্বারা জানা যায়, সে-কথা বললেন। তখন রাজা জনক হাতির মতো বড়ো ষাঁড়-বলদসমেত এক হাজার গাভি যাজ্ঞবল্ক্যকে দান করলেন। যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, আমার পিতা বলতেন, ‘শিষ্য কৃতার্থনা হলে দান গ্রহণ কোরো না।’

তখন যাজ্ঞবল্ক্য আবার জানতে চাইলেন কোনও আচার্য জনককে কী বলেছেন। জনক বললেন, উদঙ্ক শৌম্বায়ন তাকে বলেছেন, ‘প্রাণই ব্রহ্ম’।

উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য আগের মতোই বললেন, ভাল, ‘আচার্যের যা বলা উচিত ইনি তা-ই বলেছেন, কিন্তু প্রাণব্রহ্মের শরীর ও আশ্রয় সম্বন্ধে কিছু বলেছেন কি?’

–না, আপনি বলুন।

–প্রাণই শরীর, আকাশ প্রতিষ্ঠা, এঁকে প্রিয় বলে উপাসনা করা উচিত।

–যাজ্ঞবল্ক্য, প্রিয়তা কাকে বলে?

–সম্রাট, প্রাণরক্ষার জন্যে যজ্ঞে অনধিকারীও যজ্ঞ করে। যার দান গ্রহণ করা উচিত নয়, তার দানও লোকে প্রাণরক্ষার জন্যে গ্রহণ করে। লোকে এমন দিকেও যায় যেখানে প্রাণহানির আশঙ্কা আছে। এমন জেনে যে এই ব্রহ্মাকে উপাসনা করে প্রাণ তাকে ত্যাগ করে। না, সকল প্রাণী তাঁর বশীভূত হয়, তিনি দেবতা হয়ে দেবলোকে যান।

রাজা আবার ওই রকম পুরস্কার দিলেন।

পরের বার প্রশ্নের উত্তরে জনক বললেন। বর্কু বার্ষু তাঁকে বলেছেন, 'চক্ষুই ব্রহ্ম'।

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, 'চক্ষু ইন্দ্রিয়টিই সত্য, কারণ যে স্বচক্ষে দেখেছে তার অভিজ্ঞতা মানুষ স্বীকার করে... তিনি দেবলোক লাভ করে।'

জনকও পূর্বের মতো পুরস্কার দিলেন। পরের আচার্যের নাম গর্দভীবিপীত ভরদ্বাজ, তিনি বলেছিলেন, 'শ্রোত্রই ব্রহ্ম'।

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, 'শ্রবণেন্দ্রিয় শরীর, তার প্রতিষ্ঠা আকাশে, একে অনন্ত বলে উপাসনা করা উচিত।

'অনন্ত কী'–এ প্রশ্নের উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, 'দিকসমূহই অনন্ত। যে এমন জানে সে দেবালোক পায়।'

আবার সেই পুরস্কার।

পরবর্তী আচার্যসত্যকাম জাবাল, তাঁর শিক্ষা: মনই ব্রহ্মা। একে আনন্দ বলে উপাসনা করা উচিত। যিনি করেন তিনি দেবালোক লাভ করেন। শেষ আচার্য বিদগ্ধ শাকল্য। তিনি বলেছিলেন, 'হৃদয়ই ব্রহ্মা। হৃদয়ই স্থিতি, এখানেই সমস্ত প্রাণী আশ্রিত।' প্রতিবারই আলাপের পরে যাজ্ঞবল্ক্য পূর্বের মতো পুরস্কার পেলেন। যাজ্ঞবল্ক্য বলেছিলেন, তাঁর পিতার শিক্ষা হল, শিষ্য চরিতার্থ না হলে তার দান গ্রহণ করা উচিত নয়; কিন্তু প্রত্যেক বারই তিনি ওই দান গ্রহণ করেছিলেন।

এখানে লক্ষ্য করি, জনক ও যাজ্ঞবল্ক্যের আলোচনায় পরোক্ষ থেকে অনুপ্রবেশ করছেন ছ-জন ব্রহ্মবিৎ পণ্ডিত, কাজেই এঁদের দুজনের সংলাপে বস্তুত আট জনের উপস্থিতি আছে, যদিও সিদ্ধান্ত ছ-টিই: বাক, প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র, মন এবং হৃদয়–এগুলি ব্রহ্মস্বরূপ। এর মধ্যে বাকু, চক্ষু, শ্রোত্র হল ইন্দ্রিয় (বা ইন্দ্রিয়কর্ম, যেমন বাক); প্রাণ, মন ও হৃদয় শরীরের অভ্যন্তরে অদৃশ্য ক্রিয়াশীল তত্ত্ব। এগুলিকে ব্রহ্মস্বরূপ বলে প্রতিপন্ন করলেও ব্রহ্ম সম্বন্ধে জ্ঞান বিশেষ-কিছু এগোয় না।

প্রাণের প্রসঙ্গে বাস্তববুদ্ধির একটা সুন্দর নির্দেশ দেখি প্রাণরক্ষার জন্য সমাজে মানুষের গর্হিত আচরণও করার মধ্যে, এতে প্রাণের আপেক্ষিক গুরুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পড়বার সময়ে অবশ্য প্রত্যেকটি তত্ত্বই তখনকার মতো সর্বাধিক গুরুত্ব পায়। শুরুতে শুনি, যাজ্ঞবল্ক্য জনকের প্রশ্নের উত্তরে বলছেন, তিনি ব্রহ্মের আলোচনা ও পশু দুটোই কামনা করে রাজার কাছে উপস্থিত হয়েছেন। কার্যত তিনি প্রচুর মহার্ঘ। দক্ষিণা নিয়ে গেলেন ব্রহ্মসংক্রান্ত আলোচনার বিনিময়ে। যে তত্ত্বগুলি তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন তা উপনিষদে অন্যত্রও বিশেষ তাৎপর্য পেয়েছে; ব্যাখ্যার ভঙ্গি পৃথক হলেও

বিষয়বস্তু অপরিচিত নয়। এ ব্রহ্মোদ্য কতকটা পরোক্ষ ভাবে অনুষ্ঠিত হল: অনুপস্থিত আচার্যদের মত পাওয়া গেল জনকের মুখে, তার সমালোচনা ও সম্পূরণ ঘটল। যাজ্ঞবল্ক্যের দ্বারা। এখানে পাওয়া যাচ্ছে সমাজের মানুষের নানা প্রশ্ন ও সংশয়: শুধু ব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে নয়–বহির্বিশ্ব, মানবদেহ ও মন, কাল ও মরণোত্তর অবস্থা, স্বর্গ ছাড়াও নানা 'লোক' সম্বন্ধে, এবং এগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে। প্রশ্ন, সংশয় ও আলোচনা যজ্ঞকে পুরোপুরি বর্জন করেনি, বরং ব্রহ্মবিদরা সেগুলির প্রতীকী অর্থ করছেন অধ্যাত্মতত্ত্ব দিয়ে।

আর এক বার রাজা জনক স্বয়ং যাজ্ঞবল্ক্যের কাছে গিয়ে নমস্কার করে উপদেশ প্রার্থনা করলেন।

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, 'আপনি বেদ ও উপনিষদ জানেন, কিন্তু এই দেহ থেকে মুক্ত হয়ে কোথায় যাবেন তা জানেন কি?'

'না, আপনি বলুন।'

'দক্ষিণ চক্ষুতে অবস্থিত পুরুষের 'ইন্ধ', পরোক্ষে 'ইন্দ্র' কারণ দেবতারা পরোক্ষপ্রিয় প্রত্যক্ষবিরোধী।' বাম চক্ষে এর স্ত্রী বিরাজ থাকেন, দু-নেত্রের মধ্যবর্তীর্ণ স্থলে এদের মিলনক্ষেত্র।' এটা মনে করা কঠিন যে, মানুষের মনে এ নিয়ে প্রশ্ন ছিল যে দক্ষিণ ও বাম চক্ষুতে কাঁরা অবস্থান করেন। এ আলোচনার শেষ হয় দিকসকল ও প্রাণ দিয়ে, এবং র্যাকে 'নেতি নেতি' বলা হয়েছে, তিনিই এই আত্মা। একে কেউ গ্রহণ করতে পারে না, ইনি অক্ষয়, অসঙ্গ, আবদ্ধ; ইনি কখনও বিনষ্ট হন না। 'জনক, আপনি অভয় লাভ করুন'। জনকও যাজ্ঞবল্ক্যকে অভয় দান করলেন এবং সঙ্গে বিদেহ রাজ্য এবং নিজেকেও জনকের কাছে সমর্পণ করলেন। এখানে লক্ষ্য করি যে, বাম ও দক্ষিণ নোত্রের অধিষ্ঠাতা পুরুষ ও তাঁর পত্নী দিয়ে আলোচনা শুরু। জনক এই প্রসঙ্গই

তোলেননি। মানবদেহ ও বিশ্বজগতের কিছু তত্ত্ব ব্যাখ্যা করার পর আত্মার স্বরূপ ব্যাখ্যা করা হচ্ছে 'নেতি নেতি' বলে, অর্থাৎ আত্মা কী কী নয় তা জেনে পরিশেষ্যাৎ অর্থাৎ নেতি নেতি সংজ্ঞার পরে যা বাকি থাকে তাকেই আত্মা বলে অভিহিত করা হল। তার লক্ষণ কিছু কিছু উল্লেখ করে বলা হল, এবং এতেই জনক অভয় লাভ করলেন; অভয়ের বিনিময়ে যাজ্ঞবল্ক্য বিদেহ রাজ্য লাভ করলেন, কিন্তু 'মরণের পর মানুষ কোথায় যায়' যে-প্রশ্ন দিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছিল তার কোনও উত্তর পাওয়া গেল না; অথচ এটি তখনকার এবং সর্বকালের মানুষের মনে একটি তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসা। এমন কথাও বলা হয়নি যে, মৃত্যুর পরে মানুষ ব্রহ্মে বিলীন হয় বা ব্রহ্মা লাভ করে। বলা হল, ব্রহ্মকে জানলে মানুষ অভয় লাভ করে; কোন ভয় থেকে অভয়? মৃত্যুভয়? তা-ও বলা হয়নি। এ সব অনুত্তরিত রয়েই গেল।

আরও এক বার যাজ্ঞবল্ক্য জনকের কাছে মনে মনে এই সংকল্প করে গেলেন যে কোনও কথাই জনককে বলবেন না। কিন্তু মনে পড়ল একবার অগ্নিহোত্র সম্বন্ধে আলোচনার পরে যখন যাজ্ঞবল্ক্য তাঁকে বর দিতে চান তখন তিনি তাঁকে যথেচ্ছভাবে প্রশ্ন করার (কামপ্রশ্নতা) বর দিয়েছিলেন।

এবার জনক তাঁকে প্রশ্ন করলেন, 'কোন জ্যোতিতে মানুষ আলোক পায়?'

–সূর্যের জ্যোতিতেই মানুষ বাইরে যায়, কাজ করে এবং ফিরে আসে।

—তাই বটে। কিন্তু সূর্য যখন অস্ত যায়?

—চন্দ্র।

-চন্দ্র অস্ত গেলে?

–অগ্নি।

–অগ্নি নির্বাপিত হলে?

–বাক।

—আর সূর্য চন্দ্র যখন অস্ত গেছে, অগ্নি নির্বাপিত, বাক সংরুদ্ধ, তখন কোন জ্যোতি থাকে মানুষের?

–আত্মাই তার জ্যোতি হয়, আত্মার জ্যোতির দ্বারাই সে বসে, কাজ করে ফিরে আসে।'(৮)

এখানে যে-প্রশ্নগুলি উত্থাপিত হয়েছে সেগুলি তখনকার মানুষের মনে স্বভাবতই উদিত হতে পারে, এবং সর্বশেষ যে-উত্তরটি, সেটির আধ্যাত্মিক যথার্থতা যতটুকু আছে, নৈতিক বা চারিত্রিক তাৎপর্যও ততটাই। বাইরের সব রকম আলো এবং নিজের বাকশক্তি যখন মানুষকে ছেড়ে যায়, তখন মানুষ আপন অন্তরের শক্তিতেই শক্তিমান। যে যুগে মানুষ স্তিমিত প্রদীপের আলোতে কাজ করত। সে যুগে প্রকৃতির আলোর অন্তর্ধন তো নানা প্রশ্নের উদ্রেক করতেই পারে। এখানে পরম্পরাক্রমে উত্তরগুলি দেওয়া হয়েছে এবং মানুষ আত্মদীপ হওয়ার প্রেরণা পাছে শেষ উত্তরটিতে।

মৃত্যুর পরে মানুষের কী গতি হয়–এ নিয়ে মানুষ তো একান্ত ভাবে বিচলিত ছিল, তাই ওই বিষয়ে আরও একটি কাহিনির অবতারণা করা হয়েছে বৃহদারণ্যকে। রাজা প্রবাহণ জৈবলির সভায় উপস্থিত আরুণির পুত্র শ্বেতকেতু। জৈবলি ব্রহ্মবিদ, ব্রহ্মচর্যের অন্তে শ্বেতকেতু এসেছেন ও বলছেন,

তিনি পিতার কাছে শিক্ষা পেয়েছেন। তখন জৈবলি জিজ্ঞাসা করলেন, মৃত্যুর পরে মানুষ বিভিন্ন পথে যায়, তা জান?'

-না।

—কেমন করে তারা আবার ফিরে আসে, জান?'

–না।

–পরলোকে এত আত্মার সমাগম তবু তা কেন পূর্ণ হয় না?

–না।

-পিতৃযান ও দেবযানের পার্থক্য এবং কোন কর্মে সেগুলি পাওয়া যায় জান?

–না।

রাজা তাকে সেখানে বাস করতে আমন্ত্রণ জানালেও ক্রুদ্ধ কুমার বাড়ি গেল ও পিতাকে অনুযোগ জানাল অসম্পূর্ণ শিক্ষা দেওয়ার জন্যে, কারণ সে জৈবলির পাঁচটি প্রশ্নের কোনওটিরই উত্তর দিতে পারেনি। এ কাহিনিটি ছন্দোগ্য উপনিষদেও (৫:৩-১০) বিবৃত আছে, মোটের ওপরে একই ভাষায়। সমাধানও প্রায় একই ভাষায়: শ্বেতকেতুর পিতা গৌতমকে জৈবলি বলেন, 'পূর্বে এ বিদ্যা কখনও ব্রাহ্মাণে বাস করেনি, তবু আমি আপনাকে বলব, কারণ আপনি স্মরণ করিয়ে দিলেন যে আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দেব এমন অঙ্গীকার করেছি।' এবারে তিনি পিতৃযান ও দেবযান ব্যাখ্যার প্রসঙ্গে বিস্তৃততর তত্ত্বপূর্ণ উপদেশ দিলেন। এর কোনও অংশই প্রমাণসহ নয়, এতে বহু সমীকরণ আছে যজ্ঞীয় অনুষ্ঠান ও উপাদানের সঙ্গে বহির্বিশ্বের তত্ত্বের, যা

সবটাই হয় আপ্তবাক্য বলে গ্রহণ করতে হবে অথবা অপ্রমাণিত, অপ্রামাণ্য বলে বর্জন করতে হবে।

এমন বহু আখ্যানে দেখতে পাচ্ছি, প্রশ্নগুলি স্বভাবতই মানুষের মনে উঠতে পারে এবং সে দিক থেকে তখনকার পরিপ্রেক্ষিতে–এবং অনেকগুলি এখনকার পরিপ্রেক্ষিতেওপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উত্তরগুলি প্রশ্ন থেকে সরে গিয়ে অন্য অন্য তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করছে। এ যুগে জ্ঞানকাণ্ডের পক্ষে আনুষঙ্গিক তত্ত্ব হিসাবে সে-উত্তরগুলির হয়তো প্রাসঙ্গিকতা বা তাৎপর্য আছে, কিন্তু প্রশ্নের উত্তর হিসেবে একেবারেই অচল। এর একটা কারণ হল, প্রশ্নগুলির উত্তর ব্রহ্মবিদদের জানা ছিল না। জানা থাকা সম্ভবও ছিল না, কারণ তেমন বহু প্রশ্নের উত্তর মানুষ এখনও খুঁজে পায়নি। তা হলে তখন যে সব প্রশ্ন আছে, সে সব প্রশ্নের যা যথার্থ উত্তর নয় তেমন উত্তর এগুলির সঙ্গে উত্তররূপে জুড়ে দেওয়া হল কেন? সম্ভবত, জিজ্ঞাসু যখন প্রশ্ন করেছে তখন কোনও না কোনও উত্তর তার প্রাপ্য, এমন কথাই মনে করতেন ব্রহ্মবিদরা। এবং, যথার্থ উত্তর যখন জানা নেই, তখন সে চেষ্টা না করে এই নতুন চিন্তাধারার আবহে যে সব তত্ত্ব নতুন করে তাৎপর্যপাচ্ছে, যেমন আত্মা, ব্রহ্ম, পরলোক, পুনর্জন্ম, পিতৃযান, দেবযান, যজ্ঞের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা, ইত্যাদি প্রসঙ্গ হিসেবে ধরে নিচ্ছেন প্রশ্নগুলিকে। কেননা, কোনও জিজ্ঞাসু সরাসরি ওই সব বিষয়ে প্রশ্ন করছেন না, অথচ ওই বিষয়গুলি নতুন জ্ঞানকাণ্ডের গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব, বিশেষত যজ্ঞের উপাদান ও প্রণালীর রূপক ব্যাখ্যা। বহু নির্ম্মফল যজ্ঞানুষ্ঠানের পরে বহু মানুষ যখন যজ্ঞের উপযোগিতা নিয়ে ভেতরে ভেতরে ভীষণ সন্দিহান, যজ্ঞবিমুখ বহু সম্প্রদায় যখন সমাজে রয়েছে ও সংখ্যায় এবং সম্মানে বাড়ছে তখন যজ্ঞের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ছাড়া তাকে সমর্থন করা তো অসম্ভব হয়ে উঠেছে।

———————

(১) Ceci n’a rien de bien suprenant si l’on songe que les grande monasteries aver leur salle d’étude et de réunion etc offraient des conditions plus favorables all development rapide d’une pratique philosophiüque fondée sur la discussion publique d’une part, le commentaire oral ou écrit d’auter part.’– Michel Hulins p 40

(২) নমো বিয়ং ব্রহ্মিষ্ঠায় কুর্মে গোকামা এব ব্যয়ম স্ম। (ছা, উ. ৩:১:২)

(৩) যদিদং সর্বং মৃত্যোরল্লংক স্থিৎসা দেবতা যস্যা মৃত্যুরত্রন্নমিত্যাগ্নির্বৈ মৃত্যুঃ সোহপান্নমপ পুনর্ম্মত্যুং জয়তি। (ছা. উ. ৩.২.১০)

(৪) গার্গি মাহতিপ্রাক্ষীর্ম তে ব্যপপ্তদনীতিপ্রশ্নয়াং বৈ দেবতামতিপুচ্ছসি, গার্গি, মাহতিপ্রাক্ষীরিতি ততো হি গার্গ বাচক্রবুযাপাররাম।। (ছা. উ. ৩.৮:১)

(৫) গন্ধর্বগৃহীত এই উপনিষদের ৩:৩ অংশে ইনি পতঞ্চলেব দুহিতা, কাহিনি সেখানেও একই।

(৬) পরিমোষিণ্যোহহীন্যপজহুরন্যান্মান্যমানাঃ।। (ছা, উ, ৩:৯:২৬)

(৭) ইন্ধো হি বৈ নামৈষ যোহয়ং দক্ষিণেহক্ষন পুরুষত্তং বা এতমিম্বন্ধং সন্তমিন্দ্র ইত্যাচক্ষতে পরোক্ষেশৈব পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ প্রত্যক্ষদ্বযঃ। (বৃ, উ, ৪:২:২)

(৮) অস্তমিত আদিত্যে যাজ্ঞবল্ক্য চন্দ্রমস্যাস্তমিতে শান্ত্যেগ্নৌ শান্তায়াং বাচি কিং জ্যোতিরোবায়ং পুরুষ ইত্যাত্মৈবাস্য জ্যোতির্ভবতীত্যাত্মিনৈবায়ং জ্যোতিষাস্তে পলায়াতে কর্মকুরুতে বিপল্যেতীতি। (বৃ. উ. ৪:৩:৬)

নচিকেতার প্রশ্ন

যজ্ঞের নিষ্ফলতা নিয়ে মানুষের মনে প্রশ্ন যে স্পষ্ট হচ্ছিল তার বড় একটি প্রমাণ আছে মুণ্ডক উপনিষদে। এখানে বলা হয়েছে, যজ্ঞ হল অদৃঢ় নৌকো, অর্থাৎ গন্তব্যে পৌঁছে দিতে পারে না ওই 'অদৃঢ় (তলাফুটো?) যজ্ঞরূপ নৌকোগুলো–প্লবা হোতা অদৃঢ় যজ্ঞরূপঃ।'(১:২:৭) সোজা কথায়, যজ্ঞে আর অভীষ্ট ফল পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা দেখেছি, এর ফলে একদিকে যেমন বেদবিরোধী বেশ-কিছু প্রস্থানের উদ্ভব হল, অন্য দিকে তেমনই ব্রাহ্মণ্যধর্মের মধ্যেও লক্ষ্যণীয় কিছু পরিবর্তন এল। এর পটভূমিকা ক্রমবর্ধমান সংশয়, সমাজের এক বড় অংশে যজ্ঞ সম্বন্ধে দোলাচলতা। এই পটভূমিকায় যজ্ঞ সম্বন্ধে পূর্বের মতো বিশ্বাসও যেমন আর নেই, পূর্বের মতো নিষ্ঠার সঙ্গে যজ্ঞ সম্পাদন করাও তেমনই কমে আসছে।

এমনই এক অবস্থার রচনা কৃষ্ণ যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় শাখার অন্তর্গত কঠোপনিষদ, যজুর্বেদ যজ্ঞ-অনুষ্ঠান সম্বন্ধে নির্দেশ দেয় অধ্বর্যুকে, যিনি হাতেকলমে যজ্ঞ করেন। অর্থাৎ এর সঙ্গে মন্ত্র আবৃত্তি বা গানের তত যোগ নেই। যতটা আছে যজ্ঞকর্ম বা যজ্ঞ সম্পাদনের। কঠোপনিষদ একটি বৃহৎ ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপনিষদ–বৃহদারণ্যক ও ছন্দোগ্যের পরে এটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এর শুরু হচ্ছে বাজশ্রবার পুত্র-যজ্ঞফল কামনা করে সমস্ত সম্পত্তি

দক্ষিণায় দান করার মধ্য দিয়ে (সম্ভবত এটি বিশ্বজিৎ যজ্ঞ, যার দক্ষিণা হল যজমানের সমস্ত ধন)। তাঁর নচিকেতা নামের এক ছেলে ছিল।(১) যখন দক্ষিণাগুলো নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন কুমার নচিকেতার মনে শ্রদ্ধা' উদিত হল। তাঁর মনে হল, 'যেসব গাভি জীবনে শেষবার জলপান করেছে, তৃণভক্ষণ করেছে, দুধ দিয়েছে, যাদের আর বাছুর জন্মাবে না, এমন সব গাভিদের যে-যজমান দান করেন তিনি তো তেমন লোকে যান। যেটি দুঃখময়।'(২)

এখানে কয়েকটি কথা লক্ষ্য করবার মতো। যজমান যে-যজ্ঞে গাভিগুলি দান করছেন। সে-যজ্ঞের শাস্ত্রীয় দক্ষিণা হল, যজমানের তাবৎ সম্পত্তি। কুমার নচিকেতা দেখলেন, এই গাভিগুলি বৃদ্ধা এবং আসন্নমরণা, এরা আর কোনও দিন ঘাস খাবে না, জল খাবে না। এদের কাছ থেকে আর কোনও দিন দুধ বা গোবৎস পাওয়া যাবে না। অর্থাৎ এগুলি, আজকের ভাষায়, ভাগাড়ে যাওয়ার মতো গাভি। বাজশ্রবার যজমানের সংসারে এগুলি খরচের খাতায়, যা দেওয়ার এরা শেষ পর্যন্ত দিয়েছে, এখন গোহত্যা না করে সম্পূর্ণ নিরর্থক এই জীবগুলিকে আমরণ খোরাক জোগাতে হবে। অতএব তৃতীয় যে-রাস্তাটি যজ্ঞ করে দিয়েছে তা হল, এদের দক্ষিণা হিসেবে কোনও ঋত্বিক পুরোহিতকে দান করা। এতে গ্রহীতা ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের সম্বন্ধে বাজশ্রবসের প্রগাঢ় অবজ্ঞা সূচিত হচ্ছে! এমন দক্ষিণা যার বাবাসার বেঁধে দাঁড় করিয়ে রেখেছে, সেই কুমার নচিকেতার এ সব দেখে একটা বিশ্বাস জন্মাল। মনে রাখতে হবে, শ্রদ্ধার মূল অর্থ বিশ্বাস (ইন্দো-ইউরোপীয় ধাতু c + δ থেকে সংস্কৃতে শ্রদ্ধা এসেছে। কেল্তুম গোষ্ঠীর ভাষায় আমরা ল্যাটিনে ও ইংরেজিতে পাই credo, credit, credible অর্থাৎ এর মূল অর্থ বিশ্বাস)। নচিকেতার মনে একটা বিশ্বাসের উদয় হল। কী সেইবিশ্বাস? এমন হাড়-জিরজিরে মুমুধু গাভিগুলি দক্ষিণায় দিলে তো শাস্ত্র-অনুসারে বাজশ্রবসের অক্ষয় নরকপ্রাপ্তি হবে, এ কী করছেন তিনি? তাই পিতাকে প্রশ্ন করলেন, 'বাবা আমাকে কাকে দান

করবেন?' (এক বার) দু'বার, তিন বার। তখন তাকে (বাজশ্রাবস) বললেন, 'মৃত্যুকে দেব তোকে।'(৩)

এখানে লক্ষ্যণীয় নচিকেতার বর্ণনা 'কুমারং সন্তং' মানে কুমার থাকতেই, অর্থাৎ নচিকেতা অপ্রাপ্তযৌবন কিশোর। তার সম্ভবত মনে হয়েছে এতগুলি বৃদ্ধা গাভি দান করলে পিতার অক্ষয় নরকবাস হবে। একটি তরুণ কিশোরকে সঙ্গে দিলে হয়তো সে-শাস্তি খানিকটা কমতে পারে। স্বভাবতই এ প্রশ্নে পিতা বিব্রত, বিরক্ত, কারণ ছেলের কাছে যজ্ঞের দক্ষিণার ফাকিটা ধরা পড় গেছে; আরও বিরক্তির কারণ হল, যে-যজ্ঞের দক্ষিণা হল যথাসর্বস্ব, তারই দক্ষিণায় সাজানো ওই মুমূর্ষু গাভিগুলি। রাগের কারণ হল, কিশোর বালক যদি এটা ধরে ফেলে থাকে, তা হলে তো সকলেই ধরতে পারবে। ছেলে প্রশ্ন করছে, 'আমাকে কাকে দান করবে'—বলা বাহুল্য, বাজশ্রবসের কোনও অভিপ্রায়ই ছিল না, নচিকেতাকে কাউকে দান করার। কিন্তু নাছোড়বান্দা ছেলে এক বার, দুবার, তিন বার প্রশ্ন করতে বাপের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল, বললেন, 'তোকে দান করব মৃত্যুকে।' আজকের ভাষায়: 'তুই যমের বাড়ি যা।' এবং ছেলে সেই মানেই বুঝল, তবে যাওয়ার আগে সে বাপকে প্রশ্ন করল, 'আমি অনেকের মধ্যে প্রথম, আবার অনেকের মধ্যে মধ্যম (অর্থাৎ একেবারে অধম আমি নই)। যমের এমন কী কাজ আছে যা আমাকে দিয়ে সিদ্ধ হবে?'(৪) পরে যা বললেন তার অর্থ 'পূর্বপুরুষ এবং বর্তমানের মানুষদের দেখে (জানা যায়) যে-মানুষ শস্যের মতো, পক্ক হয়ে বিনষ্ট হয়। আবার শস্যেরই মতো পুনর্বার জন্মগ্রহণ করে।'(৫) এ কথার অন্তরালে নচিকেতা পিতাকে বলতে চায়, মৃত্যুতে যেহেতু শেষ পরিসমাপ্তি নয়, পুনর্জন্ম আছে, তাই যম আমাকে গ্রহণ করলেও, অর্থাৎ আমি মরলেও আবার জন্মাব। সুতরাং আপনি যখন বলে ফেলেছেন আমাকে মৃত্যুর কাছে সমর্পণ করবেন, তখন সে-কথাটা রাখুন, আমাকে মৃত্যুর কাছে যেতে দিন।

নচিকেতা যমের বাড়ি গেল। যম বাড়ি ছিল না, তাই নচিকেতা তিন দিন যমের বাড়ির আতিথ্য গ্রহণ করল না। যম ফিরলে বাড়ির লোকেরা বলল, ব্রাহ্মণ অতিথি স্বয়ং অগ্নির মতো গৃহে প্রবেশ করেন, লোকে তাঁর শান্তিবিধান করে, (অতএব) হে বৈবস্বত যম, (গৃহস্বামী হিসাবে) তাঁকে পাদোদক দাও।'(৬) ব্রাহ্মণ যার বাড়িতে অনাহারী হয়ে থাকে, আকাঙ্ক্ষিত ও প্রাপ্ত বস্তু, সৎসঙ্গের সুফল, ইষ্টপূর্ত, পুত্রপশু সেই অল্পবুদ্ধি মানুষের সবই ধ্বংস হয়ে যায়।'(৭) তখন যম নচিকেতাকে (পাদোদক অর্ঘ্য আসন দিয়ে) বললেন, 'যেহেতু তুমি তিনরাত্রি আমার বাড়িতে অনাহারী হয়ে থেকেছ, আমার নমস্য অতিথি হয়েও, তাই তোমাকে আমি নমস্কার করছি, হে ব্রাহ্মণ, আমার কুশল হোক, তুমি তিনটি বর চাও।'(৮) প্রথম বরে নচিকেতা চাইল, তার পিতা যেন ক্রুদ্ধ না থাকেন তার প্রতি, সদয় ও প্রসন্ন হন, যমের কাছ থেকে ফিরে গেলে যেন ভাল ভাবে সম্ভাষণ করেন। যম বর দিলেন, উদ্যালকের পুত্র বাজশ্রীবা। তোমাকে দেখে আগেকার মতোই স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করবেন, ক্রোধ ভুলে যাবেন, দীর্ঘকাল সুখে থাকবেন। দ্বিতীয় বরে নচিকেতা চাইলেন, 'স্বর্গে কোনও ভয় নেই, আপনি (অর্থাৎ মৃত্যু) সেখানে নেই, জরার আশঙ্কাও নেই। মানুষ ক্ষুধা ও তৃষ্ণা দুটিকেই অতিক্রম করে শোক পার হয়ে সেখানে বাস করে। যম, স্বর্গকামী মানুষ যে-অগ্নিবিদ্যার সাহায্যে অমরতা। পায় তা আপনিই জানেন, শ্রদ্ধান্বিত হয়ে আমি এসেছি। এ বিষয়ে আপনি আমাকে বলুন, এটিই আমার দ্বিতীয় বার।'(৯) যম দ্বিতীয় এ বর দিতে রাজি হলেন, বললেন, 'তোমাকে ভালো করে বলছি, শোনো, নচিকেতা, অগ্নিকে জেনে স্বর্গলাভ করা যায়। স্বর্গলাভ প্রাপ্তির ও (সেখানে) প্রতিষ্ঠার উপায় এই অগ্নির তত্ত্ব গুহাতে নিহিত বলে জেনো।'(১০)

দ্বিতীয় বরে নচিকেতা জানতে চাইল কোন সেই আপাতগুঢ় অগ্নিবিদ্যা (= যজ্ঞাগ্নির স্বরূপ), যা জানলে তার সাহায্যে মানুষ স্বর্গে যেতে পারে এবং

সেখানে থাকতে পারে, অর্থাৎ কোন অগ্নিবিদ্যার জ্ঞানে অক্ষয় স্বর্গবাস অর্জন করা যায়। স্বগে হয়তো জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞ করে যাওয়া যায়, কিন্তু তখনকার সমাজে সকলে পুনর্জন্মেবিশ্বাস করে, কাজেই অল্পকাল স্বর্গেবাস করে আবার তো মর্তে ফিরে আসতে হতে পারে। নচিকেতার প্রশ্ন স্বর্গ দিয়ে জন্মান্তার এড়ানো, কী সেই অগ্নিবিদ্যা যা আয়ত্ত করলে স্বর্গ থেকে আবার মর্তে এসে জন্মাতে হয় না। বলা বাহুল্য, এ প্রশ্ন শুধু নচিকেতার নয়, সে-যুগের বহু মানুষের তীব্র বাসনার উচ্চারণ এটি। মর্তলোকে জীবনে নানা দুঃখকষ্ট, অভাব-অভিযোগ-অত্যাচার-নির্যাতন। জন্মান্তরের ফলে মর্তে এলে এই তো ভাগ্য। পুনর্জন্ম মানে এই সবই, অন্তিমে পুনর্ম্মত্যু এবং আবার এ সবের পুনরাবর্তন। একমাত্র প্রতিকার হল অক্ষয় স্বর্গবাস; তাতে পুনর্জন্ম ও পুনর্ম্মত্যু থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়, অতএব, এর মধ্যে দিয়েই বারংবার দুঃখময় জীবনের পুনরাবৃত্তি থেকে মুক্তি এবং অন্তহীন সুখের সম্ভাবনা। যমের অপরাধবোধ ছিল। ব্রাহ্মণ তাঁর বাড়িতে ত্রিরাত্রি উপবাস করেছে, কাজেই নচিকেতার প্রার্থিত বর দিতে রাজি হলেন। সেই সৃষ্টির আদিম অগ্নির কথা তাকে বললেন, বেদিনির্মাণ করতে যতগুলি যে রকম ইষ্টক লাগে তা সবই বললেন। কীভাবে (সে-যজ্ঞে) অগ্নিচয়ন করতে হয়, প্রীত হয়ে দু'বার করে নচিকেতাকে সব বললেন। নচিকেতা তা গ্রহণ করলে যম আরও বললেন, তোমার প্রতি প্রীত হয়ে তোমাকে এবার চতুর্থ একটি বর দিচ্ছি: 'এই অগ্নিটি তোমারই নামে (অর্থাৎ 'নচিকেত অগ্নি' বলে) খ্যাত হবে। তুমি এই ঝংকারিণী বহুরত্নখচিত মালাটিও নাও।'(১১) এখানে লক্ষ্য করি, নচিকেতা বহু মানুষের মুখপাত্র হিসাবে জরামৃত্যু দুঃখযন্ত্রণা থেকে চিরকালীন মুক্তির পথটি জানতে চাইছে দ্বিতীয় বরে–জন্মস্তরে বিশ্বাসের যুগে এটি শ্রেষ্ঠ, সবচেয়ে স্থায়ী আনন্দের জন্য প্রার্থনা। এটি কিন্তু নচিকেতার প্রাপ্য দ্বিতীয় বার, এখানে নচিকেতা খুব যুক্তিযুক্ত একটি প্রার্থনা করে এবং যম তা দিতে স্বীকার করেন: এর জন্যে যমের বিশেষ ভাবে প্রীত হওয়ার কিছু ছিল না। তবু যম খুশি হয়ে

আরও দুটি পুরস্কার বা উপহার দিলেন: ওই স্বর্গের অগ্নিবিদ্যা নাচিকেত অগ্নি' নামে অভিহিত হবে এবং তারই সঙ্গে একটি বহুমূল্য মালাও দিলেন, নচিকেতা সেগুলি গ্রহণ করল। পরবর্তী দুটি শ্লোকে যম বললেন, 'মাতা, পিতা ও আচার্যের উপদেশ পেয়ে যে তিন বার নাচিকেত অগ্নি চয়ন করে এবং বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ এবং দান করে সে, জন্মমৃত্যু অতিক্রম করে; যে নাচিকেত অগ্নিকে আত্মার বলে জেনে ধ্যান করে, সে যমের বন্ধন থেকে বিমুক্ত হয়ে শোকরহিত হয়ে স্বর্গে আনন্দ থাকে।' (১:১:১৮,১৯) এ কথার শেষে যম নচিকেতাকে বললেন, এইবারে তুমি তৃতীয় বারটি প্রার্থনা করো। যেহেতু যম তাকে আগেই অনেক কিছু দিয়েছেন, স্বভাবতই তিনি আশা করতে পারেন, নচিকেতার আর তেমন কিছু প্রার্থনীয় নেই, তাই বললেন, 'তোমার তৃতীয় বারটি প্রার্থনা করো, নচিকেতা।'

তৃতীয় বার সম্বন্ধে নচিকেতা বললেন, মানুষের মৃত্যুর পরে এই যে সংশয়–কেউ কেউ বলে (মৃত্যুর পরে) কিছু থাকে আবার অনেকে বলে কিছুই থাকে না–আপনার দ্বারা উপদিষ্ট হয়ে আমি এ বিষয় জানতে চাই, বরগুলির মধ্যে এইটিই তৃতীয় বর।' (১২) এ প্রশ্ন সুদীর্ঘকাল থেকেই মানুষকে উদবেজিত রেখেছে–শুধু প্রাচীন ভারতে নয়, পৃথিবীর সর্বত্রই। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই কি মানুষ শেষ হয়ে যায়, না মৃত্যুর পরে কিছু অবশিষ্ট থাকে? ঋগ্বেদের শেষতম অংশ দশম মণ্ডলে অন্ত্যেষ্টির সঙ্গে জড়িত যে-মন্ত্রগুলি পাওয়া যায় সেগুলির ভিত্তি হল, মৃত্যুর পরে মানুষ যমের তত্ত্বাবধানে সুখেই থাকে; এ বিশ্বাসের ভিত্তিতেই ওই শ্লোকগুলি রচিত: সম্ভবত তখন পৃথিবীর সর্বত্রই অধিকাংশ মানুষই মরণোত্তর অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিল।

পুরাকালে প্রত্ন-উৎস উৎখননে যে সব বস্তু শবের সঙ্গে সমাহিত হত, তা থেকেই বোঝা যায় যে সারা পৃথিবীতেই এটি একটি ব্যাপক বিশ্বাস ছিল।

অস্তিত্ব অনস্তিত্বকে স্বীকার করতে চায় না, ফলে মরণোত্তর সত্তা অধিকাংশ দেশে এবং কালে স্বীকৃত ছিল, এখনও আছে। কিন্তু মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর পর্যায় থেকে মানুষের স্বতন্ত্র বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঘটে এবং তার একটি বড় প্রকাশ হল সন্দেহ। কাজেই নচিকেতা যমকে বলছে, মৃত্যুর পরে কিছু থাকে এ কথা কেউ কেউ বলে, তেমনই কিছুই থাকে না। এ কথাও কেউ কেউ বলে। মনে রাখতে হবে যে এ উপনিষদ খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম-ষষ্ঠ শতকে রচিত, তখনই নচিকেতা বলছেন, 'কেউ কেউ বলেন মৃত্যুর পরে কিছুই থাকে না'। অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব নবম বা অষ্টম শতকেই এই সংশয় সমাজে প্রসার লাভ করেছে। ওই সময়েরই শেষাংশে বেদবিরোধী প্রস্থানগুলির উদ্ভব এবং খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম-ষষ্ঠ শতকে এগুলি সমাজে প্রত্যক্ষ ভাবে পরিদৃষ্ট। কঠোপনিষদ কৃষ্ণ যজুর্বেদীয় উপনিষদ, অর্থাৎ এর উদ্ভব যজ্ঞের পটভূমিকায়, এই যজ্ঞে যারা হাতেকলমে কাজ করত তাদেরই মধ্যে। তাদেরই এক উত্তরপুরুষ কিশোর নচিকেতা দেখছে তার পিতা যজ্ঞে কতটা অবিশ্বাসী, যে-গাভি দান করার সম্পূর্ণ অযোগ্য সেগুলি অনায়াসে দক্ষিণায় দান করছেন তিনি। অর্থাৎ নচিকেতা এই মৌলিক অবিশ্বাস নিজের বাড়িতেই যজমান পিতার মধ্যে প্রত্যক্ষ করে ক্ষুব্ধ হয়েছে।

যাই হোক, যম তিনটি বর দেবেন প্রতিজ্ঞা করেছেন, তাই তৃতীয় বর যখন নচিকেতা চাইল তখন তার না দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না, তবু চেষ্টা করলেন, নচিকেতাকে নিবৃত্ত করতে, বললেন, 'এই ব্যাপারে স্বয়ং দেবতাদেরও আগে সংশয় ছিল। এই ধর্মের তত্ত্ব এত সূক্ষ্ম যে সহজে বোঝা যায় না। তাই, নচিকেতা, তুমি অন্য কোনও বর প্রার্থনা করো, আমাকে এ নিয়ে উপরোধ কোরো না, এ অনুরোধ ছেড়ে দাও।'(১৩) এখানে লক্ষ্য করি যে, যম নিজের অঙ্গীকার থেকে সরে আসতে চাইছেন; ব্রাহ্মণ প্রার্থতার গৃহে ত্রিরাত্রি উপবাসী ছিল বলে তাঁর যে অপরাধবোধ, তার থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যে নিজের

প্রস্তাব ছিল তিনটি বর। এমন কোনও শর্ত ছিল না যে যমের ইচ্ছামতো বরই চাইতে হবে, বরং চিরন্তন রীতি অনুসারে প্রার্থীর অভিলষিত বস্তুই সে চাইবে। সে-বর দিতে যমের আপত্তি কোথায়? প্রথমত এ ধর্ম বড়ই সূক্ষ্ম, এত সূক্ষ্ম যে সহজে বোঝা যায় না; কিন্তু যম কেমন করে জানলেন যে নচিকেতার বুদ্ধি যথেষ্ট সূক্ষ্ম নয়, সে বুঝবে না। এই সূক্ষ্ম তত্ত্ব? নিজের কুযুক্তিকে সমর্থন করতে গিয়ে যম বলছেন, এই ব্যাপারে পূর্বকালে দেবতারাও সংশয়িত ছিলেন। এর সোজা মানে হল মৃত্যুর পর কিছু থাকে কি না সে-বিষয়ে দেবতাদেরও স্পষ্ট ধারণা ছিল না। কেমন দেবতা তারা যাঁরা ত্রিকালজ্ঞ নন? যাঁরা মর্তলোকের ওপারে বাস করেন, তাদেরও সংশয় ছিল মৃত্যুর পরে কিছু থাকে কি না তা নিয়ে। লক্ষ করলে দেখি, যম বলছেন, 'পুরা' অর্থাৎ পূর্বকালে দেবতাদের এ বিষয়ে সংশয় ছিল। সহজ ব্যঞ্জনা হল, এখন আর সে-সন্দেহ দেবতাদের নেই, তারা জানেন মৃত্যুর পরে কিছু থাকে কি না। কিন্তু তারা সন্দেহ করেন কি না, জানেন কি না সে-কথা এ পটভূমিকায় তো সম্পূর্ণ অবান্তর, কারণ যমের অঙ্গীকার তো কোনও শর্তাধীন ছিল না; যে-কোনও তিনটি বর নচিকেতা চাইবে, যম তা পূরণ করবেন, এমনই তো কথা ছিল। এখন এ পশ্চাদপসরণের চেষ্টা কেন? নচিকেতা বললেন, 'দেবতাদেরও এ বিষয়ে সন্দেহ ছিল, হে মৃত্যু, আপনি স্বয়ং এ তত্ত্বকে দুর্বিজ্ঞেয় বলছেন, আপনার মতো বক্তা আমি অন্য আর কাউকে পাব না, এই বরের তুল্য কোনও বরই হতে পারে না।'(১৪)

নচিকেতার যুক্তিগুলির কোনও খণ্ডন হয় না। প্রথমত, এ এমন একটা বিষয় যা নিয়ে স্বয়ং দেবতারাও সন্দিহান ছিলেন, দেবতাদের মানুষ সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান বলেই জানে, তাঁদেরও জ্ঞান তা হলে এখানে এসে ঠেকে যেত? তাহলে মর্ত্যমানুষ নচিকেতার এ বিষয়ে কৌতুহল তো আরও স্বাভাবিক, আরও যথার্থ। দ্বিতীয়ত, প্রশ্নটা হল মরণোত্তর সত্তা, আর প্রশ্নটি করা হচ্ছে

স্বয়ং মৃত্যুকে, কাজেই তার চেয়ে কে আর বেশি যোগ্য এ প্রশ্নের সদুত্তর দিতে? তৃতীয়ত, যম স্বয়ং বলছেন বিষয়টা দুর্জেয়, কিন্তু এক বারও বলছেন না যে এর সমাধান নেই। বরং ইঙ্গিতটা যেন এমন যে, মানুষ নচিকেতা সেই সমাধান জানিবার যোগ্য নয়, যা দেবতারাও জানতেন না। নচিকেতার যুক্তি হল মৃত্যু-পরবর্তী অবস্থা সম্বন্ধে স্বয়ং মৃত্যুদেবতার চেয়ে যোগ্যতর ব্যাখ্যাতা বা শিক্ষক তো আর কেউ হতে পারে না, অতএব যমের বরে যখন এমন দুর্লভ সুযোগ জুটেছে তখন তা হাতছাড়া করা অবিবেচনার কাজ হবে, তাই যাম তার প্রতিজ্ঞা পালন করে নচিকেতার প্রশ্নের উত্তর দিন। এটিই তার শেষতম বার এবং যমের বরে এ জ্ঞানে তার অধিকার আছে। উত্তরে যম বললেন:

'শতায়ু পুত্র পৌত্র প্রার্থনা করো, বহু গাভী, সুবর্ণ, হস্তী ও অশ্ব চাও, বৃহৎ আয়তনের ভূমি চাও, যত বর্ষ ইচ্ছা বাঁচবার বর চেয়ে নাও। আর এ সবের সমতুল্য অন্য কোনও বস্তু পেতে চাও, তাও চেয়ে নাও। সুদীর্ঘ জীবন, সুবর্ণ ও বস্ত্র প্রার্থনা করো, আমি তোমাকে তোমার সব কামনা পূরণ করে ভোগ করবার ব্যবস্থা করে দেব। এ পৃথিবীতে যে সমস্ত কামনা দুস্তপ্রাপ্য, ইচ্ছামতো সে সব কাম্যবস্তু তুমি প্রার্থনা করো। এই সব সুন্দরী রমণী, এদের সঙ্গে রথ ও বাদ্যযন্ত্র আছে, এমন-সব বস্তু মানুষের অপ্রাপ্য, আমার দান এই সব কিছু দিয়ে তুমি নিজের পরিচর্য করাও, নচিকেতা, শুধু মৃত্যুর পরের ব্যাপারটি সম্বন্ধে আমাকে প্রশ্ন কোরো না।'(১৫)

মৃত্যু নচিকেতাকে যা যা প্রার্থনা করতে বলছেন, তার সবই কর্মকাণ্ডে যজ্ঞ থেকে পাওয়ার কথা। পিতার আচরণে নচিকেতা এমন যজ্ঞ সম্বন্ধে বীতস্পৃহ, তা-ও সে জানে যে এ সবের বাইরে অন্য কোনও কাম্যবস্তু সে-যুগে বা সমাজে অকল্পনীয় ছিল। পৃথিবীতে রাজৈশ্বর্য এবং কল্পনীয় সর্বপ্রকার সুখভোগের তাবৎ উপকরণ। যম নচিকেতাকে দিতে সম্মত, শর্ত একটাই:

মরণের পরের অবস্থা নিয়ে নচিকেতা যেন কোনও প্রশ্ন না করে। প্রকারান্তরে যম তাঁর প্রতিশ্রুত তৃতীয় বারটি প্রত্যাহার করে নিতে চান, বিনিময়ে মর্তে সুচিরকাল স্বর্গের সর্বসুখ দান করতে চান। এর আগে অবশ্য দীর্ঘকাল স্বর্গবাসের প্রস্তাবও দিয়েছিলেন। নচিকেতার প্রার্থিত বস্তুটি দিতে অস্বীকার করার মধ্যে যে-প্রচ্ছন্ন মিথ্যাচারিতা আছে, তার ক্ষতিপূরণ হিসেবে এত ঐশ্বর্য ও সুখ দিতে চান যাতে ওইটি ঢাকা পড়ে। কিন্তু ভবি ভোলবার নয়, নচিকেতা। হঠাৎ-পাওয়া এ সুযোগ ছাড়তে রাজি নয়। সে বলে:

'হে যম, যে সব উপহার আপনি দিতে চান সে সবই তো ক্ষণস্থায়ী (আজি আছে কাল নেই), এগুলি (ভোগের দ্বারা) ইন্দ্রিয়ের তেজ ক্ষীণ করে দেয়, তা ছাড়া (এত ভোগ করার পক্ষে) জীবন অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী, (কাজেই) এই রথ, ইত্যাদি, এই নৃত্যগীত এ সব আপনারই থাকুক। সম্পত্তিতে মানুষের আত্যন্তিক তৃপ্তি নেই, আপনার সঙ্গে যখন দেখা হয়েছে, তখন বিত্তলাভ ঘটবেই, আপনি যতদিন ইচ্ছা করেন। ততদিনই বঁচব, কিন্তু যে-বর আমি কামনা করি তা এই-ই।(১৬)

এখানে নচিকেতা যমের কথার উত্তরে কতকগুলি মোক্ষম যুক্তি দিয়েছে। যমের প্রস্তাবিত সুখভোগে কেন নচিকেতা প্রলুব্ধ নয়, সে-কথা সে স্পষ্ট করেই জানায়, যাঁদের জরামৃত্যু নেই সেই দেবতাদের কাছে পৌঁছেও পৃথিবীর মানুষ জানে যে সমস্ত ইন্দ্রিয়ভোগ্য সুখসঙ্গীত, সম্ভোগ ও আনন্দ–সব কিছুই অনিত্য, অতএব অতিদীর্ঘজীবনে কে আনন্দ পাবে? হে মৃত্যু, এই যে বিষয়টিতে (আমাদের) পরলোক সম্বন্ধে এই যে মহৎ সংশয় সে-কথাই আপনি আমাকে বলুন। (আত্মার গহনে) অনুপ্রবিষ্ট রহস্যগুঢ় এই যে বিষয় সেইটিই আমার (অভীষ্ট) বর, নচিকেতা আপনার কাছে অন্য বর কামনা করে না।'(১৭) এই সব কথায় নচিকেতা যমের প্রতিশ্রুত সমস্ত আনন্দের উপকরণ প্রত্যাখ্যান করে জানতে চাইল, মৃত্যুর পরে কী থাকে। যম বললেন: শ্রেয় ও প্রেয়ের মধ্যে

যে শ্রেয়কে বরণ করে সে সাধু হয়, যে প্রেয়কে বরণ করে পরমার্থ থেকে সে চ্যুত হয়। (একই কথা কঠ, ১:২:১,২-তে)। নচিকেতা, তুমি আপাত সুখের পথ ছেড়েছ বুদ্ধিমানের মতো, (কঠ, ১:২:৩); কাম্যবস্তুর দ্বারা তুমি প্রলুব্ধ হওনি, (কঠ, ১:২:৪); অবিদ্যার মধ্যে যারা বিচরণ করে ও নিজেদের শাস্ত্রজ্ঞ মনে করে, তারা মুর্খ। (কঠ, ১:২:৫) পরের শ্লোকে যম বললেন, যারা মনে করে শুধু ইহলোকই আছে, পরলোক নেই তারা বারেবারে আমার বশীভূত হয়।'(১৮) এর অর্থ হল, যারা নাস্তিক অথবা পরলোকের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী, তাদের পুনর্জন্ম হয় ও বারংবার মৃত্যুভোগের দ্বারা তারা যমের (= মৃত্যুর) বশে আছে। পরের শ্লোকে যম বললেন, আত্মার সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়ার যোগ্য লোক বিরল, ফলে অধিকাংশ মানুষই এ সম্বন্ধে কিছু জানতেই পারে না, এবং উপদেশ পেয়েও অনেকে ঠিকমতো জানতে পারে না। (কঠ, ১:২:৮) পরে বললেন, 'এ বুদ্ধি তর্ক দিয়ে লাভ করা যায় না। তার্কিক নয় এমন কোনও জ্ঞানী আচার্য উপদেশ দিলে ভাল ভাবে জানা যায়, নচিকেতা তোমার সত্যজ্ঞান হয়েছে, তোমার মতো প্রশ্নকারী আমার কাছে যেন আসে। (কঠ, ১:২:৯) এখানে যম স্পষ্ট করেই বলছেন, আত্মজ্ঞান যুক্তি দিয়ে পাওয়া যায় না, যমের মতো জ্ঞানী বিচক্ষণ আচার্যের উপদেশেই শুধু পাওয়া যায়। অর্থাৎ বিদ্যাটি গুরুমুখী, যুক্তির জগতের বাইরে এর অবস্থান। এবং যেহেতু সাধারণ মানুষ তেমন আচার্যের সন্ধান পায় না, পাবে না, তাই ওই জ্ঞান সৌভাগ্যবান মুষ্টিমেয় কয়েক জনেরই ভাগ্যেই জুটবে।

এর পরে যম নচিকেতাকে বললেন, সে কাম্য বিষয় পরিত্যাগ করে এই জ্ঞানের অধিকারী হয়েছে; মানুষ এ জ্ঞান লাভ করে সূক্ষ্ম আত্মাকে লাভ করে। (কঠ, ১:২:১৩) সমস্ত বেদ যে-লক্ষ্যকে নির্দেশ করে, সমস্ত তপস্যা যার কথা বলে, যাকে কামনা করে মানুষ ব্রহ্মচর্য পালন করে, তোমাকে সেই লক্ষ্য সংক্ষেপে বলছি: ওমই হল তাই–সর্বে বেদা যৎ পদমমনস্তি তপাংসি সর্বাণি চ

যদ বদন্তি। যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি-ওমিত্যেতৎ।'' (কঠ, ১:২:১৫) এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব: সমস্ত বেদবিদ্যা, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য সব কিছুই একটি অক্ষরে সংগৃহীত: ওম। এবং এর পরের দুটি শ্লোকে ওম-এর মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে–এই একটি অক্ষরই ব্রহ্মা। এটি জানলেই যে যা চায় তা পায়, এর দ্বারা মানুষ ব্রহ্মালোকে সম্মানিত হয়। (কঠ, ১:২:১৬,১৭) এর পরের পাঁচটি শ্লোকে আত্মার লক্ষণ বর্ণিত হয়েছে: জ্ঞানে, বিদ্যায়, স্বাধ্যায়ে, মেধায় একে পাওয়া যায় না, ইনি যার প্রতি দয়া করে আত্মপ্রকাশ করেন, সে-ই শুধু একে পায়। কর্মকাণ্ডে ছিল বেদশিক্ষার মহিমা, জ্ঞানকাণ্ডে এল জ্ঞানের মাহাত্ম্য, আত্মব্রহ্ম-উপলব্ধির প্রয়োজনীয়তা–কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে, এ সবের দ্বারা আত্মজ্ঞান হয় না। একটু আগে যে-বিচক্ষণ আচার্যের সাহায্যে আত্মজ্ঞান লাভ করার কথা শোনা গেল, সেটারও আর প্রযোজ্যতা রইল না। কারণ, সেটা ছিল প্রবচন, মেধা ও শ্রুতের অন্তর্গত এবং এখন শোনা গেল এ সবের কোনও উপযোগিতা নেই, আত্মা যার কাছে নিজেকে প্রকাশ করে কেবল সে-ই জানতে পারে। খ্রিস্টান ধর্মতত্ত্বে একে বলে grace এবং এর সংজ্ঞা হল grace is unmerited favour (ভগবৎকরুণা হল অনর্জিত কৃপা)। এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান যুক্তি ও জ্ঞানের স্তর থেকে সরে চলে গেল রহস্যের স্তরে, কারণ আত্মা কাকে কৃপা করে তার কাছে নিজেকে প্রকাশ করবে তার নির্ণায়ক আর কিছুই রইল না, সম্পূর্ণ অজ্ঞেয় ও অজ্ঞাত লোকে চলে গেল সমস্ত ব্যাপারটা।

প্রায় ভাগ্যের আয়ত্ত হয়ে উঠল আত্মজ্ঞান। ব্রহ্মের মাহাত্ম্য কীর্তন করে এই বল্লীটি শেষ হয়েছে যে-শ্লোকে তা হল ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় দুই-ই যাঁর অন্ন, মৃত্যু যার ব্যঞ্জন তিনি কোথায় আছেন সে-কথা কেই-বা জানে?'(১৯) অর্থাৎ সেই ব্রহ্মাকে কেউই জানে না। মনে পড়ে, নচিকেতা ব্রহ্মাকে জানতে আসেনি, মৃত্যুর পর কিছু থাকে কি না তা-ই জানতে এসেছিল; প্রসঙ্গত উঠল। ওম-এর

মাহাত্ম্য, আত্মব্রিক্ষের কথা এবং শেষ হল এই বলে যে ব্রহ্মকে কেউই জানতে পারে না। এর পরে প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় বল্লী থেকে দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় বল্লী অর্থাৎ কঠোপনিষদের শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মবিদ্যার কথা। ইন্দ্রিয়, মন, বিজ্ঞান, বুদ্ধি এবং পুরুষের কথা, এটির শেষে শুনি: 'পুরুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কিছুই নেই তিনিই চুড়ান্ত, তিনিই পরম গতিপরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎসা কাষ্ঠাসা পরা গতিঃ।।'(কঠ, ১১:৩:১১) সমস্ত প্রাণীতে গোপন আত্মা এই পুরুষ প্রকাশিত হন না, একাগ্রতাযুক্ত সূক্ষ্মবুদ্ধির দ্বারা সূক্ষ্মদশীরা একে দেখতে পানএষঃ সর্ব্বেষু ভুতেষু গুঢ় আত্মা না প্রকাশতে। দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্মীয়া সূক্ষদর্শিভিঃ।।' (কঠ, কঠ, ১১:৩:১২) তা হলে একাগ্র সূক্ষ্মদশী মানুষের সূক্ষ্মদৃষ্টি দিয়ে এঁকে দেখা যায়। এখন আর ভগবৎকৃপার প্রসঙ্গ উঠছে না। বিচক্ষণ আচার্য নেপথ্যে থাকতেও পারেন। এর একটা শ্লোক পরে সেই বিখ্যাত শ্লোক: 'ওঠে, জাগো, শ্রেষ্ঠদের কাছে গিয়ে (কিংবাবর লাভ করে) জানো, ক্ষুরের সূক্ষ্ম ধারালো অগ্রভাগের মতো তীক্ষ্ণ সেই দুর্গম পথ–উক্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরান নিবোধত। ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথ্যস্তৎকবয়ো বদন্তি।'(কঠ, ১:৩:১৪) কোন পথ? ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পথ, জেগে উঠে তা লাভ করবার জন্যে কী প্রয়োজন–শ্রেষ্ঠ আচার্য, সূক্ষ্মবুদ্ধি ও একাগ্রতা, না ভগবৎকৃপা, তার উল্লেখ নেই। পরবর্তীকালে বেদান্তে ব্রহ্মের যে-সংজ্ঞা তাতে তিনি নিগুণ, কৃপা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। যা বলতে চেষ্টা করছি তা হল, নচিকেতার প্রশ্নটি দ্ব্যর্থহীন, স্পষ্ট, ঋজু। কিন্তু উত্তর–যদি কিছু থেকে থাকে–তা গভীর অন্ধকার অরণ্য। শংকরাচার্যের ভাষ্য এ রচনার দেড় হাজার বছরের পরের–অন্তর্বর্তীকালের সমস্ত চিন্তাচর্চার উত্তরাধিকার তার অন্তরালে নিহিত আছে, এখানে সেটা প্রযোজ্য নয়, কারণ এই যুগের চিন্তার ওপরে দুর্ভেদ্য বহু প্রলেপ পড়েছে। এর পরের শ্লোকে সর্বলক্ষণবিনিমুক্ত ব্রহ্মাকে জানলেই মৃত্যুমুখ থেকে মুক্ত হওয়া যায়–নিচায্য তম্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে।' (কঠ, ১:৩:১৫), নচিকেতার প্রশ্নটা কিন্তু মৃত্যুমুখ থেকে মুক্ত

হওয়ার উপায় কী, তা ছিল না, মৃত্যুর পরে কিছু আছে কি না, তাই ছিল। প্রথম অধ্যায়ের শেষ শ্লোকটি মাহাত্ম্য' শ্লোক, মৃত্যু কর্তৃক কথিত নচিকেতার এই সনাতন উপাখ্যান বললে বা শুনলে মেধাবী ব্রহ্মালোকে সম্মানিত হন।'(২০) এটাও কিন্তু নচিকেতার প্রার্থিত বর ছিল না, এই ব্রহ্মালোকে সম্মানিত হওয়া; তার প্রশ্নের সদুত্তর এখনও যম দেননি।

এর পরের বল্লীতে যম বলছেন, পণ্ডিতেরা আধ্রুব অর্থাৎ অস্থায়ী ইন্দ্রিয়সুখের জগতে ধ্রুব বা স্থায়ী সুখের খোঁজ করেন না। (কঠ, ২:১:২) যার দ্বারা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতা জন্মায় তা সব এরই দ্বারা হয়; ইনিই সেই–এতদ্বৈ তৎ' (কঠ, ২:১:৩)। এর পরেরটি বাদে পাঁচটি শ্লোকে আত্মা যে দৃশ্য-ভোগ্য জগতের বহির্ভূত, গোপন একটি সত্তা তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে; এই পাঁচটি শ্লোকের প্রত্যেকটিরই শেষে যোগ করা হয়েছে, 'এতদ্বৈ তৎ'; অর্থাৎ কী নয়, কী হতে পারে না, সেই নেতি-নতি প্রক্রিয়ায় আত্মার স্বরূপ ঘোষণা করা হয়েছে। 'এখানে যা ওখানেও তা-ই, ওখানে যা এখানেও তাই, যে একে বিভিন্ন (নানা)-ভাবে দেখে সে মৃত্যু থেকে মৃত্যুই প্রাপ্ত হয়–যদেবেহ তদমুত্র তদন্বিহ। মৃত্যোঃ সঃ মৃত্যুমাপ্নোতি যাইহ নানেব পশ্যতি।' (কঠ, ২:১:১০) অর্থাৎ আত্মা ও ব্রহ্মের একত্ব ঘোষণা করে বলা হল, যে এই একত্ব দেখতে পায় না সে বারংবার মৃত্যুর অধীন হয় অর্থাৎ জন্মান্তরে পুনর্ম্মৃত্যু ভোগ করে। এর পরের দুটি শ্লোকে বলা হয়েছে আত্মারাত্মার আকৃতি বা আয়তন বুড়ো আঙুলের মতো (অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ) এবং পরের দুটি শ্লোকের শেষেও আছে 'এতদ্বৈ তৎ'। অর্থাৎ আত্মা পরমাত্মা, ব্রহ্ম বললে আকৃতিগত কোনও বৃহত্ত বোঝায় না। আদিম যুগে মানুষের বিশ্বাস ছিল, মৃত্যুকালে প্রাণ মস্তিষ্কের ওপরের রন্ধ্র থেকে নির্গত হয়। অতএব তাকে ক্ষুদ্রায়তন কল্পনা করাই সংগীত, তাই সে বুড়ো আঙুলের মতো। লোককথায় আমরা নানা দেশে যে-বুড়ো আঙুলের মতো জাদু-শিশুর কথা পড়ি, যে বড়দের মতো বা বড়দের চেয়েও বেশি

শক্তির কাজ সম্পন্ন করে, এ সবই এর পেছনে ক্রিয়াশীল। আত্মা-ব্রহ্মা, যার চেয়ে শক্তিশালী আর কিছুই কল্পনা করা যায় না, তার গুরুত্ব আকৃতি বা আয়তনে নয়, ঐশী বা অতিলৌকিক শক্তিতে।

দ্বিতীয় বল্লীর দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রথম, চতুর্থ ও অষ্টম শ্লোকের শেষে, এবং তৃতীয় বল্লীর প্রথম শ্লোকেও 'এতদ্বৈ তৎ' ধ্রুবপদটি পাই। অর্থাৎ নানা ভাবে সদর্থক ও নঞর্থক বর্ণনার দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ উদঘাটনের চেষ্টা করা হয়েছে: ব্রহ্মা কী নয়, কীভাবে তার সন্ধান করলে সে-চেষ্টা ব্যর্থ হবে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের বাইরে স্বতন্ত্র সেই দুর্জেয় সত্তার অবস্থান প্রতি মানুষের অন্তরাত্মার মধ্যে তাঁর অধিষ্ঠান। বায়ু, অগ্নি ও সূর্য যেমন দৃষ্ট, অনুভূত হয়, কিন্তু মানুষের ইন্দ্রিয়ের বাইরে বিষয় হিসেবে তাদের স্বতন্ত্র অবস্থান, আত্মারও তেমনই। মনে রাখতে হবে, দেহবহির্ভূত আত্মা এই সময়েই দেখা দিল একটি ভাবপদার্থ হিসেবে, মানুষের অবধারণার বাইরে এর অস্তিত্ব; তাই এর স্বরূপ বোঝানো যাবে কী করে? প্রথমত, এ কী নয়, ভুল করে একে কী কী ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর সঙ্গে একাত্ম বলে মনে করতে পারে লোকে, সেইগুলো থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বতন্ত্র বলে একে বোঝাবার জন্যে ওই নেতি-নতি প্রক্রিয়ার আশ্রয় নিতে হয়েছে। দ্বিতীয়ত, স্বতঃস্বৰূপে আত্মা কী, তা বোঝাবার জন্যে আশপাশ থেকে এর বর্ণনা করা হয়েছে যেন আভাসে লোকে আত্মাকে বুঝতে পারে। এই দ্বিতীয় পর্যায়ের বর্ণনার মধ্যে স্বভাবতই অনেক অস্পষ্টতা, অনির্দেশ্যতা আছে; কিন্তু এ ছাড়া ওই কাল্পনিক সত্তাটিকে জনসমক্ষে গ্রহণযোগ্যতারুপে উপস্থাপিত করা যেত না। এ ভাবেও যায়নি। তার অনেক প্রমাণ আছে।

প্রথমত, যে সময়ে আত্মব্রহ্মা তত্ত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা চলছে সে সময়ে মুষ্টিমেয় কয়েক জনকে বাদ দিলে দেশসুদ্ধ লোক অশিক্ষিত, বৃহৎসংখ্যক শূদ্র। নারী

আদিবাসী এবং দরিদ্র ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের অনেকেই অশিক্ষিত। এদের মধ্যে বৃহৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে পেটভাতায়, এদের দৈনন্দিন জীবনে নুন আনতে পান্তা ফুরোয়–এরা অবসর-সময়ে নেশা করে, উৎসব করে, আলস্য যাপন করে, এবং আর যা-ই করুক দর্শনচিন্তা করে না। ফলে ওই আত্মব্রহ্মতত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় বা উৎসাহ এদের ছিল না। কোথাও যজ্ঞ হলে দূর থেকে এরা দেখত, প্রয়োজন মতো মজুর খাটত, গার্হস্থ্য জীবনে প্রাগার্য পূজাপদ্ধতি যা অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল, তাতেই এদের চলে যেত। এরা ধরেই নিয়েছিল, এদের অপর দুঃখদুর্দশা ঘোচাবার সাধ্য দেব-মানব কারুরই নেই। তবু অসহ্য হয়ে উঠলে দেবতার কাছে কেঁদে পড়ত। সে-দেবতা আর যে-ই হীেন আত্মা বা ব্রহ্মা নয়। দ্বিতীয়ত, এই তত্ত্ব যে জনসমাজে বিস্তার লাভ করেনি। তার একটা প্রমাণ, যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়েই চলছিল, আর সঙ্গে সঙ্গে সমাজে প্রাগার্য প্রভাবে নানা চেহারায় পূজাও ঢুকে পড়েছিল। তৃতীয়ত, আত্মব্রহ্মাতত্ত্ব নিয়ে সমাজে অসংখ্য গ্রন্থ রচনা হয়ে এসেছে, এখনও হচ্ছে। এর মধ্যে খুব কম গ্রন্থকারের পরস্পরের সঙ্গে ঐকমত্য আছে। অর্থাৎ তত্ত্বটি দুরূহ, দুর্বোধ্য এবং পণ্ডিতরা একে প্রথম থেকেই বিজ্ঞজনগ্রাহ্য বলেছেন, এবং সেটি প্রমাণ করবার জন্যে নানা ভাবেভাষায়, শব্দবিন্যাসে, অলংকারে অর্থাৎ উপমা ও রূপকে নানা ধরনের বিমূর্ত বর্ণনায়এটিকে তাঁরা দুর্গম করে রেখেছিলেন। নচিকেতাকে তো যম স্পষ্টই বললেন, অতি সূক্ষ্ম বুদ্ধি ছাড়া এ তত্ত্ব বোঝে এমন সাধ্য কার আছে? চতুর্থত, ধরে নেওয়া যায় যে, সে সময়েও সূচ্যগ্রসূক্ষ্ম বুদ্ধি বেশ-কিছু লোকের ছিল, তারাও কিন্তু ওই সূক্ষ্মবুদ্ধির জোরে ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকারী নয়, কারণ এ বিদ্যা তর্ক অর্থাৎ যুক্তি দিয়ে পাওয়ার নয়–নৈষা তর্কেণ মতির্যাপনেয়া। তা হলে পাবে কে?

ব্রহ্মা কৃপা করে যার কাছে আত্মপ্রকাশ করবে। শুধু সে-ই পাবে। আগে দেখেছি, গুণাতীত ব্রহ্মো কৃপাবুপ উপাধি (লক্ষণ, বা ধর্ম) আরোপ করা অযৌক্তিক। ব্রহ্মা ব্যক্তি নয়, পদার্থ এবং নিগুণ, কৃপা তিনি করবেন কেমন করে? যাই হোক, উপনিষদ যখন বলছে তখন না হয় ধরে নেওয়া গেল যে তিনি মধ্যে-মধ্যে কৃপা করে থাকেন, তখন তার প্রসাদধন্য জিজ্ঞাসু ব্যক্তি ব্রহ্মস্বরূপ জানতে পারে। শেষ প্রশ্ন থেকে যায়, সূক্ষ্ম-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরও যখন জানিবার নিশ্চয়তা নেই, তখন তো আরও বেশি অনিশ্চিত ব্রহ্মাকৃপা হি কেবলম-এর পাত্র কে হবে সে-ব্যাপারটা। তা হলে পরিশেষ্যাৎ দাঁড়াল এই যে, ব্রহ্মা যার কাছে আত্মপ্রকাশ করবে ব্রহ্মজ্ঞান তারই হবে; সে যে কে আর কে নয়, এ সম্বন্ধে শাস্ত্র নীরব। কারণ বিদ্যাবুদ্ধি শিক্ষা এ সব যখন যথার্থ যোগ্যতা নয়, তখন কৃপা নেহাতই আকস্মিক হয়ে দাঁড়ায়। পরবর্তীর্ণ ভাষ্যকাররা অবশ্য বলেছেন, ভোগ্য বিষয় থেকে যে ইন্দ্রিয়সমূহকে প্রত্যাহার করে নিয়েছে, যে অধুব জগতে ধ্রুব ব্রহ্মের সন্ধান করে না। অর্থাৎ মনকে যে নির্লিপ্ত বিষয়বিমুখ করে নিয়েছে সে অনুকুল পাত্র। শাস্ত্র এ-ও বলেছে, বুদ্ধি যার সূক্ষ্মতিসূক্ষ্ম সে-ও অনুকুল পাত্র। কিন্তু শাস্ত্র এ-ও বলেছে যে এ সব সত্ত্বেও সে ব্রহ্মাকৃপা না-ও লাভ করতে পারে।

তা হলে সমস্ত ব্যাপারটা রহস্যাবৃত হয়ে রইল, এবং তা-ই থাকে। শুধু ভারতবর্ষে নয় পৃথিবীর সমস্ত ধর্মতত্ত্বে। ইংল্যান্ডে ক্যালভিন প্ররর্তন করলেন প্রাক-নিরূপণ তত্ব (predestination theory) যার অর্থ ঈশ্বর কাকে মুক্তি দেবেন। কাকে দেবেন না সে-কথা মানুষের জন্মের আগেই ঠিক করা থাকে; তা হলে যে মুক্তি পাবে যেহেতু সে মুক্তি অর্জন করার মতো কোনও সৎকর্ম করেনি তা হলে তার মুক্তির হেতুও ব্রহ্মাকৃপা হি কেবলম'। এমন তত্ব ইসলামেও আছে, অন্য ধর্মেও আছে, এবং ঠিক এইবুপে না হলেও অন্যরূপে সর্বত্রই আছে। সাধে আর আজীবিকরা বলত, ভাল কাজই কর মন্দ কাজই

কর, তাতে তোমার ভাগ্যের কোনও ইতারবিশেষ হবে না। চুরাশি লক্ষ জন্মের পরে আপনা-আপনিই আত্মা মোক্ষ লাভ করবে। এই অনির্দেশ্যতা সমস্ত ধর্মাচার্যের হাতের বেত্রিদণ্ড। ভাল কাজ করে ভাল ফল না হলে ওই যুক্তি-নৈষা তর্কেণ মতির্যাপনেয়া। কী হবে তা তোমার কর্মের ওপরে নির্ভর করে না, একটা অনির্দেশ্য কিছু খুব দরকার, নইলে দুই আর দুয়ে চার হয়ে যাবে। যমের সংজ্ঞা অনুসাের ঐহিক সুখে নির্লোেভ সূক্ষ্ম বুদ্ধিমান নচিকেতা তো ব্রহ্মজ্ঞানের আদর্শ পত্র ছিল, যদিও সে-বেচারি ব্রহ্মজ্ঞানের জন্যে আসেনি, এসেছিল পরলোকতত্ত্ব জানিবার জন্যে। তবু তাকে আত্মব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে বিস্তর জ্ঞান দেওয়া হল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটাকে যোগ্যতা-লভ্য করে রাখা হল না, অনর্জিত ব্রহ্মকরুণার অন্তর্গত করে রাখা হল।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় (শেষ) বল্লীর শুরু ‘এই সনাতন অশ্বত্থের মূল ঊর্ধ্বে শাখা নীচে, সে-ই শুক্র, সে-ই ব্রহ্মা, সে-ই অমৃত বলে অভিহিত। এই পৃথিবী তাতেই আশ্রিত, তাকে কেউ অতিক্রম করতে পারে না। এ-ই সেই।’(২১) এখানে ব্রহ্মের নতুন এক ধরনের বর্ণনা করা হল। চিত্রকল্পটি প্রকৃতির বিরুদ্ধ, উর্ধমূল নিম্নশাখ গাছ হয় না, কাজেই এ শ্লোকটিকে আক্ষরিক অর্থে নেওয়া চলবে না।

গাছের শেকড় যেখানে থাকে। সেখান থেকে সে প্রাণরস আহরণ করে; এই ব্রহ্মা-অশ্বত্থ তা হলে আকাশ থেকে রস আহরণ করে? অবাকশাখ মানে নীচের দিকে শাখা, আকাশের নীচে অর্থাৎ পৃথিবীতে, অতএব পরিদৃশ্যমান। অর্থাৎ ব্রহ্মের যে-অংশ দৃশ্যমান তা হল এই জগৎসংসার, এখানে গাছের শাখা, ফল, পাখির কোটর, ছায়া, আশ্রয়, সৌন্দর্য। এর মূল সুন্দরও নয়, স্পষ্ট দৃশ্যমানও নয়, কিন্তু এর সত্তার উৎস আকাশে। সেখানকার সৌন্দর্য চোখে

পড়ে না, তবু আছে। মনে পড়ে উপনিষদেরই কথা, ‘কে শ্বাস নিত, কে বেঁচে থাকত যদি এই আকাশ আনন্দ না হত?–কো হ্যেবান্যাৎ কচুঃ প্রাণ্যোৎ যাদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যা।’ ব্রহ্মাকে সনাতন বনস্পতি অশ্বত্থের সঙ্গে তুলনা করে রচয়িতা বলতে চান এর নীচেরটুকুই দেখা যায়, মূল দেখা যায় না। অর্থাৎ অন্যত্র নানা অংশে যেমন একে রহস্যাবৃত জ্ঞানের অগোচর করে রাখার প্রয়াস, এখানেও সেটা লক্ষ করা যায়। মনে পড়ে প্রাচীন নরওয়ের মহাকাব্য প্রোজ এডিডা-তে অমনই একটি গাছের বর্ণনা আছে। Snorri Sturl1ussion-এর সংকলিত এই প্রাচীন গদ্য-মহাকাব্যে এবং ছন্দে রচিত এন্ডার এড-তেও Yggdrasil নামের একটি অ্যাশ গাছের কথা আছে।

এ দেশে অশ্বত্থ যেমন সনাতনত্বের প্রতীক ওখানে অ্যাশাও ঠিক তাই। প্রোজ এড্ডা-তে পড়ি:

‘পরমেশ্বরকে গাংলেরি (গিলফ, অসুরজাতীয় জীব) প্রশ্ন করলেন, ‘দেবতাদের প্রধান নিবাস বা পবিত্র স্থলটি কোথায়? পরমেশ্বর বললেন, ‘সেটি অ্যাশাইগড্রাসিলের পাশে. ওই বনস্পতিটি বিধৃত আছে তিনটি মূলের দ্বারা যেগুলি দুরবিসারী। একটি ঈসীর (দেবতা)দের মধ্যে, দ্বিতীয়টি কুয়াশা-দৈত্যদের মধ্যে এবং তৃতীয়টি নিফুলহাইম, (পাতাল)-এর ওপরে।... ওই অ্যাশ গাছটির তৃতীয় মূলটি আকাশে এবং এর মূলটি হল উর্দুদের পবিত্র ঝরনা।’(২২)

পরে বলা আছে, ‘বনস্পতিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল অ্যাশাইগড়াসিল। (পৃ. ৬৬) এন্ডার এড়া-য় আছে, ‘যে সব ঘোড়ায় চড়ে দেবতারা প্রত্যহ (মানুষের) ভাগ্য নির্ণয় করতে যান অ্যাশ ইগড়াসিল থেকে’। (পৃ. ৬৪) শেষোক্ত বইটির শেষে সমগ্র এড়া সাহিত্য থেকে সংকলন করে ইগড়াসিলের যে-ছবিটি দিয়েছেন তাতে এই গাছটি স্বর্গ-মর্ত-পাতাল ব্যাপ্ত করে দাঁড়িয়ে আছে। উপনিষদেও এই

ব্রহ্মবৃক্ষটি চরাচর ব্যাপ্ত করে আছে; এর ঊর্ধ্বের্ব দেবালোক, মধ্যে নরলোক, নীচে পাতাল। এর থেকে মনে হওয়া সম্ভব যে ইন্দো-ইউরোপীয় যুগের কিছু মনীষীর মনে হয়েছিল, এমনই একটি বৃক্ষের আকারে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ শক্তি রূপ পরিগ্রহ করেছে। এ দেশে অশ্বত্থ যেমন সনাতনত্বের প্রতীক, উত্তর ইউরোপে অ্যাশও তাই, তার থেকেই প্রথম নরনারীর সৃষ্টি।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, নচিকেতার পরলোক সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তরে এই ব্রহ্মাবনস্পতির অবতারণার হেতু কী। এর পরের শ্লোকেই একে চরাচরের সৃজনীশক্তি বলা হয়েছে এবং তার পরে সেই শ্লোকটি তৈত্তিরীয় উপনিষদেও আছে: 'এর ভয়ে অগ্নি তাপ দেয়, সূর্য তাপ দেয়, এর ভয়ে ইন্দ্র, বায়ু এবং পঞ্চম মৃত্যু ধাবিত হয়।'(২৩) কোনও শক্তির মহিমা-কীর্তন করতে হলে তাকে ভয়াবহ করে তোলা একটি পরিচিত প্রক্রিয়া; কিন্তু এখানে ভয় পায় কারা? পৃথিবীর নিয়ামক শক্তিগুলি: অগ্নি, সূর্য ও বায়ু; এ ছাড়া দেবরাজ ইন্দ্র এবং মৃত্যু। অর্থাৎ প্রাকৃতিক শক্তিগুলির চালনা করেন ব্রহ্মা; দেবতারাও যে এর অধীন তা দেখাবার জন্যে ইন্দ্রের নাম করা হয়েছে। স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র। (লক্ষণীয় ইগোড্রাসিল সম্বন্ধেও বলা হয়েছে, এটি দেবতাদের পীঠস্থান (পৃ. ৪২)। এর পরের অংশটিই নচিকেতার প্রশ্নের সঙ্গে সম্পৃক্ত: মৃত্যু ধাবিত হয় ব্রহ্মের ভয়ে। ভয় কীসের? বিশ্বচরাচরে যে ঋত ক্রিয়াশীল বলে তার সমস্ত প্রকাশ নিয়মানুবর্তী, তার ব্যত্যয় হওয়ার ভয়। অতএব মৃত্যু স্বেচ্ছাচারী নয়, ব্রহ্মের নির্দেশেই সক্রিয়। অতএব কোথাও যেন এতে একটা আশ্বাস আছে, বেহিসেবি, বেনিয়মে কিছুই হওয়ার নয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নচিকেতা এ আশ্বাসের সন্ধান করেনি, সে ধরেই নিয়েছিল যমের ইচ্ছা হলে পরমায়ু শেষ হয়–জীবিষ্যামি যাবদীশিষ্যসি ত্বম। (কঠ, ১:১:২৭), তার পরের শ্লোকেই বলা হয়েছে, 'এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করার পূর্বে যার মৃত্যু হয় সে আবার সৃষ্টির

ভূমিতে শরীর নিয়ে আসে–ইহ চেদশকদ্বেন্ধুং প্রাক শরীরস্য বিস্রসঃ। ততঃ সর্গেষু লোকেষু শরীরত্বায় কল্পতে।' (কঠ, ২:৩:৫)

একটা হদিস পাওয়া গেল মরণোত্তর অবস্থা সম্বন্ধে: ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করবার পূর্বে মৃত্যু হলে পুনর্জন্ম হয়। এ বার প্রশ্ন ব্রহ্মজ্ঞানের আয়নায় যেমন প্রতিবিম্ব দেখা যায়, বুদ্ধিতে তেমনই আত্মার দর্শন লাভ করা যায়। স্বপ্নে যেমন দর্শন তেমনই পিতৃলোকে, জলে যেমন তেমন গন্ধর্ব্বলোকে; ব্রহ্মালোকে আলো ও ছায়ার মতো স্পষ্ট করে। (দেখা যায়)'।(২৪) স্পষ্টতই এটি কোনও অসংশয়িত উত্তর নয়। সূর্য ও ছায়ার মতো স্পষ্ট আত্মদর্শন বললে সত্যিই কিছু বোঝায় না, ব্রহ্মালোকে তত্ত্বগত ভাবে আত্মদর্শন হওয়ারই কথা নয়, আত্মা ও ব্রহ্মের একত্ব সাধিত হয় মাত্র। গন্ধর্ব্বলোক বলতে পরবর্তী টীকাকাররা দেবালোক অর্থ করছেন; স্পষ্টই বোঝা যায় এক সারি অনেকান্ত উপমা ব্যবহার করা হয়েছে ব্রহ্মালোকের উৎকর্ষ বোঝাতে। আগের শ্লোকে বলা হল, এ জীবনে ব্রহ্মজ্ঞান না হলে জন্মান্তর হয়, অর্থাৎ আভাসে বলা হল এখানে, আলো ও ছায়ার মতো পৃথক করে দেখা যায়। দেখবার পরে কী হয় বলা হয়নি।

পরের তিনটি শ্লোকে শুনি ইন্দ্রিয়গুলির উৎপত্তি জেনে পণ্ডিত শোক ত্যাগ করেন, ইন্দ্রিয়ের ওপারে মন, মনের পরে সত্ব, তার পরে মহান আত্মা ও মহতের পরে অব্যক্ত, অব্যক্তের পরে পুরুষ, ব্যাপক এবং লিঙ্গহীন যাঁকে জেনে জীব মুক্ত হয় ও অমৃতত্ব পায়—যং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুর মৃতত্বমচ গচ্ছতি।।' (কঠ, ২:৩:৮) এই অমৃতত্ব কী তা কখনও স্পষ্ট করে বলা হয়নি। অমর আত্মার বুপ চোখে দেখা যায় না; মনে মনীষার দ্বারা প্রকাশিত হন আত্মা; 'যারা এটা জানে তারা অমৃত হয়–যা এতদ্বিদুর মৃত্যাস্তে ভবত্তি।' (কঠ, ২:৩:৯) মন যখন ইন্দ্রিয় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, বুদ্ধি ক্রিয়হীন হয় তাকেই পরম গতি বলা হয়। (কঠ, ২:৩:১০) এই অবস্থাকেই যোগ বলে, ইন্দ্রিয়ধারণা তখন

স্থির, (মানুষ)। তখন অপ্রমত্ত, যোগের উৎপত্তি বিনাশ আছে–যখন হৃদয়ের গ্রন্থিগুলি ছিন্ন হয়, তখন মর্ত্যমানুষ অমৃত হয়, এই হল অনুশাসন (কঠ, ২:৩:১৪)। হৃদয় থেকে নিঃসৃত একশোটি নাড়ির মধ্যে একটি ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে বেরিয়ে গেছে, সেই ঊর্ধ্বের্ব নিষ্ক্রান্ত নাড়ি অবলম্বনে অমৃতত্ব লাভ করা যায়। বাকিগুলির দ্বারা অন্য দিকে গতি হয় (কঠ, ২:৩:১৬)। বুড়ো আঙুলের আয়তন পুরুষ হল। অন্তরাত্মা, সর্বদা মানুষের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট থাকেন। মুঞ্জঘাস থেকে যেমন তার শিসটা ছিঁড়ে নেওয়া হয় সেই ভাবে ধৈর্য ধরে ওই অন্তরাত্মাকে শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করবে, তাকে শুক্র ও অমৃত বলে জানবে (কঠ, ২:৩:১৭)। দ্বাদশ শ্লোকে বলা হয়েছে, 'পরমাত্মাকে বাক্য দিয়ে জানা যায় না, মন বা চক্ষু দিয়েও নয়, যারা আত্মা সম্বন্ধে আছে' এই কথা বলে, (তারা জানে) তা ছাড়া অন্য কোনও ভাবে একে জানা যায়?'(২৫) পরে (আত্মাকে) আছে' বলে উপলব্ধি করতে হবে সগুণ ও নিগুণ বা সোপাধিক ও নিরুপাধিক দু ভাবেই 'আছে' বলে উপলব্ধি করলে পরে তবেই তা যথার্থত প্রসন্ন হবে (অর্থাৎ আত্মপ্রকাশ করবে)। ২৬ এ দুটি শ্লোকে কিন্তু কঠোপনিষদের একেবারে প্রথমে যমের প্রতি নচিকেতার যে-প্রশ্ন তারই যেন প্রচ্ছন্ন উত্তর দেওয়া হচ্ছে।

নচিকেতা বলেছিল, 'মৃত্যুর পরের অবস্থা নিয়ে এই যে সংশয়, কেউ কেউ বলে (মৃত্যুর পরে) কিছু থাকে আবার অনেকে বলে কিছুই থাকে না, এ সম্বন্ধে আপনি আমাকে বলুন।' (কঠ, ১:১:২০) এতক্ষণে যেন যম প্রকারান্তরে, সে-প্রশ্নের উত্তর দিলেন, যারা আত্মাকে 'আছে' বলে জানে তারাই জানে, অন্য কোনও ভাবে জানা যায় না। কিন্তু এ কি উত্তর? এ তো নচিকেতার প্রশ্নকে এড়িয়ে যাওয়া। যারা আছে' বলে জানে, নচিকেতার প্রশ্নের অর্ধাংশ তারা, যারা 'নেই' বলে জানে? তাদের সম্বন্ধে যম বললেন তাদের কোনও মতেই

আত্মজ্ঞান হবে না। কারণ একমাত্র আছে' বলে উপলব্ধি করলেই জানা যায় আত্মাকে। ইংরেজিতে যাকে বলে auto-suggestion (নিজেকে বলে বলে বিশ্বাস করানো) এ তো তাই। মুশকিল। হল, যমের দাবি এর চেয়েও বেশি – যারা আছে' বলে উপলব্ধি করে; উপলব্ধি করাটা তো মানুষের হাতে নেই। মন, চক্ষু, বাক্য দিয়ে জানা যায় না, 'আছে' বলে উপলব্ধি করলেই তার জ্ঞান পাওয়া যায়, ইংরেজিতে একে বলি begging the question। Gojas CRCsis হাতের মোয়া নয়, ইচ্ছে করলেই পাওয়া যায় না; সূচ্যগ্রবুদ্ধি, প্রভূত বিদ্যা উপযুক্ত আচার্য, জ্ঞান বা মনন্বিতার দ্বারাও পাওয়া যায় না। বুদ্ধির জগতের বাইরে অনুভবের জগতে উপলব্ধি, চেষ্টা করেও পাওয়ার নয়। তা হলে শেষ পর্যন্ত ওই দৈবকৃপাতে এসে ঠেকছে, যদিও এ দুটো শ্লোকে সে-কথা বলেনি। কিন্তু এমন ভাবে বলা হয়েছে যেন উপলব্ধি করা মানুষের সাধ্যের বা আয়ত্তের মধ্যে। সংশয়ীকে যম তার আলোচনার পরিধি থেকে সম্পূর্ণবাদ দিলেন, অথচ সংসারে সৎ, বিবেকী, যথার্থ সংশয়ী মানুষ আছে। সংশয় যাদের আত্মপ্রতারণা নয়, সংশয় যাদের মর্মন্তুদ অভিজ্ঞতা, তাদের কোনও গতি যমের বিধানে নেই। যে সংশয়ী তাকে পুরো হিসেবের বাইরে রাখা হল যেন সে ইচ্ছে করেই বিশ্বাস করছে না, বিশ্বাস করতে পারছে না বলে নয়।

শেষ শ্লোকে বলা হয়েছে, 'মৃত্যুর দ্বারা কথিত এই বিদ্যা ও সমগ্র যোগবিধি লাভ করে নচিকেতা ব্রহ্মাকে প্রাপ্ত হল, রজোগুণ থেকে এবং মৃত্যু থেকে মুক্ত হল, অন্য যে-কোনও অধ্যাত্মবিদও এই অবস্থা লাভ করে।'(২৭) এক অর্থে নচিকেতার প্রশ্নের চেয়ে বেশি উত্তর দেওয়া হল: আত্মার বিভিন্ন পরিণতি এবং সেগুলির নির্ণায়ক কর্মের কথা বলা হল। এ সব সম্বন্ধে তখনকার জনমানসে উদগ্র জিজ্ঞাসা ছিল; মৃত্যুর পরে সত্যিই কিছু থাকে কি না, থাকলে তার লক্ষণ কী, পরিণতি কী, এ পরিণতি কি মানুষ কোনও ভাবে নিরূপণ বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে? এই সব প্রশ্নের উত্তর যম দিয়েছেন, বাড়তি অনেক

তথ্যও জানিয়েছেন। সে-যুগে যেটি নতুন তথ্য তা হল ইন্দ্রিয়যুক্ত মানুষের প্রকৃত সত্তা তার দেহ নয়, দেহাতীত যে আত্মা সেই আত্মাই অমর। মৃত্যুর পরে এ জন্মের কর্ম অনুসারে তার দু' রকম গতি হতে পারে: পিতৃযান যাতে নানা পথ ঘুরে বারবার জন্মাতে হয়, অন্তিমে জন্মান্তর-ধারা থেকে মুক্তি ঘটে। দ্বিতীয় পন্থটি হল দেবযান, সে-ও এ জন্মের কর্ম দ্বারা নিরূপিত হয়, সে-পথে মৃত্যুর পরে আত্মা কিছু পথ ঘুরে সূর্যের পথ ধরে মোক্ষ প্রাপ্ত হয় বা তার স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা ব্রহ্মে লীন হয়। এর মধ্যে প্রচলিত লোকবিশ্বাসও স্থান পেয়েছে, যেমন মৃত্যুকালে বুড়ো আঙুলের মাপের আত্মা মাথার খুলি ভেদ করে নির্গত হয়। আধ্যাত্মিক স্তরে আত্মার বিস্তার অনন্ত, কিন্তু এই ক্ষুদ্র মানবদেহে সেই বিপুল আত্মা কেমন করে বাস করে? স্বভাবতই, আত্মার সঙ্গে নতুন এই পরিচয়ের যুগে এ সব প্রশ্ন মানুষের মনে উঠবেই, তাই নচিকেতার প্রশ্নকে কেন্দ্র করে যম। এ-জাতীয় নানা প্রশ্নের উত্তর দিলেন।

---

(১) উশন হ বৈ বাজশ্রাবসঃ সর্ববেদসং দদৌ। তস্য হ নচিকেতা নাম পুত্র আসি। (মুণ্ডক, ১:১)

(২) তং হি কুমারং সন্তং দক্ষিণাঙ্গু নীয়মানাসু শ্রদ্ধা বিবেশি, সোৎহমন্যত।। পীতোদকা জক্ষিতৃণা দুগ্ধদোহা নিরিন্দ্রিয়াঃ। আনন্দা নাম তে লোকাস্তান স গচ্ছতি তা দদাৎ। (কাঠ, ১:১:২-৩)

(৩) সি হোবাচ পিতরাং তত, কস্মৈ মাং দাস্যতীতি। দ্বিতীয়ং তৃতীয়ং তং হোবাচ মৃত্যুবে ত্বা দননীতি। (কঠ, ১.১.৪)

(৪) বহুনামেমি প্রথমে বহুনামেমি মধ্যমঃ। কিং স্বিদ যমস্য কর্তব্যং যন্ময়াদ্য কবিষ্যতি। (কঠ, ১:১:৫)

(৫) অনুপশ্য যথা পূর্বে প্রতিপশ্য তথা পরে। সস্যমিব মর্ত্যঃ পচ্যতে শস্যমিবাজায়তে পুনঃ।। (কঠ, ১:১:৬)

(৬) বৈশ্বানরঃ প্রবিশত্যাতিথি ব্রাহ্মণো গৃহান। তস্যৈতাং শান্তিং কুর্বন্তি হর বৈবস্বতোদকম। (কঠ, ১.১.৭)

(৭) আশাপ্রতীক্ষে সঙ্গতং সুনৃতাং চেষ্টপূর্তে পুত্রপশূংশ্চ সর্বন। এতদ্বঙক্তে পুরুষস্যাল্পমেধসে যস্যানশ্বন বসতি ব্রাহ্মণো গৃহে। (কঠ, ১:১:৮)

(৮) তিস্রো রাত্রীর্যদবাসীগৃহে মেনশ্নন ব্রহ্মান্নতিথির্নমস্যঃ। নমস্তেস্তু ব্রহ্মান স্বস্তিমেহস্তু তস্মাৎ প্রতি ক্রীন বরান বৃণীস্ব। (কঠ, ১:১:৯)

(৯) স্বর্গে লোকে ন ভয়ংকিঞ্চনাস্তি না তত্র তুং ন জরিয়া বিভৌতি। উভে তীর্ত্তাশনায়াপিপাসে শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে । স ত্বমগ্নিং স্বর্গমধ্যেষুষি মৃত্যে প্রবুহি ত্বং শ্রদ্দধানায় মহাম স্বর্গলোকা অমৃতত্বং ভজন্ত এতদ্বিতীয়েন বৃণে বরেণ। (কঠ, ১:১:১২-১৩)

(১০) প্রতে ব্রবীমি তদুমে নিবোধ স্বর্গমগ্নিং নচিকেতঃ প্রজনন অনন্তলোকপ্তিমাথো প্রতিষ্ঠাং বিদ্ধি ত্বমেতং নিহিতং গুহায়াম।। (কঠ, ১.১.১৪)

(১১) লোকদিমাগ্নিং তমুবাচ। তস্মৈ যা ইষ্টকা যাবতীর্ব যথা বা। স চাপি তং প্রত্যবদদ যথোক্তমথাস্য মৃত্যুঃ পুনরেবাহ তুষ্টঃ । তামব্রবীৎ শ্রীয়মাণে। মহাত্মা বরং তবোহাদ্য দদামি ভুয়ঃ।তবৈব নাম্না ভবিতায়মগ্নিঃ সৃঙ্কাং চৈমামনেকবৃপাহং গৃহাণ। (কঠ, ১:১:১৫,১৬)

(১২) যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মানুষ্যে অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে। এতদ্বিদ্যামনুশিষ্টস্বয়াহং বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ।। (কঠ, ১.১.২০)

(১৩) দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং পুরা ন হি সুবিজ্ঞেয়মগুরোষ ধর্মঃ। অন্যং বরং, নচিকেতা বৃণী স্ব মা মোপারোৎসীরতি মা সূজৈনম। (কঠ, ১:১:২১)

১৪. দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং কিল ত্বং চামৃত্যো যায় সুজ্ঞেয়মাথ। বক্তা চাস্য ত্বাদৃগন্যো ন লভো নানো বরস্তুলো এতস্য কশ্চিৎ। (কঠ, ১:১:২২)

(১৫) শতাম্বুষঃ পুত্রপৌত্রান, বৃণীস্ব বহূন পশুন হস্তিাহিরণ্যমশ্বান। ভূমের্মাহিদোয়তনং বৃণীর্ঘ স্বয়ং চ জীবা শরদঃ যাবদিচ্ছিসি। এতকুল্যং যদি মন্যসে বরং বৃণীদ্বীবিত্তঃ চিরজীবিকাংচ। মহাভূমৌ নচিকেতত্বমেধি কামনাং ত্বা কামভাজং করোমি। যে যে কামাঃ দুর্লভ মর্ত্যলোকে সর্বন কামাংশ ছন্দতঃ প্রার্থীয়স্ব। ইমা রামা সরথা সতুর্য ন হীদৃশ লঙনীয়া মনুষ্যৈঃ আভির্মৎপ্রত্তাভিঃ পরিচারয়স্ব নচিকেতো মরণং মানুপ্রাক্ষীঃ। (কঠ, ১.১.২৩-২৫)

(১৬) শ্বে বাবা মর্ত্যস্যঃ যদন্তকৈতৎ সর্বেন্দ্রিয়াণাং জরায়ন্তি তেজঃ। অপি সর্বং জীবিতমালমেব তাঁবৈব বাহা তব নৃত্যগীতে। ন বিক্তেন তর্পণীয়ে মনুষ্যো সল্যামহে বিত্তমভ্রাক্ষ্ম চেৎ ত্বা। জীবিষ্যামি যবন্দীশিষ্যসি ত্বং বরস্তু মে বরণীয়ঃ সি এব। (কঠ, ১:১:২৬,২৭)

(১৭) অজীর্যতনমৃতানামুপেত্য জীর্যন মর্ত্যুঃ কধঃস্থ প্রজনন। অভিধ্যায়ন বর্ণরতিপ্রমোদান অতিদীর্ঘেজীবিতে কোরমোেত। যস্মিমিদং বিচিকিৎসান্তি মৃত্যে যৎসাম্পরায়ে মহতি বুহিনস্তৎ। যোহয়ং বরো গুঢ়মনুপ্রবিক্টো নান্যং তস্মান্নচিকেতা বৃণীতে। (কঠ, ১:১:২৮,২৯)

(১৮) অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী পুনঃ পুনর্বাহিশমপদ্যতে মে। (কঠ, ১:২:৭)

(১৯) যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ উভে ভবতি ওদনঃ। মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং কইথা বেদ যাত্র সঃ।।

(২০) নাচিকেতমুপাখ্যানং মৃত্যুপ্রোক্তং সনাতনম উন্মুক্তা শুত্বা চ মেধাবী ব্রহ্মলোকে মহীয়তে। (কঠ, ১১:৩:১৬)

(২১) ঊর্ধ্বমূল্যোহবাকশাখ এযোহন্থঃ সনাতনঃ।তদেব শুক্রং অদ্ভুক্তা তদেবামৃত মুচ্যতে। অস্মিল্লোকা, শ্রিত্যাঃ সর্বে তদু নাত্যোতি কশ্চন। এতদ্বৈ তৎ। (কঠ, ২:৩:১)

(২২) ‘Gylf Gangleri asked the High One where is the chief place or sanctuary of the gods? The High One replied ‘It is by the ash Yggdrasil… The tree is held in position by three roots that spread far out: one is among the Aesir the second among the frost ogres. . the third extends over Niflheim… The third root of the ash tree is in the sky, and under the root is the sacred spring of Urd.’–The Prose Edda, pp. 44-45

(২৩) ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশচ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ। (২:৩:৩) তৈত্তিরীয় উপনিষদ (কঠ, ২:৮:১)

(২৪) যথাদর্শে তথাত্মনি, যথা স্বপ্নে তথা পিতৃলোকে। যথাসু পরী দদৃশে তথা গন্ধর্ব্বলোকে ছায়াতপয়োরিব ব্রহ্মলোকে। (কঠ, ২:৩:৫)

(২৫) নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তংশকো ন চক্ষুষা। অতীতি বুঝতেৎত্ব ন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে। (কঠ, ২৩:১২)

(২৬) আস্তীত্যেবোপলব্ধব্যস্তত্ত্বভাবেন চোভিয়োঃ। অতীত্যেবোপলব্ধস্য তত্ত্ব-ভাবঃ প্রসীদতি! (কঠ, ২:৩.১৩)

(২৭) মৃত্যুপ্রোক্তাং নচিকেতোহথ লবধবা বিদ্যামেতাং যোগাবধিং চ কৃৎস্নম। ব্রহ্ম প্রাপ্তো

বিরজোহভূদ্বিমৃত্যুরনোহাপ্যেবং যে বিদধ্যাত্মমেব।।

সংশয় ও নাস্তিক্যের ধারা

এ সব সত্ত্বেও মৃত্যুর পরে কিছু থাকে অথবা থাকে না–এই দুরকম লোকপ্রতীতিকে অবলম্বন করে প্রশ্ন এসেছিল; এ ছাড়াও জিজ্ঞাসা ছিল বুদ্ধির স্তর থেকে। উত্তর যখন এল তা ব্রহ্মা এবং আত্মা সম্বন্ধে নানা আচার্যের নানা মতের সমাহার হিসেবেই, এবং সেগুলি যেহেতু বিভিন্ন মানুষের সমাধান বা প্রত্যয়, তাই পরস্পরের মধ্যে কোনও সংহতি ছিল না। যুক্তির স্তরে সংগতিও ছিল না। এটা উপনিষদের সমস্ত স্তরের সমস্ত আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। এক তো বিভিন্ন উপনিষদ বিভিন্ন লোকের রচনা, এবং তাঁরা যে যার প্রত্যয় বা উপলব্ধি অনুসারে তত্ত্ব উপস্থাপিত করেছেন। বস্তুত সংগতিপূর্ণ উত্তর দেওয়ার বা পরস্পরের মতের সমর্থন করার তাদের কোনও দায় ছিল না। এর সবচেয়ে ভাল উদাহরণ হল উপনিষদে সৃষ্টিতত্ত্ব:

‘তিনি একাকী ছিলেন তাই আনন্দ পাননি, দ্বিতীয়কে সৃষ্টি করে তার সঙ্গে মিলিত হলেন, তখন সৃষ্টি করলেন।. ...প্রথমে শুধু জলই ছিল, তার মধ্যে বীজ

নিক্ষেপ করলেন, তাই থেকে সৃষ্টি হল।.... তিনি নিজেকে দ্বিদল বীজের মতো দু'ভাগ করলেন এবং দুই অংশ মিলে সৃষ্টি করলেন।'

এমনই বহু ধরনের কথা। সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে মানুষের দীর্ঘকালের প্রশ্ন ও কৌতূহল নিয়ে আচার্যরা নিজের নিজের উপলব্ধি দিয়ে উত্তর দিচ্ছেন। স্বভাবতই সেগুলির মধ্যে কোনও সংহতি নেই। বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন কালে যে সব সৃষ্টিতত্ত্ব উদ্ভাবিত হচ্ছে সেগুলিই বিধৃত আছে উপনিষদের বিভিন্ন অংশে। যেহেতু এই আচার্যরা দাবি করেননি যে তাঁর উপলব্ধিটাই একমাত্র সত্য অথবা অন্যদের উপলব্ধির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ তত্ত্বই তিনি উপস্থাপিত করবেনতাই স্বাভাবিক ভাবেই বৈচিত্র্য ও পার্থক্য রয়ে গেছে। অনেকটা অন্ধের হস্তিদর্শনের মতো; খণ্ড-খণ্ড ভাবে হাতির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যারা দ্যাখে তারা কেউই ভুল দ্যাখে না, আবার কেউই সম্পূর্ণদ্যাখে না। প্রশ্নকারীরা বিভিন্ন সমাধানের মধ্যে যেটি তাদের রুচিসম্মত বা অভিপ্রেত সেটিই মেনে নেয়, বিসংবাদের কোনও প্রশ্নই ওঠে না। উপনিষদে কেউ সার্বিক সংগতি বা মতৈক্য প্রত্যাশাও করেনি, তার অভাব নিয়ে বিচলিতও হয়নি।

আবার পরে বিভিন্ন দর্শনপ্রস্থানগুলি যখন নির্মিত হচ্ছিল তখন খোঁজ পড়ল সংহতির: বহির্বিশ্ব, জড়াজগৎ, জীবজগৎ, শরীর, আত্মা, পরলোক এসব নিয়ে দ্বিধাহীন ঐকমত্যের দাবি উঠল। উপনিষদে তা ছিল না বলে শুরু হল টীকাভাষ্যের, এবং তা চলল প্রায় পৌনে দু-হাজার বছর ধরে। দেড় হাজার বছর পরে শংকরাচার্য তার প্রস্থানত্রয়ে ওই ঐকমত্য দেখাবার জন্যে বিস্তর কসরত করলেন। অসম্ভব বিদ্বান ও বুদ্ধিমান এবং গভীর শাস্ত্রজ্ঞানের অধিকারী শংকর নানা রকম ভাবে ভাষ্য নির্মাণ করে একটি সংহতিপূর্ণ মতবাদ প্রতিষ্ঠা করলেন; এটিই অদ্বৈত বেদান্ত। উপনিষদ থেকে সমস্ত শাস্ত্রসম্ভারকে ব্যবহার করলেনতার মতের পরিপোষক শাস্ত্র হিসাবে দেখাতে চেষ্টা করে। কিন্তু ব্যাপারটা ওইখানেই থামল না; শুদ্ধাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত,

বিশিষ্টাদ্বৈত, ইত্যাদি নানা শাখায় ও মতভেদে এর পরিবর্তিত ও বিবর্তিত সংস্করণ নির্মিত হয়ে চলল। কিন্তু যে-কথা আমাদের প্রতিপাদ্য তা হল, উপনিষদে অধিকাংশ স্থলেই প্রশ্নের সঙ্গে উত্তরের যুক্তিগত সংগতি নেই, এবং মনে হয়, তা নিয়ে কারও মাথাব্যথাও ছিল না; তখনকার সমাজে চিন্তাশীল মানসজগতে সঞ্চারমাণ অন্যান্য বহু প্রশ্নের আংশিক উত্তর বা উত্তরকল্প আলোচনাতেই লোকে সন্তুষ্ট থাকত। নচিকেতার প্রশ্ন, মৃত্যুর পরে কিছু থাকে কি না, এর সরাসরি উত্তর না দিয়ে যম বলতে লাগলেন পিতৃযান-দেবযান—যার মধ্যে অবশ্য প্রচ্ছন্ন আছে উত্তর: থাকে, আত্মা মৃত্যুর পরেও থাকে। এ জীবনে ঠিক মতো আচরণ করলে তার মরণোত্তর গতি নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এ আত্মা সম্বন্ধে কয়েকটি মাত্র ইতিবাচক লক্ষণ জানা যায়: এইন্দ্রিয়-বহির্ভূত, এর মাপ বুড়ো আঙুলের পরিমাণ, মৃত্যুকালে এটি মাথার ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে বিনির্গত হয় এবং কর্ম অনুসারে বিভিন্ন পথে হয় জন্মান্তর নয় মোক্ষপ্রাপ্ত হয়। একে না বিশ্বাস করলে মানুষের অধোগতি হয় এবং দেবতাদের ঊর্ধ্বের্ব পরামলোকে এর শেষ পরিণতি। স্পষ্টতই, এ সব তত্ত্ব সাধারণ লোক কেবলমাত্র আবছা ভাবেই অবধারণ করতে পারত, এবং যেহেতু তাদের কাছে জীবনসংগ্রামটা কঠিনতর বাস্তব ছিল, তাই তারা এ সব প্রণিধান করে বোঝবার চেষ্টা করার অবকাশ পেত না। এই সময়ের কিছু পরে কর্মবাদ বিবৃত হলে সাধারণ মানুষ জন্মান্তর থেকে ছুটি পাওয়ার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠল এবং তাদের বোঝানো হল উচ্চত্রিবর্ণের নিঃশর্ত পদসেবা করাই তাদের পরকালের উন্নতির একমাত্র পন্থা।

নচিকেতার প্রশ্নের উত্তরে যম শুধু মৃত্যুর পর আত্মা থাকে। তাই বলছেন না, সাধারণ মানুষের আর-একটি প্রশ্নেরও উত্তর দিচ্ছেন: আত্মার জন্মান্তর হয়। ঠিক পথে জীবনযাপন না করলে বারে বারেই জন্মাতে হয়–পিতৃযানের পথে। আর যথার্থ জ্ঞানের উদয় হলে আত্মব্রিহ্মের একত্বের বোধ জন্মালে পুনর্জন্ম থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায় ও ব্রহ্মে লীন হয়ে মোক্ষ লাভ করা যায়। র্যাকে

জেনে মুক্ত হয় ও অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়–যং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুর মৃত্যুত্বং চ গচ্ছতি।' (কঠ, ২:৩:৮) তা হলে অমরত্বের পথ হল কোনও সৎকর্ম, সদভিপ্রায়, সদাচরণ, যজ্ঞানুষ্ঠান বা লোকহিতকর কোনও ক্রিয়া নয়–জ্ঞান। এ পথটিও নতুন। আরও একটি জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক ভাবে চলিত প্রশ্ন, নচিকেতা আলাপের শুরুতেই যা উচ্চারণ করেছিল, তার অত্যন্ত দ্ব্যর্থহীন উত্তর দেন যাম; বলেন, 'পরমাত্মাকে বাক্য দিয়ে জানা যায় না, মন বা চোখ দিয়েও নয়; যারা আত্মা সম্বন্ধে 'আছে।' এই কথা বলে, (তাদের এই উপায় ছাড়া) আর কোন ভাবে আত্মাকে জানা যায়?'(১) নচিকেতার বাকি প্রশ্নের উত্তর বাকি রইল: যারা বলে মৃত্যুর পরে কিছু থাকে না তাদের কোনও গতি হয় না, এ-ও এক ধরনের উত্তর যাতে সংশয়ীদের পক্ষে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। অথচ বিস্তর সংশয়ী মানুষ সংসারে আছে; সেদিনও অনেকে ছিল; তাদের কী গতি হবে তার কোনও উত্তর পাওয়া গেল না। অর্থাৎ যম যা বলছেন, মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব, দ্বিবিধ অবস্থান, পুনর্জন্মকে জয় করা, মোক্ষ লাভ করা এ সম্বন্ধে শেষ কথা হল, আত্মা আছে। এটি মেনে নেওয়া। যে-সমাজে বহু মানুষ বলে আত্মা নেই, মৃত্যুর পরে কিছু থাকে না, সেখানে নচিকেতার প্রশ্নের উত্তরে যম একটি ফতোয়া দিলেন। মৃত্যুর পরে আত্মা থাকে, এ কথা স্বীকার করলে তার পরের ধাপগুলোও কিন্তু এল ফতোয়ার চেহারায়। তা হলে সংশয় নিরসনের যে-উপায় উপনিষদ দিয়েছে তা যুক্তিবহ নয়, প্রমাণসহ নয়, যমের অনুজ্ঞামাত্র: 'আছে' বলে বিশ্বাস করতে হবে, না হলে মহতী বিনষ্টি। সংশয়ী একটুও টলল না, বিশ্বাসীর তো প্রথম থেকেই কোনও সমস্যাই ছিল না। অর্থাৎ নচিকেতা যে অত তোয়াজ করেছিলেন যমকে, 'আপনার মতো প্রবক্তা এ বিষয়ে কোথায় পাব আর' সেটা তত্ত্বত অমূলক। যম যা জানেন' তা-ই বললেন; যে বিশ্বাস করে তাকে বোঝালেন; যে করে না তাকে কিছুই দিলেন না।

ভাষার দিক থেকে, আলোচনার আঙ্গিকের দিক থেকে ব্রহ্মোদ্যে বা ওই জাতীয় আলোচনায় পাই প্রশ্নোত্তরের পরম্পরা, যা এক জায়গায় এসে থেমে যায়। তখন প্রশ্নকারীকে ধমক খেতে হয়, 'মাতিপ্রাক্ষীঃ'–অতিপ্রশ্ন কোরো না, যা জানিবার নয় তা জানতে চেয়ে না। মনে পড়ে, নচিকেতাকে প্রশ্ন থেকে নিরস্ত করতে গিয়ে যম বলেছিলেন 'দেবৈরিত্রাপি বিচিকিৎসিতং পুরাঃ', পুরাকালে এ ব্যাপার (মরণোত্তর সভা) সম্বন্ধে দেবতাদেরও সংশয় ছিল। তাদের সে-সংশয় কী ভাবে কখন গেল, অথবা আন্দী গেল কি না তার কোনও ইঙ্গিত যম দেননি। বিষয়টির গভীর্য বোঝাতে এ ভাবে নচিকেতাকে থামিয়ে দিতে চাইলেন। দেবতাদের মৃত্যু নেই এমন কথাই শাস্ত্রে বলে (অমরকোষে আমরা', 'নির্জর' এ সব দেবতার প্রতিশব্দ) তা হলে মৃত্যুর পর কিছু থাকে কি না, এমন প্রশ্ন তারা করবেন কেন? অবশ্য স্বয়ং যম এক সময়ে মানুষ ছিলেন, শাস্ত্র তার বিষয়ে বলে, 'মর্ত্যদের মধ্যে প্রথম যিনি মারা যান– যো মমার প্রথমে মর্তনাম।' (অথর্ব ১৮:৩:১৩)। তা হলে মৃত্যুর পর যমের অস্তিত্বই তো নচিকেতার প্রশ্নের উত্তর, অবশ্য তিনি পিতৃযান ও দেবযান দুটি বিকল্পেই বাইরে, কারণ তাঁর পুনর্জন্মও হয় না, মোক্ষও হয়নি। দুটি মাত্র বিকল্প যিনি উপস্থাপিত করেছেন, তিনি নিজে এ দুয়ের বাইরেই রয়ে গেলেন। এ সম্বন্ধে নচিকেতা কোনও প্রশ্নও করলেন না।

সংশয়ের একটা প্রকাশ প্রশ্নে। প্রশ্ন সংহিতা-সাহিত্য থেকেই আছে–যজ্ঞ ও দেবদেবীর বিষয়ে। ব্রাহ্মণসাহিত্যে প্রশ্ন যজ্ঞের অনুপুঙ্খ নিয়ে–সংখ্যা, দিক, উপকরণ, প্রণালী নিয়েএ সব প্রশ্নের উত্তর প্রায়ই যুক্তিনিরপেক্ষ, অনুষ্ঠানটিকে রহস্যাবৃত রাখবার চেষ্টা। আরণ্যকে ও উপনিষদে সত্যিকার প্রশ্ন এবং তার উত্তর দেওয়ার ধারা দেখা দিল। এখানেও বহু ক্ষেত্রে প্রশ্নের সঙ্গে উত্তরের কোনও সামঞ্জস্য নেই। কিন্তু যেটা প্রণিধান করবার বিষয়, সেটা হল। তখনকার দেশের বাতাসে সংশয়ের অকুণ্ঠ প্রকাশ, তার নিরসনের চেষ্টা,

তর্ক, আলোচনা, ব্রহ্মোদ্য এবং গুরুশিষ্য আলোচনার ও বিতর্কের একটি ধারা প্রবর্তিত হয়। প্রশ্নোপনিষদ তো। ওই নামেই অভিহিত, কিন্তু অন্যান্য উপনিষদেও দেখি জিজ্ঞাসুরা ইতস্তত যাচ্ছেগুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে প্রবীণ মনীষীদের সঙ্গে বিতর্কে প্রবৃত্ত হচ্ছে। পুত্র পিতার কাছে, শিষ্য গুরুর কাছে, স্ত্রী স্বামীর কাছে, এক মনীষী অন্য এক মনীষীর কাছে সংশয়ের সমাধান পাওয়ার চেষ্টা করছেন।

এই সময়ে বস্তুগত জীবনের ভিত্তিতে নানা পরিবর্তন ঘটে। তার ফলে সমাজমানসের অধিসংগঠনে বহু সংশয় জগতে থাকে এবং উত্তর যথাযথ না পেলেও সংশয় প্রকাশ করতে কুণ্ঠা নেই। আলোচনা ও বিতর্ক সমাজে বিশেষ ভাবে প্রচলিত। কর্মকাণ্ডে যজ্ঞে যে সব ঐহিক সুখের প্রতিশ্রুতি ছিল সেগুলি সম্বন্ধে অনেক জিজ্ঞাসুই বিমুখ। অসংকোচে সংশয় প্রকাশ করা, তর্কে প্রবৃত্ত হওয়া এ যুগের (খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম-ষষ্ঠ শতকের) একটি লক্ষণ। আর প্রশ্নই-বা কত। শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, মানসক্রিয়া, বহির্বিশ্ব, জীবনমৃত্যুপরলোক, দেবতার ভূমিকা, উৎপত্তি, সংখ্যা, জীবনের পরিণাম, লক্ষ্য, নানা বিষয়ে প্রশ্ন এদের মনে জাগাবুক। তা-ও তো আমরা সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের–দীন-দুঃখী চাষিমজুর, অন্ত্যজ, প্রাগার্য, নারী ও শূদ্রের বিশিষ্ট সংশয় ও প্রশ্নের কোনও চিহ্নই উপনিষদে পাই না। কিন্তু যা পাই তাতে একটি সজীব মানসিকতার প্রকাশ দেখি। প্রশ্ন-পরম্পরা চলে, পরিণামে কখনও ধিক্কার কখনও-বা পুরস্কার, কিন্তু যে-মনে প্রশ্ন জাগাবুক তাকে সহজে নিরস্ত করা যাচ্ছে না বেশ লক্ষ্য করা যায়।

প্রশ্নোত্তর শিক্ষার একটা স্বীকৃত পদ্ধতিই ছিল। উপনিষদে দেখি ছাত্র ঐহিক থেকে পারমার্থিক নানা বিষয়ে শিখছে গুরুকে প্রশ্ন করে কিংবা আচার্যের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার প্রয়াসে। অর্থাৎ ততদিনে সংশয় এবং সংশয় থেকে উত্থিত প্রশ্ন ব্যক্ত করা ও তার সমাধানের জন্য যোগ্য মনীষীর কাছে গিয়ে

উত্তর খোজা–এ ব্যাপারটা একটা সমাজসম্মত শিক্ষণপ্রণালী হয়ে গেছে। বহু বারই জিজ্ঞাসুকে তার প্রার্থিত উত্তর দেওয়া হচ্ছে না। বিকল্প কিছু দিয়ে ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা আছে, কিন্তু তার চেয়ে বেশি বার আছে সংশয়ে সম্মুখীন হওয়ার সাহস। এটি সমাজমানসের সুস্থতার একটি লক্ষণ।

সংহিতাব্রাহ্মণে অর্থাৎ যজ্ঞযুগের কর্মকাণ্ডে যে সব প্রশ্ন করা হয়েছিল সেগুলি মুখ্যত হল: দেবতারা আছেন কি না, তাদের জন্মাতে কে দেখেছে, তাঁরা থাকলেও ভক্তদের প্রার্থনা শোনেন কি না, যে-প্রণালীতে, যে-স্তব ও যে-হব্য দিয়ে তাদের আহ্বান করা হয় তা তাঁদের মনঃপূত হয় কি না, হলেও ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করার ক্ষমতা তাদের আছে কি না, ক্ষমতা থাকলেও ইচ্ছে আছে কি না। এ ছাড়াও পরলোক আছে কি না এমন প্রশ্নও করা হয়েছে। দেবতা (ইন্দ্র) নেই এমন কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। অবশ্যই এগুলি অনুত্তরিত প্রশ্নই থেকে গেছে, সে জনাস ইন্দ্র' বলে নেম ভাগবের ইন্দ্রের অনস্তিত্ব ঘোষণার যে-উত্তর দেওয়ার চেষ্ট করা হয়েছে, সে-উত্তর বস্তুত উত্তরই নয়। কতকগুলি ঘোষণামাত্র, ফলে প্রশ্নগুলি রয়েই গেছে।

জ্ঞানকাণ্ডে আরণ্যক উপনিষদে প্রশ্নের ধরন পালটে গেছে। প্রথম যুগের কিছু কিছু প্রশ্ন আছে কিন্তু এখন প্রশ্নগুলির পরিসর অনেক বেড়েছে। বিশ্বপ্রকৃতির উদ্ভব, আচরণ, দেবতাদের আচরণ, মানুষের দেহ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, তাদের উদ্ভব, কর্মভূমিকা, আপেক্ষিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য, শরীরের সঙ্গে মনের আপেক্ষিক সম্পর্ক, বহির্বিশ্বের সঙ্গে মানুষের শরীরমনের সংযোগ এ সব নিয়ে নানা প্রশ্ন নানা মানুষ করেছে। এ ছাড়াও যে-প্রশ্নটি এই পর্বে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হয়েছে তা ঠিক জ্ঞানকাণ্ডের যুগের নতুন বিষয় নয়, প্রশ্নটি পুরাতন, উত্তরটিই নতুন। প্রশ্ন হল, মরণোত্তর অবস্থা, এ নিয়ে পূর্বেও মানুষ ভেবেছে, সন্দেহ করেছে, প্রশ্ন করেছে, কোনও উত্তর পায়নি। এখন বারে বারে

নানা ভাবে এ প্রশ্ন শোনা যাচ্ছে; এর তীক্ষ্ণতম প্রকাশ যমের কাছে নচিকেতার প্রশ্নে। প্রশ্নগুলি ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য বা মৌলিক নয়, সারা পৃথিবীতেই মোটের ওপর মরণোত্তর অবস্থান নিয়ে এই ধরনের প্রশ্নই উত্থাপিত হয়েছে, উত্তরগুলি প্রত্যেক দেশে পৃথক। এ দেশে উপনিষদ থেকে শুরু করে। পরবর্তীর্ণ দর্শনপ্রস্থানগুলিতে প্রায় সর্বত্রই বেদের প্রামাণ্যতা স্বীকার করে উত্তর পায়নি, পেয়েছে কিছু শাস্ত্রীয় অনুশাসন। পাশ্চাত্য দর্শনের প্রথম দিকে ধর্মতত্ত্বই দর্শন ছিল, পরে দর্শনচর্চা সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে যায়।

উপনিষদে আমরা যে-স্তরে আলোচনা পাই তা সম্পূর্ণতই বেদনির্ভর। কিন্তু জ্ঞানকাণ্ডে, বিশেষত উপনিষদে বেদের আদিপর্ব অর্থাৎ সংহিতা িব্রাহ্মাণে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত দুটি নতুন তত্ত্ব উদ্ভাবিত হল ওই মৌলিক–মরণোত্তর অস্তিত্ব— প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্যে; সে-দুটি তত্ত্ব হল, দেহাতিরিক্ত আত্মা ও জন্মান্তরবাদ। উত্তর যথার্থ না হলেও এর মধ্যে একটি যুক্তির ছক দেওয়ার চেষ্টা বেশ বোঝা যায়। দেহ যদি সম্পূর্ণত নশ্বর হয় তা হলে মৃত্যুতেই জীবনের চরম পরিসমাপ্তি হয়। তাতে সুখী মানুষের অতৃপ্ত বাসনা চরিতার্থকরার জন্য কোনও আধার থাকে না, পাপীর শাস্তিরও নয়। তাই আত্মা বলে দেহব্যাতিরিক্ত একটি সত্তকে কল্পনা করা হল। বহু সংশয়ের নিরসনের জন্যে এই আত্মাকে বারে বারে অবতীর্ণ হতে হয়েছে। মানবিক সকল অভিজ্ঞতার ঊর্ধ্বের্ব বা বাইরে এর স্থিতি, তাই দেহ সম্বন্ধে আমাদের যা জ্ঞান তা দিয়ে আত্মাকে ধারণা করা যাবে না। অতএব শাস্ত্রকাররা প্রভূত প্রয়াসে এবং নিরলস উদ্যম এই আত্মাকে নেতিবাচক নানা ভাবে বর্ণনা করতে লাগলেন। ইতিবাচক কিছু বলা বিপজ্জনক এবং অবাঞ্চিতও, তাই সে-পথ পরিহার করাই নিরাপদ। শুধু অঙ্গুষ্ঠমাত্র বলে এর পরিমাণ নির্ধারণ করলেন। সুখী ধনী সার্থক মানুষ তৃপ্ত হলেন এই জেনে যে মৃত্যুতেই সব শেষ হয় না, পরজন্মে আবার সবই ভোগ করা যাবে; কিছু দুঃখী মানুষও সান্ত্বনা পেল এই ভেবে যে, যথাযথ শাস্ত্রসম্মত আচরণ করলে তারা আবার জন্মে। এ

জন্মে যা পেল না তা পাবে; এ সবের জন্যে জন্মান্তরিবাদের আমদানি করা বিশেষ প্রয়োজন ছিল। কিছু জীবনবিমুখ বৈরাগ্যবান আর জন্মাতে চাইলেন না। আর অগণ্য সাধারণ মানুষ যারা অভাবে, অস্বাস্থ্যে, অনাহারে, বিপর্যয়ে, অত্যাচারে জর্জরিত ছিল তাদের মনে হল: জীবন তো এই, একটানা যাতনা ভোগের ইতিহাস, এর পুনরাবৃত্তি তো যন্ত্রণারই অভিজ্ঞতা। কাজেই তারা এর পুনরাবর্তন থেকে মুক্তি চাইল। অতএব উপস্থাপিত করা হল আত্ম-ব্রহ্মা-ঐক্য তত্ত্ব অর্থাৎ মোক্ষ। ঋগ্বেদের আমল থেকে বহু অনুত্তরিত প্রশ্ন এ ভাবে যেন একটি উত্তরের আভাস পেল। আত্মার সত্তা নচিকেতার মূল প্রশ্নের এবং ঋগ্বেদ থেকে বহুসংশয়িত উক্তির উত্তর। এ আত্মা স্বর্গে বা নরকে চিরদিন থাকে না, এ পৃথিবীতেই ফিরে ফিরে আসে। এতে ঋগ্বেদের সেই বারংবার উচ্চারিত প্রার্থনা: পশ্যেমা শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতম–একশো শরৎ দেখব। একশো শরৎ বাঁচব', 'জ্যোক পশ্যেম। সূর্যমুচ্চরন্তম–উদীয়মান সূর্যকে দীর্ঘকাল ধরে দেখব –তারই উত্তর। এইখানে আমরা জটিল একটি অবস্থার সম্মুখীন হই; যার পুনর্বার জন্মাবার আগ্রহ নেই তার বিকল্প করণীয় কী? যম বলছেন, ব্রহ্ম যাকে দয়া করে ওই অভেদবুদ্ধি দেন সে-ই মোক্ষকরা উপলব্ধি পায়, অন্যেরা পায় না। অর্থাৎ মানুষের হাতে তার মুক্তির কোনও যথার্থ উপায় নেই। অর্থাৎ শেষ প্রশ্নটা অনুত্তরিতই রইল।

সমাজে সংশয় নানা চেহারায় ছিল সংহিতা-যুগ থেকেই, এবং নচিকেতার কথায় আছে নাস্তিক্যও ছিল। নাস্তিক্য সম্বন্ধে শব্দকল্পদুম বলে, ঈশ্বরাপ্রামাণ্যবাদী আর বেদাপ্রামাণ্যবাদী অর্থাৎ ঈশ্বর বা বেদকে প্রমাণ বলে যারা মানে না। প্রতিশব্দ বা পর্যায়শব্দ হল বার্হস্পত্য, নাস্তিক্য, লৌকায়ন্তিক (হেমচন্দ্রর অভিধানের মতে)। এদের মধ্যে চার্ব্বকমত হল, ভূমি, জল, অগ্নি ও বায়ু এই চারটি ভুতিবস্তুকে স্বীকার করে (আকাশকে ভূত বলে স্বীকার করে না–আকাশভিন্নভূতচতুষ্টয়বাদী)। এ ছাড়া এবং প্রত্যক্ষ ছাড়া এরা অনুমান,

উপমান, আপ্তবাক্য স্বীকার করে না–প্রত্যক্ষমেকং চার্বাকোঃ। চার্বাক ছাড়া বৃহস্পতিও এই ধরনের মত পোষণ করতেন। মনে পড়ে দেবতাদের গুরু বা আচার্যের নাম বৃহস্পতি, আর মনে পড়ে যমের উক্তি দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং পুরা'–পুরাকালে দেবতাদেরও সংশয় ছিল; মৃত্যুর পর কিছু থাকে কি না। বৃহস্পতি তার কী উত্তর দিয়েছিলেন জানিবার উপায় নেই। কিন্তু পুরাকাল থেকে দেবতা মানুষ সকলে মৃত্যুর পর কিছু থাকে কি না সে নিয়ে সংশয় পোষণ করতেন। ঈশ্বরের অস্তিত্বও প্রামাণ্য, অর্থাৎ ঈশ্বরবচন বলে সব কিছু মেনে নেওয়াতে প্রথম থেকেই মানুষের আপত্তি ছিল। পরে আপত্তি বা সংশয়ের সীমা প্রসারিত হল, বেদের প্রামাণ্য অস্বীকার করায়। দুটি অতিলৌকিক প্রমাণই অস্বীকৃত হচ্ছে; ঈশ্বর তো অতিলৌকিক বটেই। আর বেদকে অপৌরুষেয় বলা মাত্রই বেদও অতিলৌকিক হয়ে গেল। মানুষ যখন এ দুটি প্রমাণ মানতে অস্বীকার করল তখন সে যা মানল তা প্রত্যক্ষলোকে এবং মানুষের জগতে সীমাবদ্ধ রইল, তা হল লোকায়ত; দেবায়ত বা লোকাতিগ নয়। এ কথা সত্য যে প্রত্যক্ষকেই একমাত্র প্রমাণ বলে স্বীকার করলে জ্ঞানের জগৎ খর্ব হয়ে থাকে; তেমন হলে, কলকাতায় বসে আফ্রিকা দেখা যায় না বলে আফ্রিকা অপ্রমাণ হয়, অথবা অশোক আকবর প্রত্যক্ষ নন বলে অপ্রমাণ হয়ে যান। তাই অনেক আটঘটি বেঁধে যথার্থ কাঠামোর মধ্যে অনুমিতি (অনুমান)। অর্থাৎ তর্ককে স্বীকার করতেই হয়েছে। বেদের সংজ্ঞাই দেওয়া হয়েছে: 'প্রত্যক্ষ বা অনুমান দ্বারা যা বোঝা যায় না সেটাকে যা বোঝায়। তাই-ই বেদ-প্রত্যক্ষেণানুমিত্যা বা যন্ত্রপায়ো ন বুধ্যতে।' এবং, বিদন্তি বেদেন তস্মাদ্বেদস্য বেদতা।' দুটির বাইরে যে-প্রমাণ তর্কশাস্ত্র স্বীকার করে তা হল, 'শব্দ' অর্থাৎ বেদবাক্য। বাক্য দু'রকমের–আনুষ্ঠানিক বা যজ্ঞের অনুষ্ঠান-সম্পর্কিত— এবং তাত্ত্বিক অর্থাৎ দেবতাদের বিষয়ে বা ধর্ম, নীতি ইত্যাদি অনুষ্ঠান-নিরপেক্ষ বিষয়ের কথা।

বেদবিরোধী প্রস্থানগুলি, আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতকের কাছাকাছি যে সব সংশয়বাদী মূল বৈদিক ধর্মধারার বাইরে চলে যাচ্ছিল তাদের তত্ত্বে সংহত হয়ে রয়ে গিয়েছিল দু' রকমেরই সংশয়। এ সব সংশয়ের অনেকগুলিরই অন্তরালে প্রবাহিত ছিল নাস্তিক্য, সম্ভবত সকল সংশয়ী এ বিষয়ে অবহিতও ছিলেন না, তবু মূল সংশয় অনেকক্ষেত্রেই নাস্তিক্যকে স্পর্শ করে, যদিও সর্বদা নয়। সংশয়গুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রইল অনুত্তরিত, অসমাধিত। মানুষ পাঁচ-ছাঁশো বছর ধরে নানা রকম প্রশ্ন করে গেছে, যথার্থ উত্তর মেলেনি। অতএব সংশয়ের তথা নাস্তিক্যের ভিত্তিও রয়ে গেল। আর রয়ে গেল প্রশ্ন করার, তর্ক করার এক সজীব ধারা,—বিশ্ব জ্ঞান চর্চায় যা এক অসামান্য অবদান।

---

(১) নৈব বাচনে মনসা প্রাপ্তংশক্যোন চক্ষুষা। অতীতি বুঝতোহন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে। (কঠ, ১:১:১০)

সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপঞ্জি

Agarwal, VS 1963 Hymn of Creation the Nasad a Sikta, Varanasi Armstrong, DM 1973 Belief, Truth and Knowledge, Cambridge, UK Atler Rober 198 Sacred History of Prose fiction, Near Eastern Studies, Vol 22 The Creation

of the Sacred Literatitre, Jniversity of California Press Bandyopadhyaya, NC 1945 Economic Life and Progress in Ancient India, Calcutta Banerji, N B 1974. The Spirit of Indian

Philosophy, New Delhi Bhattacharj, S 2000. The Indian Theogony, Penguin Bhyattachary 1, S 1987 Doubt Belief of Knowledge, New Delhi Blacker, C& Lowe, M (ed) 1977 Weltformeln der fruheit, Die kosmologen der alten kulturen

Köln Brandon, SGF 1963 Man and his Destiny in the Great Religions, Manchester Burnyat, M (ed) 1983 The Skeptical Tradition, Berkeley Berger Peter: 1969 The Social Polity of Religion, Faber and Faber Berger Peter: 1970 A Rumour of Angels, Penguin. Chakrabart, A K, Motilal B K 1994. Knowing from Words, Dordrecht Cihattiopadhyaya, D.P. 1964 İndian Philosophy. New Delhi (4th edn 1979) Chattopadhyaya, D.P. 1977 What is living and what is dead in Indian Philosophy. People's

Publishing House Dasgupta, SN 1922 A History of Indian Philosophy, Cambridge, U.K (1955). Frauwallner, E. 1953, Geschichte der indischen philosophie. Vo!, Salzburg Gupta, U. 1987. Materialism in the edas, New Delhi. Geertz, Clifford. 1968. Islam observed, Yale University Geertz, Clifford 1973. The Interpretation of Culture, N.Y.

lallic, P (ed.), 1964. Scepticismo Man and God, Connecticut Herman, A.L 1976 An Introduction to Indian Thought, New Jersey. Heesterman, J.C. 1968-69 On the Origin of the Nästika in Wissenschaft Zeitschript für die süd

and Ostasiens Band XI-X, Halbfass, W. 1988 India and Europe, An Essay in understanding, Suny Press Halbfass, W. 1991. Tradition an Reflection, New York. Herbert, H & Mauss, Marcel: 1964 Sacrifice: its nature and function, London. Hulin, M. 979. L'Hridusine, Paris, Jha, G (ed) 924. Tantravartuka, Vois, i & İl, Calcutta, (2nd cdn 1983) Jha, G (ed) 1900-1904 Slokayārtuka, Delhi (2nd edn 1995) Kuiper, F.B.J. 1983. Ancient linduan Cosmogorry, Delhi Kulke, H & Rothermund Dietmar. 1995 A History of India, London Kirkegaard: 1952. Six Existentialist Thinkers, Routledge and Kegan Paul

R8 R

long, A A. 1986 Hellenistiar Philosophy, Duckworth Mann, U 1974 Schöpfungsmythen vom Ursprung und Sunn Stuttgart Macinico, N 95 lindan The usim, ondon. Marrett, R R 194 The Threshold of Religion. Oxford Mitta, KK 1974. Materialism in Indian Thought, Delhi Maser, P 1985 Knowledge and Evidence, Cambridge, UK Mukhopadhyaya, P.K 1985. Indian Realism A Rigorous Descriptive Metaphysics, Calcutta McClosky, J. M. 1964 God and Evil in God and Evil, led Helson Pike, Prentice liaii. Nakamura, Hame' 1985 A Comparative History of Ideas, Tokyo Protagoras. Frag 4 The Sophist Patrick, M M 1983. The Greek Skeptics, London Swanson, GE 1964. The Birth of the gods, Michigan Sontheimer, GD. & Kulke li (ed) 1989 Hinduism Revused.

Delhi Toporov, VN. 1977. Les sources cosmologiques des premieres descriptions historтoques,

Brukelles Thomson, G 1955 Studies in Ancient Greek Society, Vols. I & II, Lawrence and Wishart, London Taylor, PB & Audem Włł –1969 The Elder Edda Selections, Random House. Warder, A K 1970. Indian Buddhism, Motula Banarasidas. Wolf. A 1974 Religion and Ritual in Chinese Society, Standord University Press,

ARCES

Agass, J 'Privileged Access'. Inquiry, 12. (196), pp. 420-26 Aimeder. R Truth and Evidcnce, Philosophical Quarterly 24, (1974), pp. 365-68 Annus, D B o Knowledge, Belief and Rationality', „Journal of Philosophy, 74 (1977), pp 219-25. Barkes, J 'Knowledge, ignorance and Presupposition'. Analysis, pp. 33-45. Bronsted Mogens 1967 The Transformations of the concept of gate in literature', in Ringgen

Helmer (cd). Fatalistic Beliefs in Religion, Folklore and Literature, Stockholm Corronda Pensa 1972 The Field of Indian Religions' in J Branchi, C.J. Blecker. A Bausani (ed.) Some Internal and Comparative Problems in Methods of Istory of Religions, Br Collins, A Reflections on Rg Veda X, 129, Journal of indo-European Studies, 3, (1975), pp.

27-8 Kapstein, Minda’s search for self and the beginnings of philosophical perplexities in India’,

Religion Studies, Cambridge, 1988. Mater, W H A re-examination of Rg Veda X, 129, the Nasadiya Hymn’Journal of Indo-European

Studies, 3 3. pp 219-37. Polome, EC ‘Vedic Cosmogonies and their Indo-European Back-ground’. The Mankind

Quarterly 24, (1983), pp 61-69 Sellars, W Skepticism and inquiry’, Philosophical Forum. 7, (1975-76), pp. 203-07.

OGONARES ANO ENCYCLOPAEDAS

Dictionary of the History of ideas, 1975 Macmian Encyclopaedia of Philosophy, 1967. Macmillian Encyclopaedia of Religion, 1987 Macmillan Encyclopaedia of Religion and Ethics, 1958, The New Schaff–Herzog Encyclopaedia of Religious Knowledge, 1958. Oxford Dictionary of the Christian Church,